প্রাক্‌কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক শ্রেণির জন্য যে পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমতো কোন বিষয়ে সাম্মানিক (Honours) স্তরে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এ-ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে সাম্মানিক মানের পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে— যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। কেন্দ্র ও রাজ্যের অগ্রগণ্য বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের পাঠক্রম অনুসরণ করে তার আদর্শ উপকরণগুলির সমন্বয়ে রচিত হয়েছে এই পাঠক্রম। সেইসঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধীতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূরসঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এইসব পাঠ-উপকরণ লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দূরসঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন ; যখনই কোন শিক্ষার্থীও এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ-উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটা মনোনিবেশ করবেন কোনও শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। এরপর যেখানে যতটুকু অস্পষ্টতা দেখা দেবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠকেন্দ্রে নিযুক্ত শিক্ষা-সহায়কগণের পরামর্শে তার নিরসন অবশ্যই হ'তে পারবে। তার ওপর প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণ-ক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশকিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক—অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায়, ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার
উপাচার্য

ষষ্ঠ পুনর্মুদ্রণ ঃ জুন, 2017

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী ও অর্থানুকূল্যে মুদ্রিত।

Printed in accordance with the regulations and financial assistance of the Distance Education Bureau of the University Grants Commission.

পরিচিতি

বিষয় : গণিতবিদ্যা **সাম্মানিক স্তর**

পাঠক্রম ঃ EZO 07

পর্যায় ঃ 01

	রচনা	সম্পাদনা
একক 1	ড. পার্থপ্রতিম চক্রবর্তী	ড. অসীমা দাস চট্টোপাধ্যায়
একক 2	ঐ	ঐ
একক 3	ড. পার্থপ্রতিম বিশ্বাস	ড. বিভাস গুহ
একক 4	ঐ	ঐ
একক 5	ঐ	ঐ
একক 6	ড. শিলাঞ্জন ভট্টাচার্য ড. পার্থপ্রতিম চক্রবর্তী	ড. নারায়ণ চন্দ্র দাস
একক 7	ড. কস্তুরী পাল	ড. অসীমা দাস চট্টোপাধ্যায়

পর্যায় ঃ 02

একক 8	ড. অনিরুদ্ধ মুখোপাধ্যায়	ড. বিভাস গুহ
একক 9	ঐ	ঐ
একক 10	ড. শেখর মুখোপাধ্যায়	অধ্যাপক অশোক চৌধুরী
একক 11	ডদ. পার্থপ্রতিম চক্রবর্তী	ড. বিভাস গুহ
একক 12	ড. শেখর মুখোপাধ্যায়	ঐ
একক 13	ড. অনিরুদ্ধ মুখোপাধ্যায়	ঐ
একক 14	ঐ	ঐ

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ-সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোন অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

মোহন কুমার চট্টোপাধ্যায়
নিবন্ধক

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

EZO 07

বাস্তুবিদ্যা ও পরিবেশ বিজ্ঞান

(স্নাতক পাঠক্রম)

পর্যায়

1

বাস্তুবিদ্যা

একক 1 ❑	ভূমিকা, উপবিভাগ এবং সুযোগ	7 – 14
একক 2 ❑	বাস্তুতন্ত্রের বাস্তুবিদ্যা	15 – 32
একক 3 ❑	বাস্তুতান্ত্রিক শর্তসমূহ	33 – 44
একক 4 ❑	পপুলেশন ইকোলজি	45 – 55
একক 5 ❑	পপুলেশনের বৃদ্ধি	56 – 61
একক 6 ❑	কম্যুনিটি ইকোলজি	62 – 80
একক 7 ❑	জীববৈচিত্র্য সম্বন্ধে ধারণা, জীববৈচিত্র্যের প্রকারভেদ, জীববৈচিত্র্যের গুরুত্ব, মহাবৈচিত্র্যের স্থানসমূহ এবং ভারতবর্ষের জীববৈচিত্র্যময় স্থানসমূহের বিবরণ	81 – 95

পর্যায়

2

পরিবেশ বিজ্ঞান

একক 8 ❑	পরিবেশ সম্পর্কে ধারণা	97 – 120
একক 9 ❑	পরিবেশের অবক্ষয়	121 – 150
একক 10 ❑	গ্লোবাল ওয়ার্মিং	151 – 164
একক 11 ❑	পরিবেশগত বিষবিদ্যা	165 – 172
একক 12 ❑	অ্যাপ্পিকো, চিপকো ও অন্যান্য আন্দোলন	173 – 187
একক 13 ❑	বন্যপ্রাণী ও তাদের বাসস্থান	188 – 204
একক 14 ❑	সংরক্ষণ সম্বন্ধে ধারণা	205 – 226

একক 1 ❑ ভূমিকা, উপবিভাগ এবং সুযোগ (Introduction, Subdivisions and Scope)

গঠন

1.1 প্রস্তাবনা

উদ্দেশ্য

1.2 ভূমিকা

1.2.1 বাস্তুবিদ্যার সংজ্ঞা

1.2.2 ইকোলজি শব্দটির উৎপত্তি

1.3 বাস্তুবিদ্যার উপবিভাগ

1.4 বাস্তুবিদ্যার সুযোগ

1.5 সারাংশ

1.6 প্রশ্নাবলী

1.7 উত্তরমালা

1.1 প্রস্তাবনা

জীববিজ্ঞানে যে শাখায় জবি ও তার পারিপার্শ্বিক পরিবেসের আন্তঃসম্পর্ক আলোচিত হয়, তাকে বাস্তুবিজ্ঞান বা **ইকোলজি** বলে। আমরা এই এককে বাস্তুবিদ্যার ভূমিকা, উপবিভাগ এবং সুযোগ নিয়ে আলোচনা করব।

উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি

- বাস্তুবিদ্যা সম্পর্কিত বিবিন্ন বিষয়ে আলোচনা করতে পারবেন।
- পরিবেশে জীব ও জড় উপাদানের যে সম্পর্ক, তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বাস্তুবিদ্যার যে বিভিন্ন সুযোগ, তা বুঝিয়ে দিতে পারবেন।

1.2 প্রস্তাবনা

পৃথিবীর অন্তর্গত বিভিন্ন জীব (উদ্ভিদ এবং প্রাণী) বিভিন্ন ধরনের পারিপার্শ্বিক পরিবেশে বসবাস করে। জীব ও তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশের মধ্যে সব সময়ই বিশেষ এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক ও আন্তঃক্রিয়া (intersection) দেখা যায় এবং এই সম্পর্ককেই আমরা **বাস্তুবিজ্ঞান** বলে থাকি। জীবজগতের সকল ভৌত ও জৈবিক অবস্থা যা জীবের উপর প্রভাব বিস্তার করে তাকেই পরিবেশ (Environment) বলে। সংক্ষেপে একে বায়োস্ফিয়ার (Biosphere) বলে। পৃথিবীর সামগ্রিক জলাধার (Hyderosphere), সামগ্রিক স্থলাধার

(Lithosphere) এবং সামগ্রিক আবহাওয়া (Atmosphere) যেখানেই জীবের অস্তিত্ব বর্তমান তাকেই একত্রে পরিবেশ বলে। বায়োস্ফিয়ারের যে স্থানে জীবকে পাওয়া যায়, সেই স্থানকে সেই জীবের বসতি স্থান (Habitat) বলে এবং যে স্থানীয় ভৌত ও রাসায়নিক পরিবেশ একটি জীবকে তার বসতিস্থানে বাঁচতে সাহায্য করে, তাকে মাইক্রোহ্যাবিটেট (Microhabitat) বলে। বাস্তুবিদ্যায় একে নিশ্ (Niche) বলে।

1.2.1 বাস্তুবিদ্যার সংজ্ঞা

জীবের সঙ্গে পরিবেশের পারস্পরিক ক্রিয়া সম্পর্কীয় পারাকযতিক বিজ্ঞানকে বাস্তুবিদ্যা (Ecology) বলা হয়। বিভিন্ন বিজ্ঞানী বাস্তুবিদ্যার বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রণয়ন করেন। বিজ্ঞানী ওডাম (1971) -এর মতে প্রকৃতির গঠন ও কাজ সম্বন্ধে জ্ঞানার্জনই হচ্ছে বাস্তুবিদ্যা (Ecology)।

1985 সালে বিজ্ঞানী ক্রেবস্ (Krebs) বাস্তুবিদ্যার একটি আধুনিক সংজ্ঞা প্রণয়ন করেন। তাঁর মতে, এটি আন্তঃক্রিয়ার (Interaction) একটি বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বা জীবের বিস্তৃতি এবং পরিমাণ স্থির করে।

1.2.2 ইকোলজি শব্দটির উৎপত্তি

ইকোলজি (Ecology) শব্দটি দুটি গ্রীক শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। যথা— 'Oikos' বা 'ঐকোস' শব্দের অর্থ বাসস্থান এবং 'Logos' বা লোগোস শব্দের অর্থ জ্ঞান। অর্থাৎ জীব বাসস্থান সম্পর্কে জ্ঞানার্জন।

প্রথম কোন বিজ্ঞানী এই ইকোলজি শব্দটি ব্যবহার করেন তা নিয়ে কিছু বিতর্ক আছে। যেমন— Kormondy (1969)-র মতে Henry David Thoreau 1858 সালে প্রথম ইকোলজি শব্দটি ব্যবহার করেন। আবার বিভিন্ন বিজ্ঞান পত্রিকার মতে বিজ্ঞানী H. Reitter 1868 সালে ইকোলজি শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। তবে অধিকাংশ বাস্তুবিদ্ বা Ecologist-এর মতে বিজ্ঞানী Ernst Haeckel (1886) প্রথম ইকোলজি শব্দটি প্রয়োগ করেন। জৈব পরিবেশের সঙ্গে প্রাণীর সম্পর্ক, এই অর্থে তিনি এই শব্দটি ব্যবহার করেন। পরে এর পরিধি বিস্তার করে তিনি বলেন যে শুধু প্রাণী নয় পরিবেশের সঙ্গে সকল জীবের সম্পর্কই এই বিদ্যার বিষয়বস্তু।

1.3 বাস্তুবিদ্যার উপবিভাগ

বাস্তুবিদ্যার তিনটি প্রধান উপবিভাগ দেখা যায়। এই উপবিভাগ নিম্নলিখিত তিনটি বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।

1. নামকরণের (Taxonomy) উপর ভিত্তি করে।
2. বসতি স্থানের (Habitat) উপর ভিত্তি করে।
3. অর্গানাইজেশনের উপর ভিত্তি করে।

1. **নামকরণ (Taxonomy) সম্পর্কের ভিত্তিতে ঃ** বাস্তুবিদ্যা অধ্যয়নের প্রথম যুগে উদ্ভিদ বাস্তুবিদ্যা (Plant Ecology) এবং প্রাণী বাস্তুবিদ্যা (Animal ecology) নামে দুটি উপশাখার সৃষ্টি হয়। কিন্তু আধুনিক বাস্তুবিদ্রা (Ecologists) এই প্রকার উপবিভাগের বিরুদ্ধে। কারণ, বাস্তুবিদ্যা বলতে সকল প্রকার জীবের সঙ্গে পরিবেশের সম্পর্কের কথাই বলা হয়।

2. **বসতি স্থাপন (Habitat) সম্পর্কের ভিত্তিতে ঃ** বায়োস্ফিয়ার যেহেতু জীবের বসতি স্থান (Habitat) ভিন্ন ভিন্ন, যেমন—বনভূমি, মরুভূমি, স্বাদু-জল, সমুদ্র জল ইত্যাদি, সেহেতু ঐ বসতি স্থাপনের সঙ্গে জীবের ও পরিবেশের সম্পর্ক পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করা উচিত। এইভাবে বসতি স্থানের (Habitat) বাস্তুবিদ্যার সৃষ্টি হয়েছে।

3. **অর্গানাইজেশনের উপর ভিত্তিতে ঃ** একটি জীব বা একগোষ্ঠী জীবের উপর ভিত্তি করে ইহা গঠিত। এই অর্গানাইজেশনের ভিত্তিতেই বাস্তুবিদ্যার প্রকৃত দুটি উপবিভাগ সৃষ্টি হয়েছে—

(i) **অটোইকোলজি ঃ** বাস্তুবিদ্যার যে শাখায় একটিমাত্র প্রজাতির সঙ্গে পরিবেশের এবং অন্য ভিন্ন প্রজাতির সঙ্গে সম্পর্ক আলোচিত হয়, তাকে অটোইকোলজি বলে। অটোইকোলজির একক হচ্ছে পপুলেশন।

(ii) **সাইনেকোলজি ঃ** বাস্তুবিদ্যার এই শাখায় বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণী, উদ্ভিদ ও অণুজীবের সঙ্গে পরিবেশের সম্পর্ক আলোচিত হয়। সুতরাং সাইনেকোলজির একক হচ্ছে কম্যুনিটি।

সাইনেকোলজিকে আবার চারটি শাখায় ভাগ করা হয়—

(A) **পপুলেশন ইকোলজি ঃ** একই প্রজাতির উদ্ভিদ, প্রাণী ও অণুজীবের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক এবং এদের সঙ্গে পরিবেশের সম্পর্কই পপুলেশন ইকোলজির উদ্দেশ্য (চিত্র নং 1)।

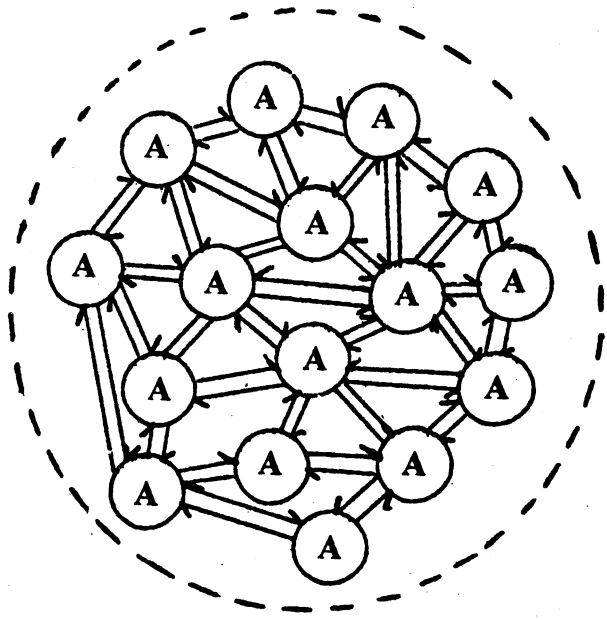

চিত্র নং 1 : A প্রজাতির পপুলেশন—যারা পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত

(B) **কম্যুনিটি ইকোলজি ঃ** সাইনেকোলজির এই শাখায় বিভিন্ন প্রজাতির জীবকূলের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক এবং এরা যে পরিবেশে বাস করে তার সঙ্গে সম্পর্কই আলোচনা করা হয় (চিত্র নং 2)।

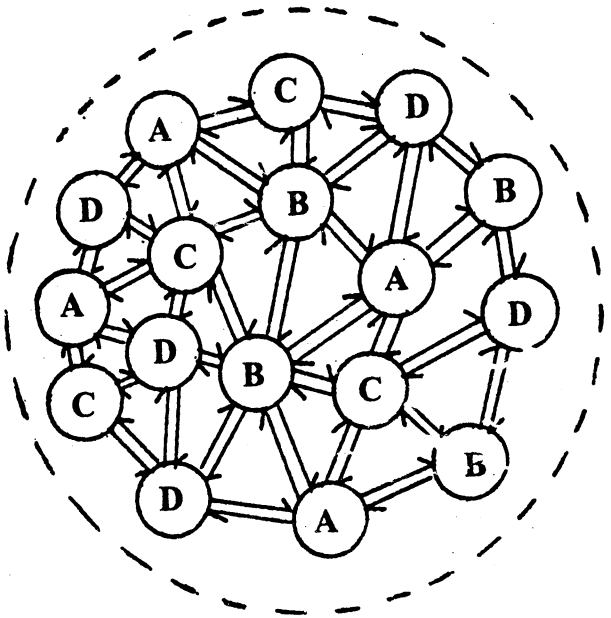

চিত্র নং 2 : A, B,C, D চারটি প্রজাতির কম্যুনিটি—যারা পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত

(C) **বায়োম ইকোলজি ঃ** পরিবেশে সাধারণতঃ আমরা একটি বসতি স্থানে বিভিন্ন জীবগোষ্ঠীর বৃদ্ধির বিভিন্ন পর্যায় (Succession) দেখি। বিভিন্ন গোষ্ঠীকে (Communities) একক হিসাবে গ্রহণ করে একই বসতি স্থানে ও একই পরিবেশে অধ্যয়ন করা এই বায়োম ইকোলজির বিষয়বস্তু (চিত্র নং 3)।

(D) **ইকোসিস্টেম ইকোলজি ঃ** ইহা বাস্তুবিদ্যার আধুনিকতম শ্রেণীবিভাগ। একটি পরিবেশে অজৈব ও জৈব উপাদানের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক অধ্যায়নই এই ইকোসিস্টেম ইকোলজির বিষয়বস্তু। এই ইকোসিস্টেম ইকোলজি অজৈব এবং জৈব সম্প্রদায়ের মধ্যে শক্তি ও পুষ্টির প্রবাহও বিশ্লেষণ করে (চিত্র নং 4)।

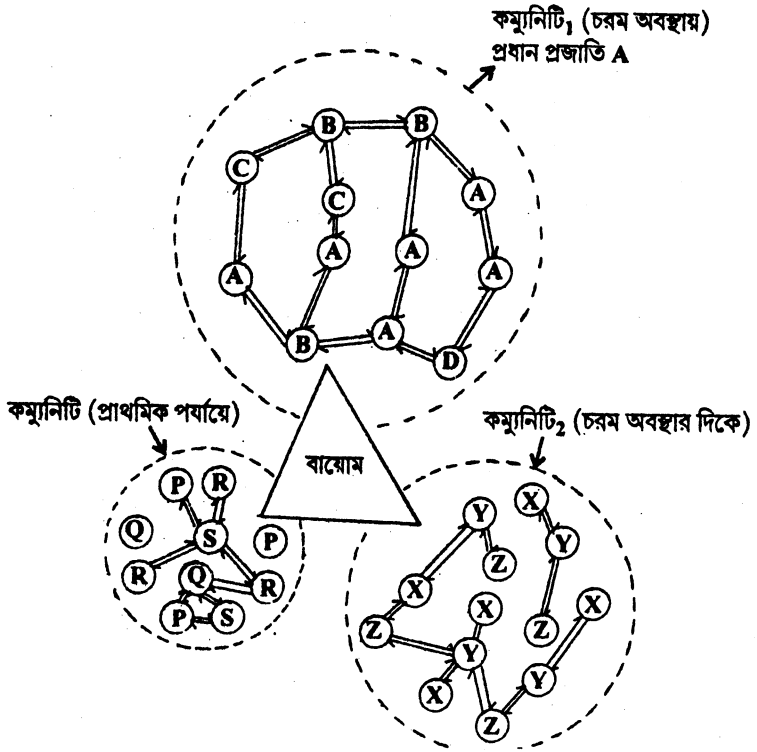

চিত্র নং 3 : বৃদ্ধির বিভিন্ন পর্যায়ে (succession) তিনটি কম্যুনিটির বায়োম যারা পারস্পরিক অন্তঃক্রিয়ায় রত—বায়োম ইকোলজি

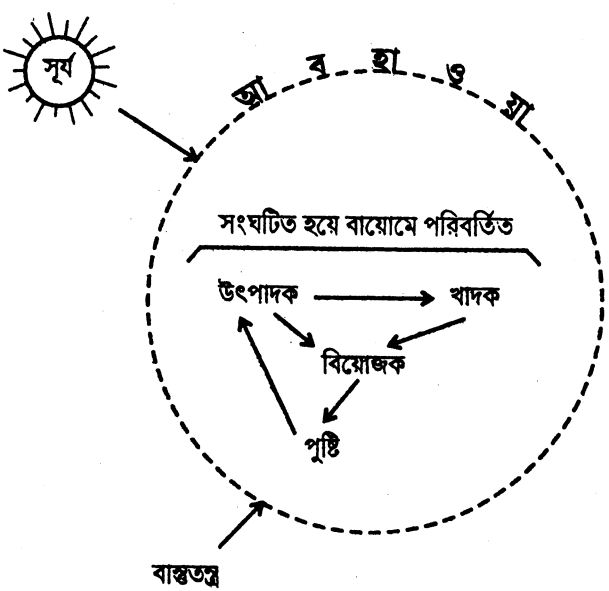

চিত্র নং 4 : পরিবেশে অজৈব ও জৈব উপাদান যারা পারস্পরিক আন্তঃক্রিয়ার মাধ্যমে একটি সম্পূর্ণ বাস্তুতন্ত্র গঠন করে—ইকোসিস্টেম ইকোলজি

1.4 বাস্তুবিদ্যার সুযোগ

বর্তমান প্রেক্ষাপটে বাস্তুবিদ্যা বা Ecology-র গুরুত্ব অপরিসমী। মানব সমাজের সঙ্গে পরিবেশের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক থাকায় বাস্তুবিদ্যা সম্পর্কে জনসাধারণের সচেতনতা দিন দিন বাড়ছে। পরিবেশ দূষণ নির্ণয় এবং নিয়ন্ত্রণে বাস্তুবিদ্যার গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। আমেরিকা ও ব্রিটেন সহ পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নত দেশ এমনকি ভারতেও কোন শিল্প স্থাপন বা প্রকল্প চালু করার আগে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের কাছ থেকে পরিবেশ সম্পর্কিয় ছাড়পত্তরে প্রয়োজন হয়। উন্নত দেশগুলিতে পরিবেশ বিজ্ঞানী বা বাস্তুবিদ্দের (Ecologists) নিয়ে একটি স্থায়ী কমিটি থাকে যারা সরকারকে পরিবেশগত সমস্যার উপদেশ দেয়। এই কমিটিগুলিতে বাস্তুবিদ্দের চাকরির সুযোগ আছে। পরিবেশ জৈব প্রযুক্তি বা Environmental Biotechnology-র একটি নতুন শ্রেণীবিভাগ হচ্ছে Ecotoxicology। কোন একটি বাস্তুতন্ত্রের খাদ্যশৃঙ্খলে (Food Chain) বিভিন্ন ট্রফিক লেভেলে পরিবেশের বিভিন্ন দূষণকারী পদার্থ (Pollutants) এবং বিষের (Toxicants) যে প্রভাব, তা আলোচিত হয় Ecotoxicology তে। পরিবেশে বিভিন্ন দূষণকারী পদার্থের উপস্থিতি নির্ণয়ের একটি অতি উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে জীব পরিদৃশ্যন বা Biomonitoring। Ecotoxicology এবং Biomonitoring উভয়ক্ষেত্রেই বাস্তুবিদ্দের প্রয়োজন। এছাড়াও কৃষি জৈব প্রযুক্তিতে (শস্য আবর্তন বা Crop Rotation) বিভিন্ন পেস্ট দমনে বা Pest Management) বাস্তুবিদ্দের বা Ecologist- দের বিশেষ প্রয়োজন। প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণেও বাস্তুবিদ্যার প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না।

1.5 সারাংশ

প্রকৃতির গঠন ও কাজ সম্বন্ধে জ্ঞানার্জনেই হচ্ছে বাস্তুবিদ্যা (Ecology) (Odum, 1963, 1969, 1971)। বাস্তুবিদ্যা হচ্ছে আন্তঃক্রিয়ার (Interaction) একটি বৈজ্ঞানিক জ্ঞান যা স্থির করে জীবের বিস্তৃতি এবং পরিমাণ (Krebs, 1985)। ইকোলজি শব্দটি দুটি গ্রীক শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। যথা— 'Oikos' অর্থ 'বাসস্থান' এবং 'Logos' অর্থ 'জ্ঞান', অর্থাৎ জীব বাসস্থান সম্পর্কে জ্ঞানার্জন। জার্মান বিজ্ঞানী Ernest Haeckel, 1886 সালে ইকোলজি শব্দটি প্রথম প্রয়োগ করেন। বাস্তুবিদ্যার তিনটি প্রধান উপবিভাগ দেখা যায় এবং এদের ভিত্তি হল—

1. নামকরণের (Taxonomy) উপর ভিত্তি করে— আধুনিক বাস্তুবিদ্দের মতে উদ্ভিদ বাস্তুবিদ্যা (Plant Ecology) এবং প্রাণী বাস্তুবিদ্যা (Animal ecology)-র বর্তমানে কোন প্রয়োজন নেই।
2. বসতি স্থাপন (Habitat) সম্পর্কের ভিত্তিতে—ভিন্ন ভিন্ন বসতি অঞ্চলে জীব ও পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
3. অর্গানাইজেশনের উপর ভিত্তিতে—একটি বা একগোষ্ঠী জীবের উপর ভিত্তি করে গঠিত। ইহার দুটি উপবিভাগ হচ্ছে ঃ
   (i) অটোইকোলজি— একটি মাত্র প্রজাতির সঙ্গে অন্য ভিন্ন প্রজাতি ও সেইখানকার পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্ক বোঝায়।

(ii) সাইনেকোলজি— বিভিন্ন প্রজাতির জীবের সঙ্গে পরিবেশের সম্পর্ক বোঝায়। সাইনেকোলজি আবার চারটি শাখায় বিভক্ত ঃ

(A) পপুলেশন ইকোলজি— একই প্রজাতির বিভিন্ন জীবের মধ্যে ও পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্ক।

(B) কম্যুনিটি ইকোলজি— বিভিন্ন প্রজাতির জীবের মধ্যে ও পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্ক।

(C) বায়োম ইকোলজি— একই পরিবেশ এবং একই বসতি স্থানে বিভিন্ন জীবগোষ্ঠীকে একক হিসাবে ধরাই বায়োম ইকোলজির উদ্দেশ্য।

(D) ইকোসিস্টেম ইকোলজি— একটি পরিবেশে অজৈব ও জৈব উপাদানের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক বোঝায়।

পরিবেশ দূষণ নির্ণয় ও প্রতিকারে, পরিবেশ জৈব প্রযুক্তিতে, কৃষি জৈব প্রযুক্তিতে ও প্রাকৃতিক সম্পর্ক সংরক্ষণে বাস্তুবিদ্যা বা Ecology-র সুযোগ অপরিসীম।

1.6 প্রশ্নাবলী

1. তুলনা করুন ঃ

(a) অটোইকোলজি ও সাইনেকোলজি

(b) পপুলেশন ইকোলজি ও কম্যুনিটি ইকোলজি

(c) বায়োম ইকোলজি ও ইকোসিস্টেম ইকোলজি

2. সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন ঃ

(a) বাস্তুবিদ্যা বা Ecology কাকে বলে?

(b) ইকোলজি শব্দটির প্রকৃত অর্থ কি?

(c) কোন্ বিজ্ঞানী ইকোলজি শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন?

(d) অর্গানাইজেশনের ভিত্তিতে বাস্তুবিদ্যার প্রধান কয়টি উপবিভাগ ও কি কি?

(e) বাস্তুবিদ্যার আধুনিকতম শ্রেণীবিভাগের নাম লিখুন।

3. দীর্ঘ উত্তর ভিত্তিক প্রশ্নের উত্তর দিন ঃ

(a) বাস্তুবিদ্যা কাকে বলে? বাস্তুবিদ্যার বিভিন্ন উপাদানগুলি আলোচনা করুন

(b) বাস্তুবিদ্যা অধ্যায়নের সুযোগ সম্বন্ধে আপনার মতামত ব্যাখ্যা করুন।

4. শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

(a) পরিবেশের যেখানেই জীবের অস্তিত্ব বর্তমান তাকেই একত্রে _____ বলে।

(b) যে স্থানীয় ভৌত ও রাসায়নিক পরিবেশ একটি জীবকে তার বসতিস্থানে বাঁচতে সাহায্য করে, তাকে _____ বলে।

(c) অটোকাইলজির একক হচ্ছে _____।

(d) সাইনেকোলজির একক হচ্ছে _____।

1.7 উত্তরমালা

1. (a) 1.3 অংশে এর উত্তর পাবেন।

(b) 1.3 অংশে এর উত্তর পাবেন।

(c) 1.3 অংশে এর উত্তর পাবেন।

2. (a) 1.2.1 অংশে এর উত্তর দেওয়া আছে।

(b) এই প্রশ্নটির উত্তরের জন্য 1.2.2 অংশটি দেখুন।

(c) এই প্রশ্নটির উত্তরের জন্য 1.2:2 অংশে বলা হয়েছে।

(d) এই প্রশ্নটির উত্তরের জন্য 1.3 অংশটি দেখুন।

(e) 1.3 অংশে এই প্রশ্নটির উত্তর বলা হয়েছে।

3. (a) এই প্রশ্নটির উত্তর 1.2.1 অংশে বলা হয়েছে। পরবর্তী প্রশ্নের উত্তর 1.3 অংশে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

(b) 1.5 অংশে এই প্রশ্নের উত্তর বলা হয়েছে।

4. (a) বায়োস্ফিয়ার

(b) মাইক্রোহ্যাবিটেট

(c) পপুলেশন

(d) কম্যুনিটি

একক 2 ❑ বাস্তুতন্ত্রের বাস্তুবিদ্যা (Ecosystem Ecology)

গঠন

2.1 প্রস্তাবনা

উদ্দেশ্য

2.2 বাস্তুতন্ত্র

2.3 বাস্তুতন্ত্রের উপাদান

2.3.1 কার্যভিত্তিক উপাদান

2.3.2 সাংগঠনিক উপাদান

2.4 খাদ্যস্তর

2.5 খাদ্যশৃঙ্খল

2.5.1 তৃণভোজী-ভিত্তিক খাদ্যশৃঙ্খল

2.5.2 মৃতভোজী-ভিত্তিক খাদ্যশৃঙ্খল

2.6 খাদ্য জালক

2.7 বাস্তুতন্ত্রের পিরামিড

2.7.1 বাস্তুতন্ত্রের পিরামিডের শ্রেণীবিভাগ

2.7.2 সংখ্যার পিরামিড

2.7.3 জীবভরের পিরামিড

2.8 বাস্তুতন্ত্রের শক্তির প্রবাহ

2.8.1 বাস্তুতন্ত্রে শক্তির একমুখী প্রবাহ

2.8.2 বাস্তুতন্ত্রে শক্তি প্রবাহের মডেল

2.8.3 এক-চ্যানেল প্রবাহ মডেল

2.8.4 'Y' আকৃতির শক্তি প্রবাহ মডেল

2.8.5 সর্বজনীন শক্তি প্রবাহ মডেল

2.9 সারাংশ

2.10 প্রশ্নাবলী

2.11 উত্তরমালা

2.1 প্রস্তাবনা

বাস্তুতন্ত্র বাস্তুবিদ্যার মৌল কার্যকরী একক। বাস্তুতন্ত্র আসলে স্ব-নির্ধারিত প্রাকৃতিক তন্ত্র যার মাধ্যমে অজৈব ও জৈব পরিবেশ মিথস্ক্রিয়া করে একটি সুস্থির তন্ত্র গঠন করে। বাস্তুতন্ত্রের বিজ্ঞানে জীবমণ্ডলে জীবগোষ্ঠীর পারস্পরিক এবং জীবগোষ্ঠী ও পরিবেশের মধ্যে কার্যগত সম্পর্কের বিষয়ে আলোচনা করা

হয় (যেমন, খাদ্য-খাদক সম্পর্ক)। এছাড়া সজীব এবং জড় উপাদানের মধ্যে শক্তির প্রবাহ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি—

- বাস্তুতন্ত্রের সংজ্ঞা দিতে পারবেন।
- বাস্তুতন্ত্রের কার্যভিত্তিক ও সাংগঠনিক উপাদানের ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।
- খাদ্যস্তর ও খাদ্যশৃঙ্খল সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- তৃণভোজী এবং মৃতভোজী-ভিত্তিক খাদ্যশৃঙ্খলের ব্যাখ্যা দিতে পারবেন এবং দুটির মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করতে পারবেন।
- বাস্তুতন্ত্রের পিরামিড সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন এবং সংখ্যার পিরামিড ও জীবভরের পিরামিডের পার্থক্যগুলি বুঝতে পারবেন।
- বাস্তুতন্ত্রে শক্তি কিভাবে প্রবাহিত হয় এবং শক্তি প্রবাহের বিভিন্ন মডেলের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।

2.2 বাস্তুতন্ত্র (Ecosystem)

বাস্তুতন্ত্র বাস্তুবিদ্যাব মূল কার্যকরী একক। 'Ecosystem' শব্দটি টান্সলে (A.G. Tansley) 1935 সালে প্রথম ব্যবহার করেন। তাঁর মতে 'Eco' শব্দটির অর্থ 'পরিবেশ'। বিজ্ঞানী ওয়েবস্টার (Webster) 'System' কথাটি বলতে বুঝিয়েছেন পুঞ্জীকৃত বস্তুসমূহের একে অপরের সঙ্গে অন্তঃবিক্রিয়া। বিজ্ঞানী চার্চম্যান (Churchman, 1968) বলেন যে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্য প্রাকৃতিক বস্তুর মধ্যে সমন্বয় সাধনই বাস্তুতন্ত্র।

বাস্তুতন্ত্রের সংজ্ঞা হিসাবে বলা যায়, যে বিশেষ পদ্ধতিতে কোন বসতি স্থানে জীবগোষ্ঠীগুলি একে অপরের সঙ্গে এবং ঐ বসতি অঞ্চলের অজৈব পরিবেশের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া করে একটি সুস্থিত (Stable) তন্ত্র গঠন করে, সেই তন্ত্র গঠনের ক্রিয়া পদ্ধতিকে বাস্তুতন্ত্র বা Ecosystem বলে। (কেনডাই, ওডাম; 1968 ও 1971)।

2.3 বাস্তুতন্ত্রের উপাদান

এই অংশে আমরা বাস্তুতন্ত্রের উপাদান নিয়ে আলোচনা করব। বিজ্ঞানী ওডাম 1966 সালে বাস্তুতন্ত্রের উপাদানগুলিকে দুটি ভাগে ভাগ করেন। যথা—

1. কার্যভিত্তিক উপাদান
2. সাংগঠনিক উপাদান

দেখা যাক এই উপাদানগুলি কি কি।

2.3.1 কার্যভিত্তিক উপাদান

কার্যভিত্তিক উপাদান আবার দুই ভাগে বিভক্ত—স্বভোজী ও পরভোজী।

(ক) স্বভোজী উপাদান (Autotrophic components) ঃ যে সকল জীব নিজেরাই খাদ্য তৈরী করতে পারে তাদের স্বভোজী উপাদান বলে। সবুজ উদ্ভিদ, ক্লোরোফিলযুক্ত প্রাণী (যেমন ইউগ্লিনা), সালোকসংশ্লেষকারী ব্যাক্টেরিয়া, কেমোসিন্থেটিক জীবাণু ইত্যাদি বাস্তুতন্ত্রের স্বভোজী উপাদান। এরা সৌরশক্তি শোষণ করে বিভিন্ন অজৈব উপাদান সহযোগে (প্রধানতঃ কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন) জটিল শর্করাজাতীয় খাদ্য তৈরী করতে সক্ষম।

গ্লুকোজ ছাড়াও প্রোটিন, অ্যামাইনো অ্যাসিড প্রভৃতি অতি প্রয়োজনীয় উপাদানও সংশ্লেষিত হয়। বাস্তুতন্ত্রে স্বভোজী উপাদানগুলি সৌরশক্তিকে রাসায়নিক শক্তিতে পরিবর্তিত করে বলে কোন কোন বিজ্ঞানী এই স্বভোজী উপাদানকে ট্রান্সডিউসার (Transducer) বলে অভিহিত করেছেন।

(খ) পরভোজী উপাদান (Heterotrophic components) ঃ যে-সকল জীব নিজেরা খাদ্য তৈরী করতে পারে না এবং খাদ্যের জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে স্বভোজী উপাদানের উপর নির্ভরশীল তাদেরকেই পরভোজী উপাদান বলে। কিছু ক্লোরোফিল বিহীন উদ্ভিদ এবং সকল প্রাণী এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

2.3.2 সাংগঠনিক উপাদান

সাংগঠনিক উপাদানকে আমরা চার ভাগে ভাগ করতে পারি।

(ক) অজৈব উপাদান (Abiotic components) ঃ পরিবেশের জড় পদার্থ এবং এদের বিভিন্ন যৌগ নিয়ে অজৈব উপাদান গঠিত। জল, কার্বন-ডাই-অক্সাইড, নাইট্রোজেন, ফসফেট, প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, লিপিড ইত্যাদি অজৈব উপাদানের অন্তর্ভুক্ত। এছাড়াও আবহাওয়া, উষ্ণতা, আলো প্রভৃতিকেও অজৈব উপাদান হিসাবে গণ্য করা হয়।

(খ) উৎপাদক (Producer) : পরিবেশের স্বভোজী উপাদানকে উৎপাদক বলে। স্থলজ বাস্তুতন্ত্রে সবুজ উদ্ভিদরাই উৎপাদক হিসাবে কাজ করে। অগভীর জলজ বাস্তুতন্ত্রে উৎপাদক আবার দুই প্রকারের। যথা— (a) মাইক্রোস্কোপিক—জলে ভাসমান ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন, (b) ম্যাক্রোস্কোপিক— জলে ভাসমান বিভিন্ন উদ্ভিদ। যেমন— ঝাঁঝি ইত্যাদি।

(গ) খাদক (Consumers) ঃ পরভোজী প্রাণীরাই প্রধানতঃ এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। খাদ্য স্বভাবের উপর নির্ভর করে খাদকদের আবার বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। যথা— (a) **শাকাশী (Herbivores) :** যে সকল খাদক একমাত্র উৎপাদককেই খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে শক্তি সঞ্চয় করে তাদের শাকাশী প্রাণী বলে। শাকাশী প্রাণীরা যেহেতু উৎপাদককেই খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে সেইজন্য এদের প্রথম শ্রেণীর খাদক বা Primary Consumers বলে। বিভিন্ন বাস্তুতন্ত্রের ক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণীর খাদকের উদাহরণ বিভিন্ন রকমের। স্থলজ বাস্তুতন্ত্রের ক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণীর খাদকের উদাহরণ হচ্ছে ফড়িং, খরগোশ, হরিণ, হাতি ইত্যাদি। জলজ

বাস্তুতন্ত্রের ক্ষেত্রে জুপ্ল্যাঙ্কটন, বাটফার, ক্রাস্টাসিয়া ইত্যাদি। (b) **মাংসাশী** (Carnivores) ঃ যে সকল প্রাণী প্রথম শ্রেণীর খাদককে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে শক্তি সঞ্চয় করে তাদের মাংসাশী প্রাণী বা দ্বিতীয় শ্রেণীর খাদক বা Secondary Consumers বলা হয়। আবার যে সকল মাংসাশী প্রাণী দ্বিতীয় শ্রেণীর খাদককে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে তাদের তৃতীয় শ্রেণীর খাদক বা Tertiary Consumers বলে। স্থলজ বাস্তুতন্ত্রে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর খাদকের উদাহরণ হচ্ছে ব্যাঙ, নেকড়ে, সাপ, সিংহ ইত্যাদি। জলজ বাস্তুতন্ত্রের ক্ষেত্রে ছোট মাছ, বড় মাছ ইত্যাদি দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির খাদক।

(ঘ) বিয়োজক (Decomposers) ঃ ব্যাক্টেরিয়া, ছত্রাক এবং আণুবীক্ষণিক খাদক বিয়োজকের অন্তর্ভুক্ত। এরা উৎপাদক এবং খাদকের জটিল যৌগকে গঠিত (Decomposed) করে সরল পদার্থে পরিণত করে। এছাড়াও এরা মৃত জৈব পদার্থের ধাতবীকরণ করে।

1 নং চিত্রের ব্লক চিত্রটি থেকে উপরের শ্রেণীবিভাগটি আপনি ভালোভাবে বুঝতে পারবেন।

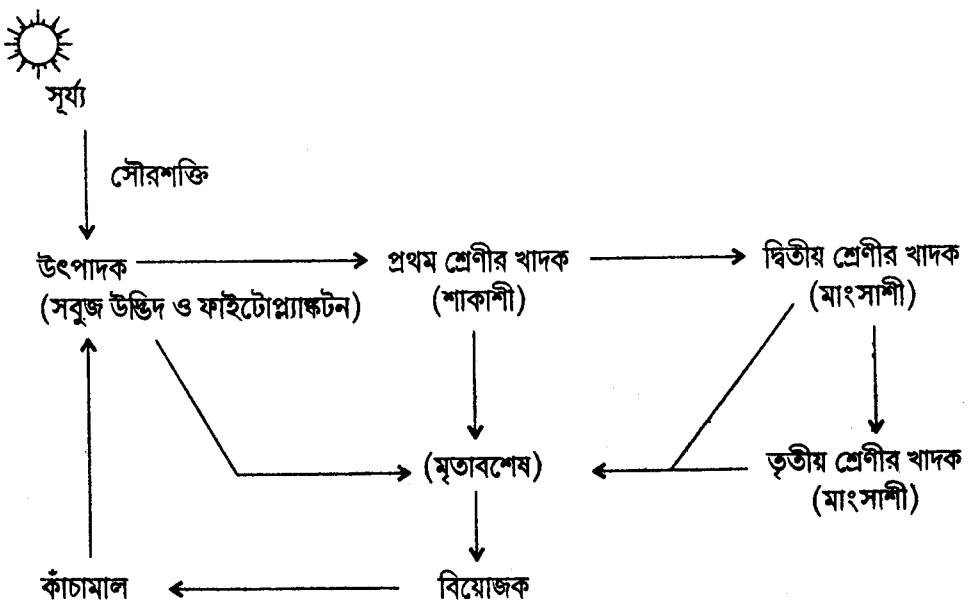

চিত্র নং 1

2.4 খাদ্যস্তর (Trophic Level)

খাদ্যশৃঙ্খলে কোন জীব যে খাদ্যতলে অবস্থান করে সেই খাদ্যতলকে ঐ খাদ্যশৃঙ্খলের খাদ্যস্তর বলে। আমরা জানি যে কোন বাস্তুতন্ত্রের খাদ্যশৃঙ্খলে দুই বা ততোধিক খাদ্যস্তর থাকতে পারে। উৎপাদক যেহেতু খাদ্যশৃঙ্খলের প্রথম তলে থাকে সেজন্য একে প্রথম খাদ্যস্তর বলে। খাদ্যশৃঙ্খলের প্রথম শ্রেণীর খাদক, দ্বিতীয় শ্রেণীর খাদক, তৃতীয় শ্রেণীর খাদক, চতুর্থ শ্রেণীর খাদক যথাক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম খাদ্যস্তর বা ট্রফিক লেভেলে অবস্থান করে।

আপনারা 2 নং চিত্রটি থেকে খাদ্যস্তর ব্যাপারটা ভালোভাবে বুঝতে পারবেন।

জীব/প্রজাতি ⟹	ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন →	জুপ্ল্যাঙ্কটন →	ছোট মাছ →	বড় মাছ
খাদ্যশৃঙ্খলে অবস্থান ⟹	উৎপাদক	প্রথম শ্রেণীর খাদক	দ্বিতীয় শ্রেণীর খাদক	তৃতীয় শ্রেণীর খাদক
ট্রফিক লেভেল ⟹	প্রথম	দ্বিতীয়	তৃতীয়	চতুর্থ

চিত্র নং 2 : একটি গ্রেজিং খাদ্যশৃঙ্খলের ট্রফিক লেভেল বা খাদ্যস্তর

2.5 খাদ্যশৃঙ্খল (Food Chain)

আসুন আমরা এবার খাদ্যশৃঙ্খল সম্পর্কে আলোচনা করি। প্রথমেই আমাদের জানতে হবে খাদ্যশৃঙ্খল কি। সাধারণতঃ একটি বসতিস্থানের (তৃণভূমি, বনভূমি, পুকুর, নদী, হ্রদ ইত্যাদিতে) উৎপাদক থেকে ক্রমপর্যায়ে যে পদ্ধতিতে ভক্ষক ও ভক্ষিত সম্পর্কে শক্তি প্রথম খাদক, দ্বিতীয় খাদক, তৃতীয় খাদক প্রভৃতিতে প্রবাহিত হয় তাকেই খাদ্যশৃঙ্খল বা Food Chain বলে।

পরিবেশে দুইপ্রকারের খাদ্যশৃঙ্খল দেখা যায়। (a) তৃণভোজী-ভিত্তিক খাদ্যশৃঙ্খল (Grazing Food Chain), (b) মৃতভোজী-ভিত্তিক খাদ্যশৃঙ্খল (Detritus Food Chain)।

আমরা এখন এই দুই প্রকার খাদ্যশৃঙ্খল নিয়ে আলোচনা করব।

2.5.1 তৃণভোজী-ভিত্তিক খাদ্যশৃঙ্খল (Grazing Food Chain)

এই খাদ্যশৃঙ্খল উৎপাদক থেকে শুরু হয় এবং শাকাশীর মাধ্যমে মাংসাশীতে শেষ হয়। 3 নং চিত্র থেকে আমরা ব্যাপারটা ভালোভাবে বুঝতে পারব। এই ধরনের খাদ্যশৃঙ্খল প্রত্যক্ষভাবে সৌরশক্তির উপর নির্ভরশীল এবং শক্তির প্রবাহ নিম্নলিখিত ভাবে হয়।

সূর্য্য $\xrightarrow{h\nu}$ উৎপাদক → প্রথম শ্রেণীর খাদক (তৃণভোজী) → দ্বিতীয় শ্রেণীর খাদক (মাংসাশী) → তৃতীয় শ্রেণীর খাদক (মাংসাশী)

A স্থলের বাস্তুতন্ত্র		B জলের বাস্তুতন্ত্র
ঘাস ↓	উৎপাদক	ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন ↓
ফড়িং ↓	প্রথম শ্রেণীর খাদক (শাকাশী প্রাণী)	জুপ্ল্যাঙ্কটন ↓
ব্যাঙ ↓	দ্বিতীয় শ্রেণীর খাদক (মাংসাশী প্রাণী)	ছোট মাছ ↓
সাপ	তৃতীয় শ্রেণীর খাদক (মাংসাশী প্রাণী)	বড় মাছ

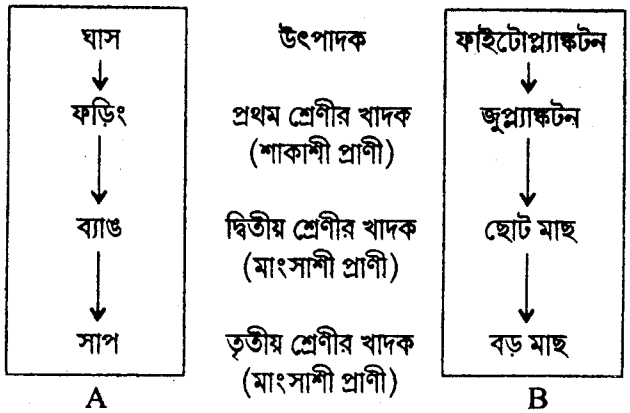

চিত্র নং 3 : গ্রেজিং খাদ্যশৃঙ্খল বা তৃণভোজী-ভিত্তিক খাদ্যশৃঙ্খল

জীব সম্প্রদায়ের মধ্যে শক্তির পবাহ এবং প্রবাহের দিক নির্ণয়ে তৃণভোজী-ভিত্তিক খাদ্যশৃঙ্খল উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। এই পদ্ধতিতে যে-কোন খাদ্যস্তরের শক্তির পরিমান একটি খাদ্যস্তর থেকে আর একটি খাদ্যস্তরে শক্তির প্রবাহ এবং বিনষ্টের পরিমান সহজেই নির্ণয় করা যায়। এই ধরনের খাদ্যশৃঙ্খলকে আবার প্রিডেটর খাদ্যশৃঙ্খলও বলে। কারণ এখানে এক স্তরের খাদক অন্য স্তরের খাদককে মেরে ভক্ষণ করে।

2.5.2 মৃতভোজী-ভিত্তিক খাদ্যশৃঙ্খল (Detritus Food Chain)

তৃণভোজী-ভিত্তিক খাদ্যশৃঙ্খলের বর্জ্য পদার্থ এবং মৃত জৈব পদার্থকে মৃতভোজ বলে। মৃতভোজের মধ্যকার শক্তি সামগ্রিকভাবে বাস্তুতন্ত্র থেকে নষ্ট হয় না, ইহা একদল খাদকের শক্তি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এই খাদকদের অর্থাৎ যারা মৃতভোজকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে তাদের মৃতভোজী বলে এবং এদের খাদ্য-শৃঙ্খলকে মৃতভোজী-ভিত্তিক খাদ্যশৃঙ্খল বলে। এই ধরণের খাদ্যশৃঙ্খলে শক্তির প্রবাহ ধাপে ধাপে না হয়ে ক্রমাগত প্রবাহিত হয়। মৃতভোজী জীবের মধ্যে অ্যালগি (Algae), ব্যাক্টেরিয়া, স্লাইমমোল্ড ছত্রাক, প্রোটোজোয়া, পতঙ্গ, মাইটস্, ক্রাসটেসিয়া, সেন্টিপেড, রটিফার, মোলাস্কা, অ্যানিলিডা, নিমাটোডা এবং কিছু মেরুদন্ডী প্রাণী উল্লেখযোগ্য।

লবণাম্বু উদ্ভিদ বা ম্যানগ্রোভ পাতার উপর ভিত্তি করে বিজ্ঞানী হেল্ড 1969 সালে এবং ওডাম 1970 সালে মৃতভোজী-ভিত্তিক খাদ্যশৃঙ্খলের একটি সুন্দর উদাহরণ দিয়েছেন। দক্ষিণ ফ্লোরিডার লোনা অঞ্চলের অগভীর উষ্ণ জলে লাল লবণাম্বু উদ্ভিদের *(Rhizophora mangle)* যে পাতা পড়ে (leaf litter) তার 5% জলে পড়ার আগেই গ্রেজিং বা তৃণভোজী পতঙ্গ দ্বারা খণ্ডীভূত (fragmanted) হয়। খণ্ডীভূত পাতা জলে পড়ার পর তার উপর কাজ করে বিভিন্ন ব্যাক্টেরিয়া, ছত্রাক, প্রোটোজোয়া ইত্যাদি। এরপর এই অর্ধ-পাচিত পাতা ভক্ষিত ও পুনঃভক্ষিত হয় একদল ছোট-ছোট প্রাণী দ্বারা, যাদের মধ্যে আছে মলভোজী বা Coprophagy। উদাহরণস্বরূপ—কাঁকড়া, ঝিনুক, কোপিপড, শ্রিম্প, অ্যাম্ফিপড, পতঙ্গের লার্ভা, মাইসিস, নিমাটোড (চিত্র নং 4) প্রভৃতি প্রাণীদের মৃতভোজী খাদক বা Detritus consumers বলে। এই সকল প্রাণীদের আবার খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে, এই মিনোল মাছকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে গেম মাছ এবং এই গেম মাছকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে মাছ ভক্ষণকারী পক্ষী, যেমন— হেরন ইত্যাদি। সাধারণতঃ এই লবণাম্বু উদ্ভিদের গুরুত্ব খুবই কম কিন্তু এই মৃতভোজী-ভিত্তিক খাদ্যশৃঙ্খল দক্ষিণ ফ্লোরিডার মাছ চাষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সুতরাং উপরোক্ত উদাহরণ থেকে দেখা যাচ্ছে যে মৃতভোজী খাদ্যশৃঙ্খলের পরিসমাপ্তি তৃণভোজী খাদ্যশৃঙ্খলের ন্যায়। কিন্তু দুটি খাদ্যশৃঙ্খলের শুরু ভিন্ন রকমের। মৃতভোজী-ভিত্তিক খাদ্যশৃঙ্খলে শক্তির পরিবহন তৃণভোজী-ভিত্তিক খাদ্যশৃঙ্খলের চেয়ে বেশী।

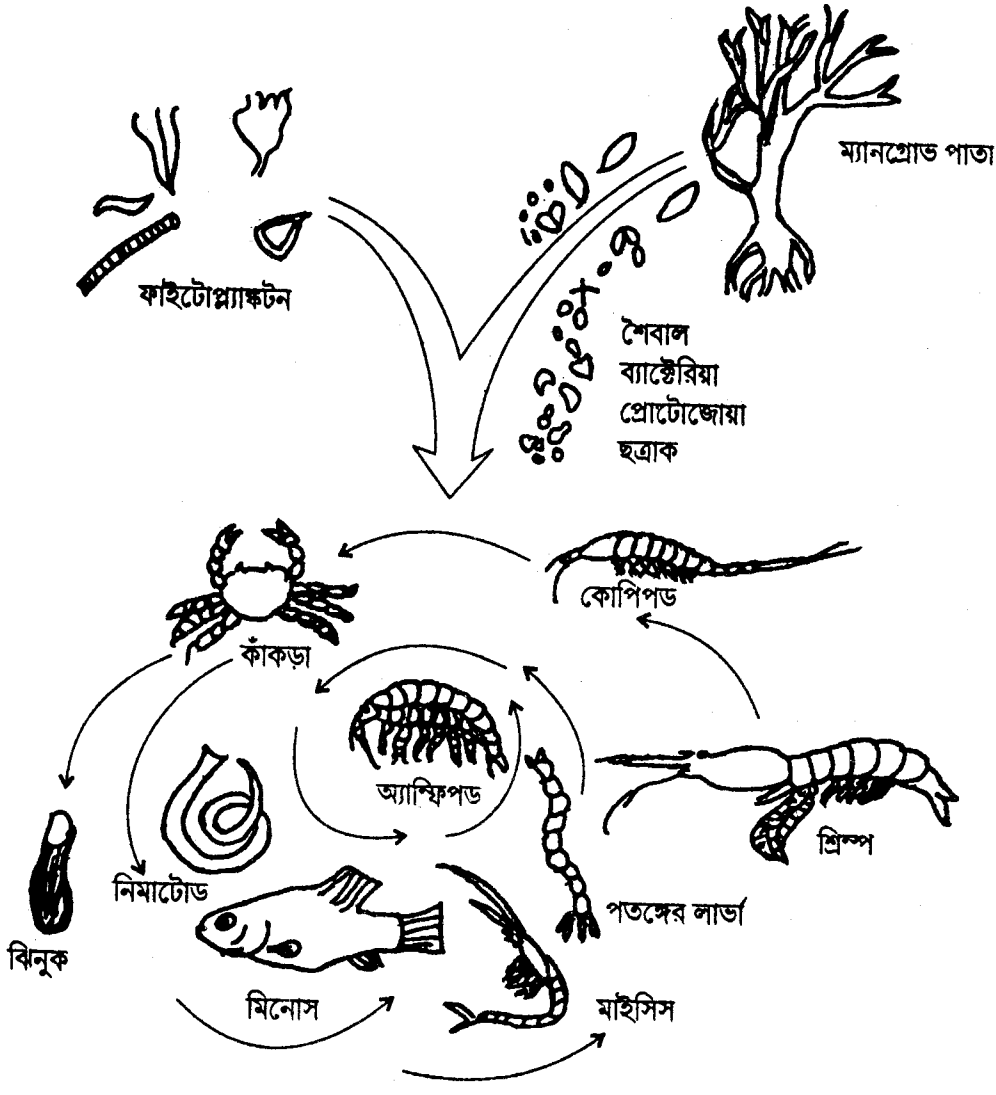

চিত্র নং 4 : ডেট্রিটাস খাদ্যশৃঙ্খল

2.6 খাদ্য জালক (Food Web)

যে-কোন বাস্তুতন্ত্র অসংখ্য আন্তঃসম্পর্কযুক্ত খাদ্যশৃঙ্খল দ্বারা গঠিত। বাস্তুতন্ত্রের শক্তি কেবলমাত্র খাদ্যশৃঙ্খলের মাধ্যমে প্রবাহিত হয় না, অসংখ্য আন্তঃসম্পর্কযুক্ত খাদ্যশৃঙ্খল দ্বারা প্রবাহিত হয়। সুতরাং জীবগোষ্ঠীর মধ্যে অসম খাদ্য সম্পর্কের ফলে একটি বাস্তুতন্ত্রের বিভিন্ন খাদ্যশৃঙ্খলের আন্তঃসংযোগে যে জালকাকার গঠন সৃষ্টি হয় তাকে খাদ্য জালক বা Food Web বলে। চিত্র নং 5-এ একটি তৃণভূমি বাস্তুতন্ত্রের খাদ্য জালক দেখানো হয়েছে।

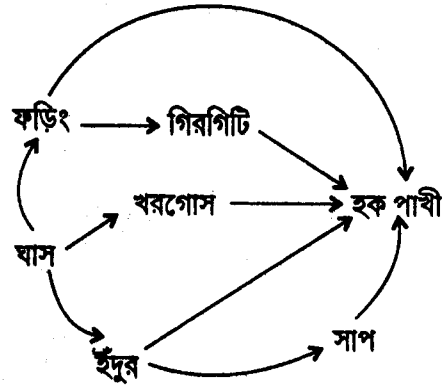

চিত্র নং 5 : তৃণমূল বাস্তুতন্ত্রের খাদ্য জালক

2.7 বাস্তুতন্ত্রের পিরামিড

কোন একটি বাস্তুতন্ত্রে বিভিন্ন খাদ্যস্তরের গঠন এবং কাজ অর্থাৎ উৎপাদক—তৃণভোজী—মাংসাশী ইত্যাদি লেখচিত্রের মাধ্যমে দেখানো যায়। একেই বাস্তুতন্ত্রের পিরামিড বলে। এক্ষেত্রে প্রথম খাদ্যস্তর বা উৎপাদক পিরামিডের ভূমি হিসাবে কাজ করে এবং পর্যায়ক্রমিক অন্যান্য খাদ্যস্তর পিরামিডের অর্ধাংশ ও শীর্ষ হিসাবে কাজ করে। কিছু কিছু বাস্তুতন্ত্রের ক্ষেত্রে পিরামিডের আকৃতি ওল্টানো (Inverted) হয়।

বাস্তুতন্ত্রের পিরামিড প্রথম বর্ণনা করেন চার্লস এলটন 1927 সালে।

2.7.1 বাস্তুতন্ত্রের পিরামিডের শ্রেণীবিভাগ

বাস্তুতন্ত্রের পিরামিডকে সাধারণতঃ তিন ভাগে ভাগ করা হয়— (ক) সংখ্যার পিরামিড (Pyramid of Numbers), (খ) জীবভরের পিরামিড (Pyramid of Biomass) এবং (গ) শক্তির পিরামিড (Pyramid of Energy)

এখানে আমরা সংখ্যার পিরামিড ও জীবভরের পিরামিড নিয়ে আলোচনা করব।

2.7.2 সংখ্যার পিরামিড

এক্ষেত্রে যে-কোন বাস্তুতন্ত্রে পর্যায়ক্রমিক খাদ্যস্তরে উৎপাদক, শাকাশী ও মাংসাশী প্রাণীদের মধ্যে সম্পর্ক তাদের সংখ্যার উপর নির্ভর করে করা হয়।

তিনটি বিভিন্ন বাস্তুতন্ত্রে এই সংখ্যার পিরামিড দেখানো হয়েছে চিত্র নং 6 (A-C) তে।

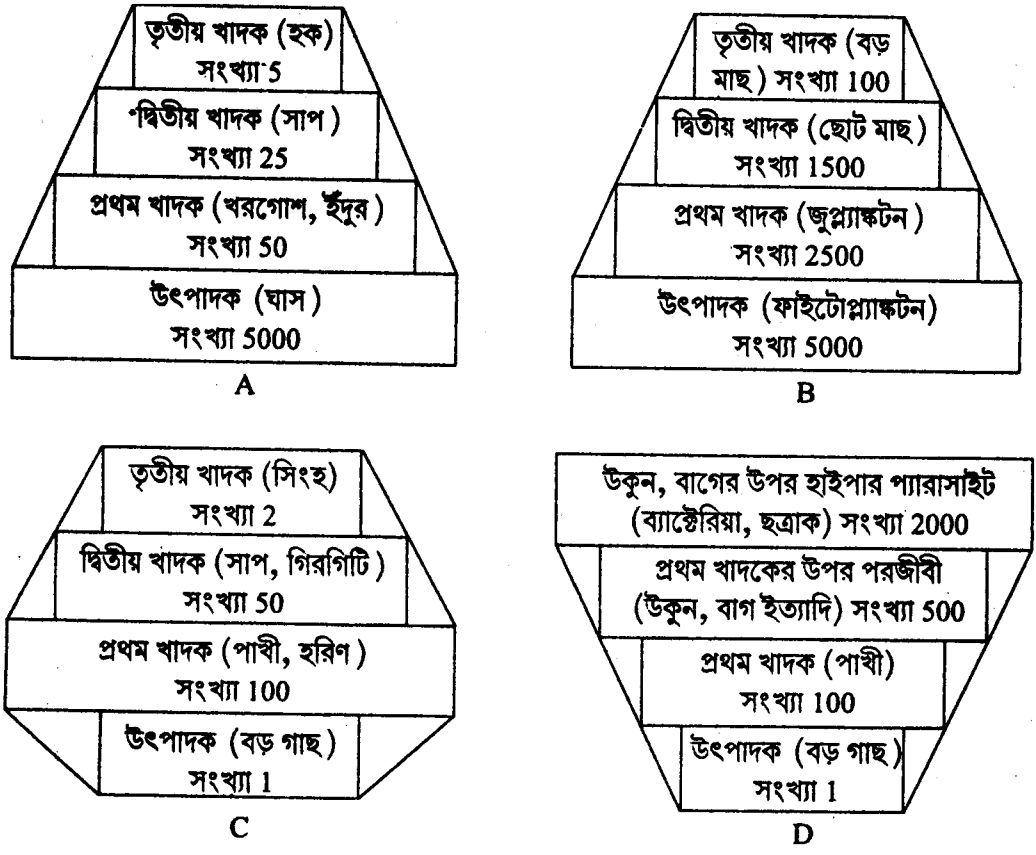

চিত্র নং 6 : বিভিন্ন বাস্তুতন্ত্রে / খাদ্যশৃঙ্খলে সংখ্যার পিরামিড
(A = তৃণভূমি, B = পুকুর, C = বনভূমি, D = পরজীবী খাদ্যশৃঙ্খল)

তৃণভূমি বাস্তুতন্ত্রে ঘাস ইত্যাদি হচ্ছে উৎপাদক এবং এদের সংখ্যা বেশী, কিন্তু পিরামিডের যত উপর দিকে যাওয়া হয় বিভিন্ন খাদ্যস্তরের সংখ্যা কমে যায়। তৃণভূমি বাস্তুতন্ত্রে প্রথম শ্রেণীর খাদক (শাকাশী প্রাণী) যেমন—খরগোস, ইঁদুর ইত্যাদির সংখ্যা উৎপাদকরে চেয়ে কম, দ্বিতীয় শ্রেণীর খাদক (মাংসাশী প্রাণী) যেমন—সাপ, গিরগিটি ইত্যাদির সংখা প্রথম শ্রেণীর খাদকের চেয়ে কম। অবশেষে তৃতীয় শ্রেণীর খাদক যেমন— হক ইত্যাদি পাখীর সংখ্যা দ্বিতীয় শ্রেণীর খাদকের চেয়ে কম। সুতরাং এক্ষেত্রে পিরামিডের আকৃতি হচ্ছে সোজা (upright)। একইরকম চিত্র দেখা যায় পুকুরের বাস্তুতন্ত্রের ক্ষেত্রে। এক্ষেত্রে উৎপাদক হচ্ছে ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন, এদের সংখ্যা বেশী। প্রথম শ্রেণীর খাদক (শাকাশী প্রাণী), যেমন জুপ্ল্যাঙ্কটন-এর সংখ্যা উৎপাদকের চেয়ে কম আবার দ্বিতীয় শ্রেণীর খাদক (মাংসাশী প্রাণী), যেমন ছোট মাছ ইত্যাদি, এদের সংখ্যা প্রথম শ্রেণীর খাদকের চেয়ে কম, তৃতীয় শ্রেণীর খাদক যেমন— বড় মাছ, এদের সংখ্যা দ্বিতীয় শ্রেণীর খাদকের চেয়ে কম। সুতরাং পিরামিডের আকৃতি অন্যরকম। বনভূমির বাস্তুতন্ত্রে উৎপাদক হচ্ছে বড় গাছ, যার সংখ্যা কম। প্রথম শ্রেণীর খাদক (শাকাশী প্রাণী) যেমন ফল ভক্ষণকারী পাখী, হরিণ, হাতী ইত্যাদি, এদের সংখ্যা উৎপাদকের চেয়ে বেশী কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর খাদক (মাংসাশী প্রাণী), যেমন সাপ, গিরগিটি ইত্যাদির সংখ্যা আবার প্রথম খাদকের চেয়ে কম। সুতরাং এক্ষেত্রে পিরামিডের আকৃতি প্রথমে ওল্টানো

(inverted) এবং পরে আবার সোজা বা upright। বনভূমি বাস্তুতন্ত্রে পরজীবী খাদ্যশৃঙ্খলের সংখ্যার পিরামিডের আকৃতিও অন্যরকম। এক্ষেত্রে উৎপাদক হচ্ছে বড় গাছ, যার সংখ্যা কম। প্রথম শ্রেণীর খাদক হচ্ছে ফল ভক্ষণকারী পাখী, যার সংখ্যা উৎপাদকের চেয়ে বেশী। পাখীর গায়ে বসবাসকারী পরজীবী যেমন উকুন, বাগ ইত্যাদির সংখ্যা পাখীর সংখ্যার চেয়ে বেশী এবং এই পরজীবীর উপর বসবাসকারী পরজীবী যেমন ব্যাক্টেরিয়া, ছত্রাক ইত্যাদির সংখ্যা উকুন, বাগ-এর চেয়ে অনেক বেশী। সুতরাং পিরামিডের যত ওপরের দিকে যাওয়া হচ্ছে, জীবের সংখ্যা ততো বাড়ছে এবং ফলস্বরূপ পিরামিডের আকৃতিটি হচ্ছে সম্পূর্ণ ওল্টানো বা inverted।

একটি পরজীবীর উপর আর একটি পরজীবীর বসবাস করাকে হাইপারপ্যারাসাইটিসম্ (Hyperparasitism) বলে। সংখ্যার পিরামিডে বিভিন্ন জীবের সংখ্যা একক ক্ষেত্রে (Unit area) নির্ণয় করা হয়। সংখ্যার পিরামিড খাদ্যশৃঙ্খলের প্রকৃত ছবি দেয় না, সুতরাং এর কার্যকারিতা কম।

2.7.3 জীবভরের পিরামিড

এক্ষেত্রে যে-কোন বাস্তুতন্ত্রে পর্যায়ক্রমিক ট্রফিক লেভের উৎপাদক, শাকাশী ও মাংসাশী প্রাণীদের মধ্যে সম্পর্ক তাদের স্টান্ডিং ক্রুপ বা Standing crop (একক ক্ষেত্রের জীবভর)-এর উপর নির্ভর করে।

তিনটি বিভিন্ন বাস্তুতন্ত্রে এই জীবভরের পিরামিড দেখানো হয়েছে চিত্র নং 7(A-C) তে।

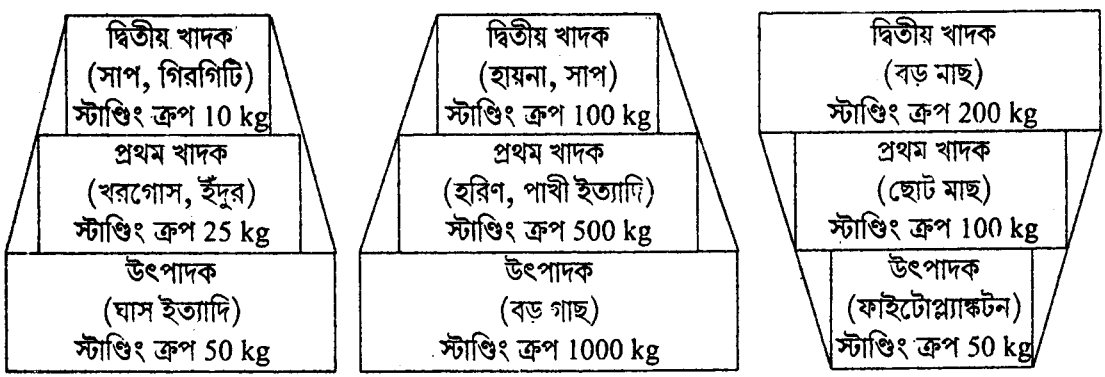

চিত্র নং 7 : বিভিন্ন বাস্তুতন্ত্রে জীবভরের (একক ক্ষেত্রে গ্রাম শুষ্ক ওজন) পিরামিড (A = তৃণভূমি, B = বনভূমি, C = পুকুর)

তৃণভূমির বাস্তুতন্ত্রে উৎপাদক হচ্ছে ঘাস ইত্যাদি। এদের স্টান্ডিং ক্রুপ বেশী, কিন্তু পর্যায়ক্রমিক খাদ্যস্তরে বিভিন্ন খাদক যেমন শাকাশী (খরগোস, ইঁদুর ইত্যাদি) এবং মাংসাশী (সাপ, গিরগিটি ইত্যাদি) প্রাণীর স্ট্যান্ডিং ক্রুপ ক্রমশঃ কমে যায়। সুতরাং পিরামিডের আকৃতি হচ্ছে সোজা বা Upright। একই চিত্র দেখা যায় বনভূমির বাস্তুতন্ত্রের ক্ষেত্রে। পুকুরের বাস্তুতন্ত্রে উৎপাদক (ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন)-এর স্টান্ডিং ক্রপ কম, প্রথম শ্রেণীর খাদক (শাকাশী প্রাণী) যেমন জুপ্ল্যাঙ্কটন-এর স্টান্ডিং ক্রপ উৎপাদকের চেয়ে বেশী এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর খাদক (মাংসাশী প্রাণী) যেমন ছোট মাছ ইত্যাদি এবং তৃতীয় শ্রেণীর খাদক যেমন বড় মাছ ইত্যাদির স্টান্ডিং ক্রপ পর্যায়ক্রমিকভাবে কমে যায়। সুতরাং পিরামিডের আকৃতি হচ্ছে ওল্টানো বা Inverted।

2.8 বাস্তুতন্ত্রে শক্তির প্রবাহ

কাজ করার সামর্থ্যকে শক্তি বলে। সকল প্রকার শক্তিকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—(ক) গতি শক্তি (Kinetic energy)। গতিশীল অবস্থায় থাকা বস্তুর মধ্যে নিহিত শক্তিকে গতিশক্তি বলে। তড়িৎ শক্তি, আলোক শক্তি এবং তাপ শক্তি গতি শক্তির উদাহরণ। (খ) স্থিতি শক্তি (Potential energy) : কোন কিছুর মধ্যে সঞ্চিত রাসায়নিক শক্তিই হচ্ছে স্থিতি শক্তি। উদাহরণ—কয়লা, তেল ইত্যাদির মধ্যে সঞ্চিত শক্তি হচ্ছে স্থিতি শক্তি।

সূর্য পৃথিবীর সকল শক্তির উৎস। পৃথিবীতে আপাতিত সৌর শক্তির পরিমাণ হচ্ছে $5\times10^6 kJm^{-2}yr^{-1}$। পৃথিবীতে আপতিত মোট সৌর বিকিরণের 50% দৃশ্যে সাহায্যকারী আলোক তরঙ্গ যারা উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষে সাহায্য করে (Photosynthetically Active Range বা PAR), সর্বাধিক অনুকূল অবস্থায় পৃথিবীতে আপতিত সৌর শক্তির 5% সরাসরি আবদ্ধ (Trap) করতে পারে একমাত্র সবুজ উদ্ভিদ এবং অন্যান্য সালোকসংশ্লেষকারী জীব। সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় অজৈব পরিপোষক (Nutrients) সহযোগে গঠিত খাদ্য অণুর মধ্যে সৌর শক্তি স্থিতি শক্তি বা রাসায়নিক শক্তিরূপে সঞ্চিত থাকে এবং ইহাকে বলে 'মোট প্রাথমিক উৎপাদন' বা Gross Primary Productivity (GPP)। মোট প্রাথমিক উৎপাদনের মাত্রাকে নিম্নলিখিত সূত্র দ্বারা নিরূপণ করা হয়—

ক্লোরোফিল / গ্রাম শুষ্ক ওজন / একক ক্ষেত্র অথবা CO_2 এর আবদ্ধর পরিমাণ / গ্রাম ক্লোরোফিল / ঘন্টা।

মোট প্রাথমিক উৎপাদনশীলতায় শক্তির কিছু পরিমাণ উদ্ভিদের বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ায় (যেমন, শ্বসন) ব্যবহৃত হয় এবং অবশিষ অংশ সঞ্চিত থাকে। এই শেষোক্ত পরিমাণ শক্তিকে 'নীট প্রাথমিক উৎপাদনশীলতা' বা Net Primary Productivity বলে।

অতএব, NPP = GPP = R, R = Respiration বা শ্বসন। শক্তি এই NPP অবস্থায় এক খাদ্যস্তর থেকে আর এক খাদ্যস্তরে প্রবাহিত হয়।

2.8.1 বাস্তুতন্ত্রে শক্তির একমুখী প্রবাহ

বাস্তুতন্ত্রে শক্তি প্রবাহ একমুখী। কারণ, শক্তির বিভিন্ন আন্তঃপরিবর্তনশীল (Interconvertible) রূপ আছে এবং শক্তির রূপান্তর (Transformation of energy) তাপগতিবিদ্যার (Thermodynamics) সূত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তাপগতিবিদ্যার সূত্রের ব্যাখ্যা থেকে বাস্তুতন্ত্রে শক্তির একমুখী প্রবাহের সূত্র পাওয়া যায়।

তাপগতিবিদ্যার সূত্র (Law of thermodynamics)

প্রথম সূত্র—তাপগতিবিদ্যার প্রথম সূত্র শক্তির অক্ষয় সূত্র (Law of conservation of energy) নামেও পরিচিত। এই সূত্র অনুসারে শক্তিকে এক রূপ থেকে অন্য রূপে রূপান্তরিত করা যায়, কিন্তু সৃষ্টি বা ধ্বংস করা যায় না। বাস্তুতন্ত্রের ক্ষেত্রে উৎপাদক বা সবুজ উদ্ভিদ সৌর শক্তিকে খাদ্যস্থিত রাসায়নিক শক্তিকে রূপান্তরিত করে। উদ্ভিদের শ্বসন প্রক্রিয়ায় খাদ্যের জারণে তাপ শক্তি উৎপন্ন হয় অর্থাৎ রাসায়নিক শক্তি তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। আবার শাকাশী প্রাণী বা প্রথম শ্রেণীর খাদক উদ্ভিদকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে এবং উদ্ভিদের মধ্যে সঞ্চিত রাসায়নিক শক্তি আহরণ করে এবং শ্বসনের দ্বারা তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত করে। এইভাবে শক্তির কেবল রূপান্তর ঘটে, সৃষ্টি বা ধ্বংস হয় না।

দ্বিতীয় সূত্র—তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র অনুসারে শক্তি যখন এক রূপ থেকে অন্য রূপে রূপান্তরিত হয় তখন কিছু পরিমাণ শক্তির হ্রাস বা হানি ঘটে। বাস্তুতন্ত্রের ক্ষেত্রে উৎপাদক শ্বসন প্রক্রিয়ায় রাসায়নিক শক্তি তাপ শক্তিতে পরিবর্তিত হয় এবং এর ফলে কিছু পরিমাণ শক্তির হ্রাস ঘটে এবং খাদ্যশৃঙ্খলের পরবর্তী বিভিন্ন ট্রফিক লেভেলেও বিভিন্ন শারীরবৃত্তিয় প্রক্রিয়ায় (বিশেষতঃ শ্বসনে) কিছু পরিমাণ শক্তির হানি ঘটে।

2.8.2 বাস্তুতন্ত্রে শক্তি প্রবাহের মডেল

বাস্তুতন্ত্রে শক্তি প্রবাহের মডেল তিন প্রকারের। যথা—

(ক) এক চ্যানেল প্রবাহ মডেল (Single channel energy flow model)

(খ) Y-আকৃতির শক্তি প্রবাহ মডেল (Y-shaped energy flow model)

(গ) সার্বজনীন শক্তি প্রবাহ মডেল (Universal energy flow model)

2.8.3 এক-চ্যানেল প্রবাহ মডেল

একমুখী শক্তির প্রবাহ যখন উৎপাদক থেকে প্রথম শ্রেণীর খাদকে, প্রথম শ্রেণীর খাদক থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীর খাদকে এইভাবে পর্যায়ক্রমে একই দিকে চলতে থাকে এবং প্রতি খাদ্যস্তরে পূর্বের স্তর থেকে শক্তির পরিমাণ হ্রাস পায় তাকেই এক-চ্যানেল প্রবাহ মডেল বলে। এক-চ্যানেল শক্তি প্রবাহ মডেলে উৎপাদকের উৎপাদিত খাদ্যে কত শক্তি সঞ্চিত হয়, কিভাবে সেই শক্তি প্রথম শ্রেণীর খাদকে প্রবাহিত হয়, কত শক্তি নষ্ট হয় এবং কতটা অব্যবহৃত প্রভৃতি তথ্য R. Lindeman (1942) -এর মিনেসোটার সিডার বগ হ্রদের বাস্তুতন্ত্রের শক্তি প্রবাহ থেকে বোঝা যায় (চিত্র নং ৪)।

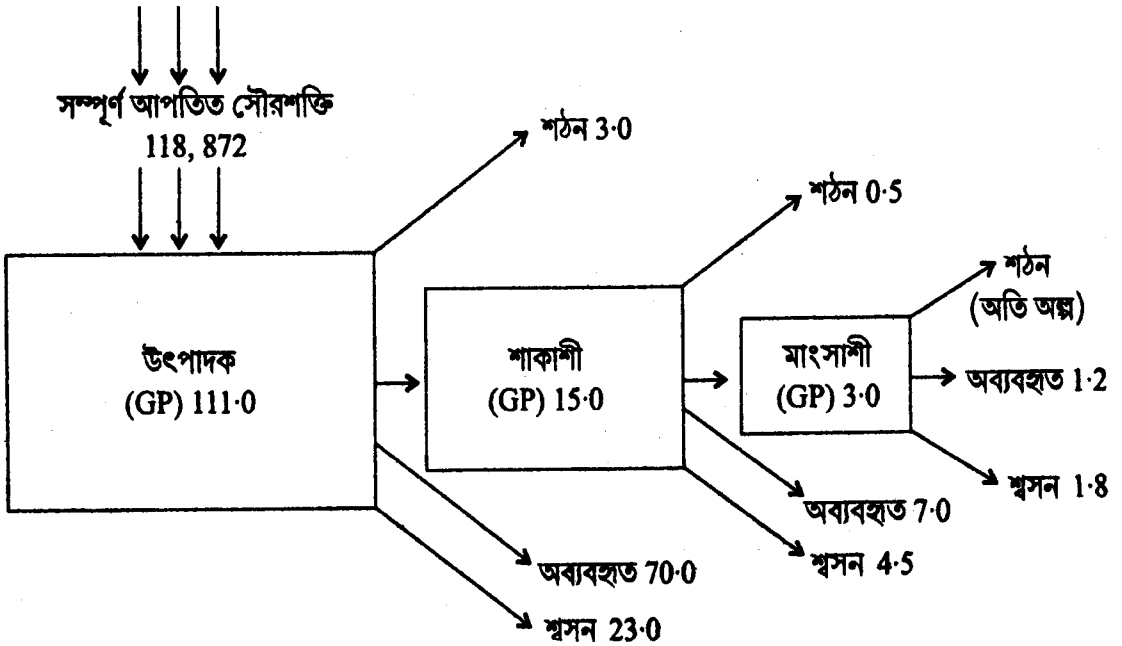

চিত্র নং 8 : শক্তি প্রবাহের এক-চ্যানেল মডেল

চিত্র নং ৪ থেকে দেখা যায় যে সম্পূর্ণ আপতিত সৌর শক্তি (118,872 g cal/cm^2 / yr)-এর মধ্যে 118, 761 gcal/cm^2/yr হচ্ছে অব্যবহৃত শক্তি ও উৎপাদকের সামগ্রিক উৎপাদনশীলতা

বা Gross production (GP) হচ্ছে 111 g cal/cm^2/yr। GP= নীট উৎপাদনশীলতা (NP) + শ্বসন (R)। সুতরাং উৎপাদকের শক্তি আবদ্ধ করার ক্ষমতা হচ্ছে 0.1% । এই শক্তির 21% বা 23 g cal/cm^2/yr বিপাকীয় কাজের (মূলতঃ শ্বসন) জন্য ব্যয় হয়। অতএব উৎপাদকের NP=88 g cal/cm^2/yr অব্যবহৃত থাকে 79.5% অর্থাৎ 70 g cal/cm^2/yr, decomposition বা শঠনের জন্য নষ্ট হয় 3.4% বা 3 g cal/cm^2/yr। উৎপাদকের নীট উৎপাদনশীলতা বা NP 17% অর্থাৎ 15 g cal/cm^2/yr গ্রহণ করে প্রথম শ্রেণীর খাদক বা শাকাশী প্রাণীরা। সুতরাং শাকাশী প্রাণীদের সামগ্রিক উৎপাদনশীলতা বা GP হচ্ছে 15 g cal/cm^2/yr। এই শক্তির 30% অর্থাৎ 4.5 g cal/cm^2/yr নষ্ট হয় শ্বসনের ফলে। শাকাশী প্রাণীর NP হচ্ছে 10.5 g cal/cm^2/yr, অব্যবহৃত শক্তি 7 g cal/cm2/yr, শঠনের জন্য নষ্ট হয় 0.5 g cal/cm^2/yr। শাকাশী প্রাণী NP (10.5 g cal/cm^2/yr)-এর 28.6% বা 3 g cal/cm^2/yr গ্রহন করে দ্বিতীয় শ্রেণীর খাদক বা মাংসাশী প্রাণীরা। অর্থাৎ মাংসাশী প্রাণীদের সামগ্রিক উৎপাদনশীলতা বা GP হচ্ছে 3.0 g cal/cm^2/yr, শ্বসনের জন্য ব্যয় হয় 1.8 g cal/cm^2/yr বা GP-এর 60%। সুতরাং এই মডেল থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে উৎপাদকদের বিপাকীয় কাজের জন্য শক্তি ব্যয় হয় 21%, শাকাশী প্রাণীদের ক্ষেত্রে 30% এবং মাংসাশী প্রাণীদের ক্ষেত্রে 60%। অর্থাৎ উৎপাদক থেকে খাদ্যশৃঙ্খলের যত উপরের দিকে যাওয়া যায় শক্তির হ্রাস পর্যায়ক্রমিক বৃদ্ধি পায়। এক-চ্যানেল শক্তি প্রবাহ মডেল থেকে কতকগুলি ঘটনা দেখা যায়। যথা— (ক) শক্তির প্রবাহ সর্বদা একমুখী। (খ) উৎপাদক যে শক্তি আত্তীকরণ করে সেই শক্তি কখনও আবার সৌর শক্তি হিসাবে ফিরে যেতে পারে না। একইভাবে উৎপাদক থেকে শক্তি যখন শাকাশী প্রাণীতে যায় সেই শক্তি আবার উৎপাদকে ফিরতে পারে না। এইভাবে শক্তি তার আগের খাদ্যস্তরে কখনও ফিরতে পারে না। (গ) শক্তির এই একমুখী প্রবাহ নষ্ট হয়ে যাবে যদি প্রাথমিক উৎস অর্থাৎ সৌর শক্তি সম্পূর্ণ বন্ধ করা যায়। (ঘ) প্রতি স্তরে শক্তির পরিমাণ কিছুটা কমবে, কারণ কিছু শক্তি অব্যবহৃত থাকে, কিছু শক্তি শঠনের জন্য নষ্ট হয় এবং কিছু বিপাকীয় কাজের জন্য নষ্ট হয়।

2.8.4 'Y' আকৃতির শক্তি প্রবাহ মডেল

একে দ্বি-চ্যানেল শক্তি প্রবাহ মডেল বা 2-channel energy flow model বলে। এই 'Y' আকৃতির মডেলের একটি হাত শাকাশীর মাধ্যমে শক্তি প্রবাহ নির্দেশ করে এবং অন্য হাতটি বিয়োজক খাদ্যশৃঙ্খল নির্দেশ করে। দুটি শৃঙ্খলই উৎপাদকের উপর প্রভাব বিস্তারে পার্থক্য দর্শায় (চিত্র নং 9)। এই মডেলের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে দুটি খাদ্যশৃঙ্খল-এর একটিকে অপরটির থেকে পৃথক করা যায় না। 'Y' আকৃতির শক্তি প্রবাহ মডেলকে বাস্তব মডেল বলা হয়। কারণ— (ক) ইহা বাস্তুতন্ত্রের মৌল স্তরগুলি ব্যাখ্যা করে। (খ) সময়ে ও কালে ইহা গ্রেজিং ও ডেট্রিটাস খাদ্যশৃঙ্খলকে পৃথক করে।

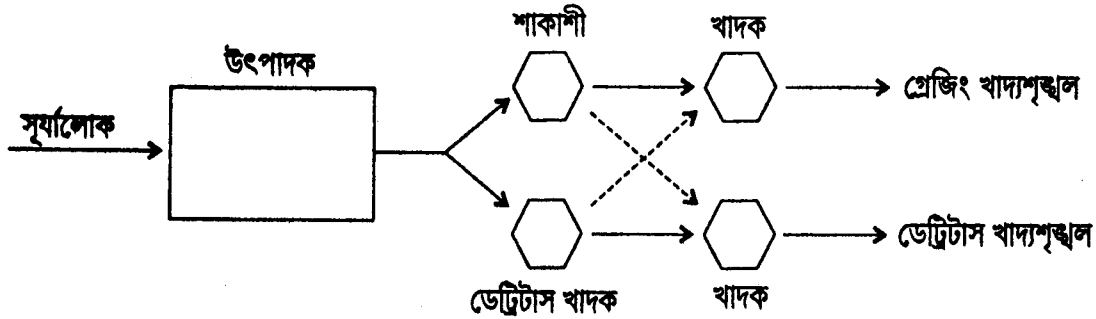

চিত্র নং 9 : শক্তি প্রবাহের 'Y' আকৃতির মডেল

2.8.5 সর্বজনীন শক্তি প্রবাহ মডেল

E.P. Odum 1968 সালে এক চ্যানেল ও 'Y' আকৃতির শক্তি প্রবাহের মডেল উভয়কে যুক্ত করে যে মডেল প্রস্তুত করেন তাকেই শক্তি প্রবাহের সর্বজনীন মডেল বলে। কারণ এই মডেল স্থলজ বাস্তুতন্ত্র এবং জলজ বাস্তুতন্ত্র উভয় ক্ষেত্রেই সমভাবে প্রযোজ্য হয় (চিত্র নং 10)। এই মডেল দুইভাবে ব্যবহার করা যায়— (ক) প্রজাতির ওপর নির্ভরশীল খাদ্যশৃঙ্খলে প্রজাতির শক্তির আগমন ও নিগর্মণ এবং অন্য প্রজাতির সঙ্গে এর শক্তি প্রবাহের সম্পর্ক সম্বন্ধে ধারণা দেয়। (খ) এই মডেল একক শক্তি হিসাবে জীবভর ও শক্তির প্রবাহ উভয়কে একই সঙ্গে দেখায়, ফলে ঐ শক্তি নির্ভর বহু প্রজাতির বাস্তুতান্ত্রিক অবস্থান সম্বন্ধে তথ্য জ্ঞাপন করে।

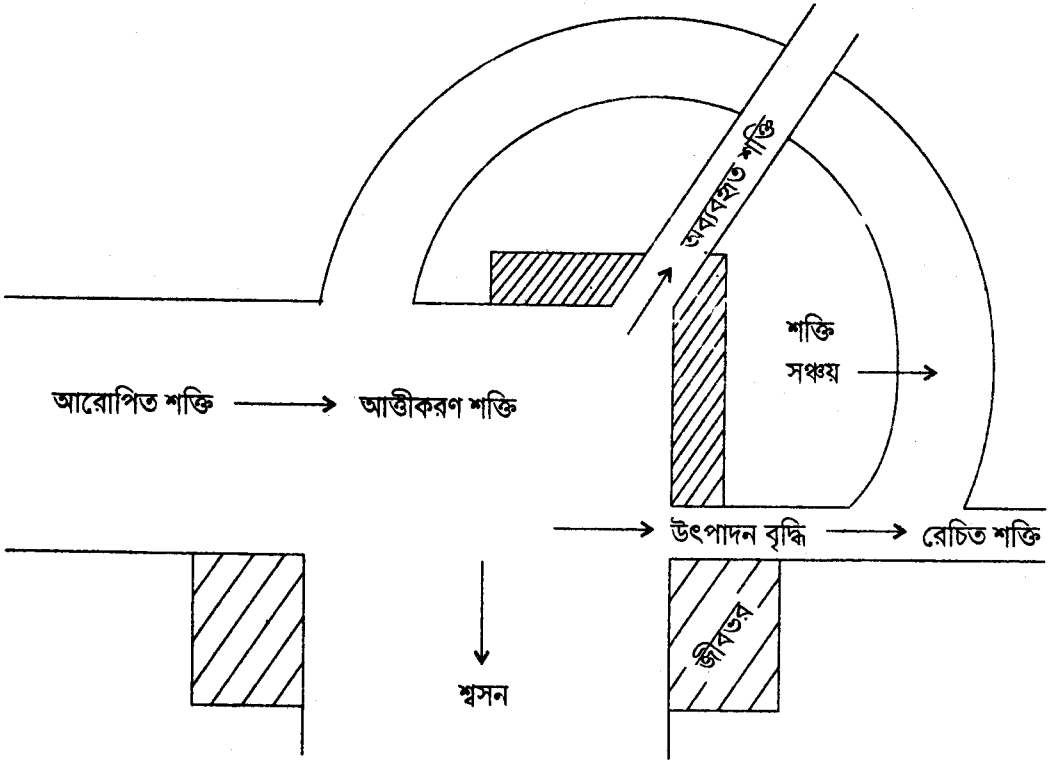

চিত্র নং 10 : শক্তি প্রবাহের সর্বজনীন মডেল

2.9 সারাংশ

বাস্তুতন্ত্র বাস্তুবিদ্যার মৌল কার্যকরী একক। কোন একটি বসতি স্থানের জীবগোষ্ঠীগুলি একে অপরের সঙ্গে এবং ঐ বসতি অঞ্চলের অজৈব পরিবেশের সঙ্গে মিথোস্ক্রিয়া করে একটি সুস্থিত তন্ত্র গঠন করে, সেই তন্ত্র গঠনের ক্রিয়া পদ্ধতিকে বাস্তুতন্ত্র বলে। Ecosystem কথাটি প্রথম চয়ন করেন A.G. Tansley 1935 সালে। বিজ্ঞানী ওডাম-এর মতে বাস্তুতন্ত্রের উপাদানগুলিকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়— (ক) কার্যভিত্তিক উপাদান—ইহা আবার দুই ভাগে বিভক্ত। (a) স্বভোজী উপাদান—যেমন সবুজ উদ্ভিদ, (b) পরভোজী উপাদান— যেমন সকল প্রাণী। (খ) সাংগঠনিক উপাদান— একে আবার চার ভাগে ভাগ করা

হয়। (a) অজৈব উপাদান— যেমন জল, CO_2, নাইট্রোজেন, ফসফেট, অ্যামাইনো অ্যাসিড, আবহাওয়া, উষ্ণতা, আলো ইত্যাদি। (b) উৎপাদক— যেমন সবুজ উদ্ভিদ। (c) খাদক— যেমন বিভিন্ন প্রাণী। (d) বিয়োজক— যেমন ব্যাক্টিরিয়া, ছত্রাক ইত্যাদি। কোন বাস্তুতন্ত্রের খাদ্যশৃঙ্খলে কোন জীব যে খাদ্যতলে অবস্থান করে সেই খাদ্যতলকে ঐ খাদ্যশৃঙ্খলের খাদ্যস্তর বলে। যে-কোন বাস্তুতন্ত্রের খাদ্যশৃঙ্খলে দুই বা ততোধিক খাদ্যস্তর থাকতে পারে। যে-কোন বাস্তুতন্ত্রে উৎপাদক থেকে ক্রমপর্যায়ে যে পদ্ধতিতে ভক্ষক ও ভক্ষিত সম্পর্কে শক্তি প্রথম খাদক (শাকাশী প্রাণী), দ্বিতীয় খাদক (মাংসাশী প্রাণী), তৃতীয় খাদক (মাংসাশী প্রাণী) প্রভৃতিতে প্রবাহিত হয় তাকে খাদ্যশৃঙ্খল বলে। পরিবেশে দুই প্রকাররের খাদ্যশৃঙ্খল দেখা যায়— (ক) গ্রেজিং খাদ্যশৃঙ্খল—এই খাদ্যশৃঙ্খল উৎপাদক থেকে শুরু হয় এবং শাকাশীর মাধ্যমে মাংসাশীতে শেষ হয়। এই খাদ্যশৃঙ্খল প্রত্যক্ষভাবে সৌর শক্তির উপর নির্ভরশীল। গ্রেজিং খাদ্যশৃঙ্খলকে প্রিডেটর খাদ্যশৃঙ্খলও বলে কারণ এক স্তরের খাদক অন্য স্তরের খাদককে মেরে ভক্ষণ করে। (খ) বিয়োজক খাদ্য শৃঙ্খল—গ্রেজিং খাদ্যশৃঙ্খলের বর্জ্য পদার্থ এবং মৃত জৈব পদার্থকে ডেট্রিটাস বলে এবং যারা ডেট্রিটাসকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে তাদের ডেট্রিটিভোর বলে এবং এদের খাদ্যশৃঙ্খলকে ডেট্রিটাস খাদ্যশৃঙ্খল বলে। অ্যালগি, ব্যাক্টেরিয়া, স্লাইমমোল্ড ছত্রাক, পতঙ্গ, অ্যানিলিডা ইত্যাদি ডেট্রিটিভোরের উদাহরণ। যে-কোন বাস্তুতন্ত্র অসংখ্য আন্তঃসম্পর্কযুক্ত খাদ্যশৃঙ্খল দ্বারা গঠিত। জীবগোষ্ঠীর মধ্যে অসম খাদ্য সম্পর্কের ফলে বাস্তুতন্ত্রের বিভিন্ন খাদ্যশৃঙ্খলের আন্তঃসংযোগে যে জালকাকার গঠন সৃষ্টি হয় তাকে বলে খাদ্য জালক। আবার কোন একটি বাস্তুতন্ত্র বিভিন্ন ট্রফিক লেভেলে ট্রফিক গঠন এবং কাজ লেখচিত্রের মাধ্যমে দেখা যায় এবং এর আকৃতি পিরামিডের মতো, একেই বাস্তুতন্ত্রের পিরামিড বলে। বিজ্ঞানী এলটন 1927 সালে বাস্তুতন্ত্রের পিরামিডের বর্ণনা প্রথম করেন। সংখ্যার পিরামিড তৃণভূমির বাস্তুতন্ত্র এবং পুকুরের বাস্তুতন্ত্রের ক্ষেত্রে সোজা (upright)। পরজীবীর খাদ্যশৃঙ্খলে সংখ্যার পিরামডি ওল্টানো (inverted)। জীবভরের পিরামিড তৃণভূমি ও বনভূমির বাস্তুতন্ত্রের ক্ষেত্রে সোজা কিন্তু পুকুরের বাস্তুতন্ত্রে ওল্টানো (inverted)। সূর্য সকল শক্তির উৎস। উৎপাদক সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় সৌর শক্তিকে স্থিতিশক্তি বা রাসায়নিক শক্তি রূপে সঞ্চিত রাখে। একে বলে 'মোট প্রাথমিক উৎপাদন'। মোট প্রাথমিক উৎপাদনশীলতায় সঞ্চিত শক্তির কিছু পরিমাণ উৎপাদকের শ্বসনের ফলে ব্যয় হয় এবং অবশিষ্ট অংশ সঞ্চিত থাকে। এই শেষোক্ত পরিমাণকে বলে 'নীট প্রাথমিক উৎপাদন'। অতএব নীট প্রাথমিক উৎপাদন (NPP) = মোট প্রাথমিক উৎপাদন (GPP)- শ্বসন (R)। এই NPP খাদ্যশৃঙ্খলের পরবর্তী খাদ্যস্তরে প্রবাহিত হয়। বাস্তুতন্ত্রে শক্তির এই প্রভাব একমুখী। তাপগতিবিদ্যার সূত্রানুসারে বাস্তুতন্ত্রে শক্তির রূপান্তর ঘটে, সৃষ্টি বা ধ্বংস হয় না। আবার খাদ্যশৃঙ্খলে খাদ্যস্তরের যত উপরের দিকে যাওয়া হয়, শক্তির পরিমাণ ক্রমে হ্রাস পেতে থাকে। বাস্তুতন্ত্রে শক্তি প্রবাহের তিনটি মডেল আছে। যথা—(ক) এক-চ্যানেল প্রবাহ মডেল—এই মডেল থেকে দেখা যায় যে শক্তির প্রবাহ একমুখী। (খ) 'Y' আকৃতির শক্তি প্রবাহ মডেল— এই মডেল বাস্তুতন্ত্রের মৌল স্তরগুলি ব্যাখ্যা করে এবং সময়ে ও কালে ইহা গ্রেজিং ও ডেট্রিটাস খাদ্যশৃঙ্খলকে পৃথক করে। (গ) সার্বজনীন শক্তি প্রবাহ মডেল—এই মডেল খাদ্যশৃঙ্খলে প্রজাতির শক্তির আগমন ও নির্গমন এবং অন্য প্রজাতির সঙ্গে এর শক্তি প্রবাহের সম্পর্ক সম্বন্ধে ধারণা দেয় এবং এই মডেল একক শক্তি হিসাবে জীবভর ও শক্তির প্রবাহ উভয়কে একই সঙ্গে দেখায়, ফলে ঐ শক্তি নির্ভর বহু প্রজাতির বাস্তুতান্ত্রিক অবস্থান সম্বন্ধে তথ্য পাওয়া যায়।

2.10 প্রশ্নাবলী

1. সঠিক উত্তরটিতে (✓) চিহ্ন এবং ভুলটিতে (✗) চিহ্ন দাও ঃ

(a) Ecosystem কথাটি প্রথম ব্যবহার করেন E. Haeckel।

(b) বাস্তুতন্ত্রে প্রাণীদের স্বভোজী উপাদান বলা হয়।

(c) সবুজ উদ্ভিদরা আবার Transducer নামেও পরিচিত।

(d) একটি বিয়োজকের উদাহরণ হচ্ছে ব্যাক্টেরিয়া।

(e) শাকাশী প্রাণীদের দ্বিতীয় শ্রেণীর খাদক বলা হয়।

(f) পুকুরের বাস্তুতন্ত্রে উৎপাদক হিসাবে কাজ করে জুপ্ল্যাঙ্কটন।

(g) পরিবেশে দুই প্রকারের খাদ্যশৃঙ্খল দেখা যায়।

(h) গ্রেজিং খাদ্যশৃঙ্খলকে প্রিডেটর খাদ্যশৃঙ্খলও বলা যায়।

(i) বনভূমির বাস্তুতন্ত্রে সংখ্যার পিরামিড ওল্টানো (Inverted)।

(j) বাস্তুতন্ত্রে শক্তির প্রবাহ বহুমুখী।

2. সঠিক শব্দ দ্বারা শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

(a) বাস্তুতন্ত্রে কার্যভিত্তিক উপাদানকে _____ ভাগে ভাগ করা যায়।

(b) _____ একটি পরভোজী উপাদানের উদাহরণ।

(c) পুকুরের বাস্তুতন্ত্রে মাইক্রোস্কোপিক উৎপাদক হচ্ছে _____।

(d) সাপ হচ্ছে _____ শ্রেণীর খাদক।

(e) ডেট্রিটাস খাদ্যশৃঙ্খলে শক্তির প্রবাহ _____ প্রবাহিত হয়।

(f) বাস্তুতন্ত্রের পিরামিড প্রথম বর্ণনা করেন _____।

(g) পুকুরের বাস্তুতন্ত্রে জীবভরের পিরামিডের আকৃতি হচ্ছে _____।

(h) 'Y' আকৃতির শক্তি প্রবাহ মডেলকে _____ মডেলও বলা হয়।

(i) _____ মডেল সময়ে ও কালে গ্রেজিং ও ডেট্রিটাস খাদ্যশৃঙ্খলকে পৃথক করে।

(j) শক্তি প্রবাহের সর্বজনীন মডেল-এর প্রবক্তা_____।

3. সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন ঃ

(a) বাস্তুতন্ত্র (Ecosystem) কথাটির অর্থ কি?

(b) বাস্তুতন্ত্র (Ecosystem) কাকে বলে?

(c) বাস্তুতন্ত্রের স্বভোজী উপাদান বলতে কি বোঝেন?

(d) খাদ্যস্তর কি?

(e) খাদ্যশৃঙ্খল ও খাদ্য জলক বলতে কি বোঝেন?

(f) সংখ্যার পিরামিড কাকে বলে?

(g) জীবভরের পিরামিড কি?

(h) PAR বলতে কি বোঝেন?

(i) নেট প্রাথমিক উৎপাদনশীলতা (Net Primary Productivity) কি?

(j) একটি বাস্তুতন্ত্রে উৎপাদকের GPP যদি 90 g cal/cm^2/yr হয় এবং শ্বসনের জন্য যদি ব্যয় হয় 10 g cal/cm^2/yr, তবে উৎপাদকের NPP কত?

4. দীর্ঘ উত্তর-ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

(a) বাস্তুতন্ত্র কাকে বলে? এর বিভিন্ন উপাদানগুলি বর্ণনা করুন।

(b) খাদ্যশৃঙ্খল কাকে বলে ও কি কি? যে-কোন একটি বাস্তুতন্ত্রের ডেট্রিটাস খাদ্যশৃঙ্খল ব্যাখ্যা করুন।

(c) বাস্তুতন্ত্রের পিরামিড কি? বিভিন্ন বাস্তুতন্ত্রে সংখ্যার পিরামিড ও জীবভরের পিরামিড কি রকম?

(d) বাস্তুতন্ত্রে শক্তি প্রবাহ একমুখী কেন?

(e) 'Y' আকৃতির শক্তি পবাহের মডেলটি বর্ণনা করুন।

2.11 উত্তরমালা

1. (a) ×; (b) × ; (c) ✓ ; (d) ✓ ; (e) × ; (f) ×; (g) ✓ ; (h) ✓ ; (i) ×; (j) ×

2. (a) দুই

(b) ব্যাঙ

(c) ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন

(d) তৃতীয় শ্রেণীর

(e) ক্রমাগত

(f) এলটন

(g) ওল্টানো

(h) দ্বি-চ্যানেল

(i) 'Y' আকৃতির

(j) ওডাম

3. (a) 2.2 ; (b) 2.2 ; (c) 2.3.1 ; (d) 2.4 ; (e) 2.5 এবং 2.6 ; (f) 2.7.2 ; (g) 2.7.3।

(h) সূর্যালোকের দৃশ্যে সাহায্যকারী আলোক তরঙ্গ যারা উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষে সাহায্য করে তাদের PAR বলে।

(i) 2.8 ; (j) 80 g cal/cm^2/yr

4. (a) 2.2 এবং 2.3

(b) 2.5 এবং 2.5.2

(c) 2.7, 2.7.2 এবং 2.7.3

(d) 2.8.1

(e) 2.8.4

একক 3 ❑ বাস্তুতান্ত্রিক শর্তসমূহ (Ecological Factors)

গঠন

3.1 প্রস্তাবনা

উদ্দেশ্য

3.2 পরিবেশ মাত্রই বহু শর্তসাপেক্ষ

3.2.1 বাস্তুতন্ত্রের বিভিন্ন জড় বা আবায়োটিক শর্তসমূহ

3.2.1.1 সংজ্ঞা

3.2.1.2 আবায়োটিক শর্তের পরিপ্রেক্ষিতে জীবের সাড়া প্রদানের প্রকার

3.2.1.3 বিভিন্ন জড় বা অবায়োটিক শর্তসমূহ

3.2.2 বাস্তুতন্ত্রের বিভিন্ন সজীব বা বায়োটিক শর্তসমূহ

3.2.2.1 সংজ্ঞা

3.2.2.2 বায়োটিক শর্তসমূহের শ্রেণীবিন্যাস

3.3 বায়োটিক শর্তগুলির বাস্তুতান্ত্রিক গুরুত্ব

3.4 বায়োটিক আন্তঃক্রিয়াসমূহ

3.4.1 প্রতিযোগিতা

3.4.2 সহাবস্থান

3.4.3 শিকারজীবিকা

3.4.4 মিথোজীবিতা

3.4.5 কমেন্‌সালিজ্‌ম্‌

3.5 সারাংশ

3.6 প্রশ্নাবলী

3.7 উত্তরমালা

3.1 প্রস্তাবনা

জীব ও তার পরিবেশের মধ্যে সাম্যতা বজায় থাকলে জীবনধারা মসৃণ গতিতে এগিয়ে চলে। মনে রাখা প্রয়োজন যে পরিবেশ গঠিত হয়ে থাকে সজীব বস্তু (বায়োটিক শর্ত) এবং জড় বস্তুর (আবায়োটিক শর্ত) সমন্বয়ে। পরিবেশের সজীব বা জীবীয় শর্ত বলতে বোঝায় জীনসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সমর্ক বা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। অর্থাৎ জীবেরা একে অপরের সঙ্গে খাদ্য-খাদকের সম্পর্ক থেকে শুরু করে পরজীবিতা, মিথোজীবিতা ইত্যাদি আরও কিছু সম্পর্কের মাধ্যমে আন্তঃক্রিয়ায় বড় হতে পারে। আবার পরিবেশের জড় শর্ত বলতে বোঝায় তাপমাত্রা, আলো, বিভিন্ন গ্যাসীয় বস্তু, আর্দ্রতা ইত্যাদি। বর্তমান অংশে আমরা বাস্তুতন্ত্রের বিভিন্ন শর্তসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করব।

উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি—

- বাস্তুতন্ত্রের আবায়োটিক শর্তসমূহ সম্বন্ধে জানতে পারবেন।
- বাস্তুতন্ত্রের সজীব শর্তসমূহ সম্বন্ধে জানতে পারবেন।
- বায়োটিক শর্তগুলির শ্রেণীবিন্যাস সম্বন্ধে জানতে পারবেন।
- বায়োটিক শর্তগুলির বাস্তুতান্ত্রিক গুরুত্ব সম্বন্ধে জানতে পারবেন।
- বিভিন্ন প্রকার বায়োটিক আন্তঃক্রিয়া সম্বন্ধে জানতে পারবেন।

3.2 পরিবেশ মাত্রই বহু শর্তসাপেক্ষ (Environment is Multi-factorial

বস্তুব্যবিদ্যা বা ইকোলজি বিষয়ে একটি প্রাথমিক ধারণা হল যে পরিবেশমাত্রই বহু শর্তাধীন। পরিবেশের বহুবিধ শর্ত জীবের উপর ক্রিয়াশীল হয়। আবার পরিবেশের শর্তগুলি পারস্পরিক আন্তঃক্রিয়াশীল অর্থাৎ একটি শর্তের ক্রিয়া অন্য একটি শর্তের প্রভাবাধীন। একইভাবে পরিবেশের শর্তের পরিপ্রেক্ষিতে জীবের সাড়াপ্রদানের জটিলতাও বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়।

3.2.1 বাস্তুতন্ত্রের বিভিন্ন জড় বা আবায়োটিক শর্তসমূহ (Abiotic factors of Ecosystem)

3.2.1.1 সংজ্ঞা—বাস্তুতন্ত্রের জড় তথা ভৌত পরিবেশের বহুবিধ আন্তঃক্রিয়ারত শর্ত আবায়োটিক উপাদানরূপে চিহ্নিত হয়।

3.2.1.2 আবায়োটিক শর্তের পরিপ্রেক্ষিতে জীবের সাড়াপ্রদানের প্রকার ঃ জড় শর্তগুলি জীব সম্প্রদায়ের বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়াকে নানাভাবে প্রভাবিত করে।

1. **প্রাণঘাতী (Lethal) ঃ** জীবের মৃত্যু ঘটাতে পারে। যথা—অত্যাধিক তাপ বা শৈত্য।

2. **গুপ্ত (Masking) ঃ** অন্যান্য জড় শর্তকে পরিবর্তিত করতে সক্ষম। যেমন— কম আর্দ্রতা জীবের দেহতল থেকে বাষ্পীভবন প্রক্রিয়া বৃদ্ধি করে।

3. **নির্দেশক (Directive) ঃ** কিছু ভৌত শর্তের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাণীর অবস্থানের পার্থক্য ঘটতে পারে। যেমন— কিছু জীব আলোকের দিকে চলন দেখায়।

4. **নিয়ন্ত্রণমূলক (Controlling) ঃ** জীবের বিপাকক্রিয়ার হারে পরিবর্তনে সক্ষম। তাপ ও চাপ শর্ত দুটি দ্বারা জীবের বিপাক ও গমনে পার্থক্য দেখা দিতে পারে।

5. **অভাবমূলক (Deficient) ঃ** কয়েকটি শর্তের অভাবে জীবের কিছু শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়া বিঘ্নিত হয়। যেমন— O_2 এর নির্দিষ্ট মাত্রার অভাবে প্রাণীর অস্তিত্ব বিপন্ন হতে পারে।

3.2.1.3 বিভিন্ন জড় বা আবায়োটিক শর্তসমূহ (Different Abiotic factors)

1. **প্রয়োজনীয় মৌলসমূহ (Essential elements)** ঃ কোনও পপুলেশনের সভোরা কোনও পরিবেশে বেড়ে ওঠা ও সংখ্যাবৃদ্ধি করার সমতা অর্জন করে ঐ পরিবেশ থেকে কিছু অত্যাবশ্যকীয় বস্তু সংগ্রহের মাধ্যমে। আমাদের গ্রহের প্রায় বিরানব্বইটি প্রাকৃতিক মৌলের মধ্যে মাত্র এক-তৃতীয়াংশ সংখ্যক মৌল জীবেরা ব্যবহারে সক্ষম। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—C, H, O_2, N_2, S, Ca, P, K, Na, Si, Mg, Bo, Mn, Fe, Zn, Mo, Cu, I এবং Co বিভিন্ন জীবের ক্ষেত্রে উপরোক্ত মৌলগুলির চাহিদায় বিস্তর পার্থক্য দেখা যায়। জীবনতন্ত্রে যেখানে C, H এবং O এর চাহিদা সর্বাধিক সেখানে Co, Mo ও Cu এর চাহিদা অত্যন্ত কম হয়।

লিবিগ-ব্ল্যাকম্যানের সূত্র (The Liebig-Blackman law) ঃ বিজ্ঞানী লিবিগ 1840 সালে প্রয়োজনীয় মৌলের পরিমাণ এবং উদ্ভিদের বৃদ্ধির মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করেন। পরীক্ষামূলক ফলাফল থেকে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে "খাদ্যবস্তুতে মৌলের সামান্য পরিমাণে উপস্থিতির উপর বৃদ্ধি নির্ভর করে"। সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার হার সম্পর্কিত গবেষণাকালে ব্ল্যাকম্যান লক্ষ্য করেছিলেন যে ঐ প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণকারী যে কোনও শর্ত সীমিত পরিমাণে উপস্থিত থাকলেই সংশ্লেষ চলতে থাকে, কিন্তু ঐ শর্তে নির্দ্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করলে প্রক্রিয়াটি বাধাপ্রাপ্ত হয়।

শেলফোর্ডের সূত্র (The Shelford's law) ঃ বিজ্ঞানী শেলফোর্ড 1913 সালে প্রস্তাবনা করেন যে প্রতিটি বাস্তুতান্ত্রিক শর্তের পরিপ্রেক্ষিতে জীব যে সাড়া প্রদান করে তার একটি সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মাত্রা চিহ্নিত করা যায়। ঐ মাত্রার মধ্যেই জীবের সহনশীলতা সীমাবদ্ধ থাকে।

2. **জলবায়ুগত শর্তসমূহ (Climatic factors)** ঃ এটি জৈবিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ অনেকগুলি শর্তকে চিহ্নিত করে। পৃথিবীকে বেষ্টন করে অনেকটা এলাকা জুড়ে জলবায়ুগত শর্তগুলি কার্যকর হয়। বৈশিষ্ট্যমূলক জলবায়ুর এলাকাগুলি সমুদ্র, স্থলদেশ ইত্যাদি দ্বারা বিচ্ছিন্ন থাকে। এলাকাগুলি পার্বত্য অঞ্চল ও সামুদ্রিক স্রোতের প্রকৃতি দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। জলবায়ুর কোনও নির্দিষ্ট শর্তের (যেমন— সৌরশক্তি, বায়ু, তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, আর্দ্রতা অথবা বাষ্পীভবন হার ইত্যাদি) মানচিত্র অঙ্কন সহজেই সম্ভব। বিজ্ঞানী থর্ণওয়েট (Thornwaite, 1955) বারিপাত-বাষ্পীভবন অনুপাতের (P/E) বার্ষিক গড় পরিমাণ দ্বারা জলবায়ুর প্রভেদ বর্ণনার চেষ্টা করেছেন। উপরোক্ত P/E অনুপাতের উপর আবার উদ্ভিদের প্রকৃতি নির্ভর করে। এই ঘটনাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে থর্ণওয়েট প্রস্তাবিত জলবায়ু অঞ্চলগুলি নিম্নে বর্ণিত হল—

জলবায়ুর প্রকার	*উদ্ভিদরাজির প্রকারভেদ*	*P/E সূচক*
আর্দ্র (wet)	বর্ষণ বনাঞ্চল	>128
স্যাঁতস্যাঁতে (humid)	বনাঞ্চল	64—127
প্রায় স্যাঁতস্যাঁতে (sub-humid)	তৃণভূমি	32—63
অর্ধশুষ্ক (semi-arid)	স্টেপি	16—31
শুষ্ক (arid)	মরু-অঞ্চল	<16

3. **বায়ু (Winds)** ঃ যেহেতু পৃথিবীর আবহমণ্ডল পরিবর্তনশীল কাজেই বাতাসের গতি-প্রকৃতিও অত্যন্ত পরিবর্তিত হয়ে পরিবেশকে প্রভাবিত করে। পৃথিবীপৃষ্ঠের উপর অবস্থানকারী বায়ু পৃথিবীর গঠনশৈলী (topography) এবং স্থানিকভাবে উত্তপ্ত বা শীতলীভবনের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে। বাস্তুতান্ত্রিকভাবে এই পরিবর্তনশীল বায়ুর গুরুত্ব আছে। বীজের বিস্তার, ক্ষুদ্রাকৃতি প্রাণী যেমন— মাকড়, ক্ষুদ্র শামুক, পতঙ্গের বিস্তারেও তীব্র বায়ুর ভূমিকা আছে। এছাড়া বায়ুপ্রবাহের ফলে বাষ্পীভবন বৃদ্ধি পায়। এতে প্রাণীর দেহ থেকে যেমন জলের পরিমাণ হ্রাস পায় তেমনি উদ্ভিদের বাষ্পমোচন হার বাড়ে। কিন্তু অন্য দিকে বায়ুপ্রবাহ বহু উদ্ভিদের পরাগ মিলন ঘটায়। বায়ুপ্রবাহের তীব্রতা প্রচন্ড বৃদ্ধি পেলে বিধ্বংসী ঝড়ঝঞ্ঝার সৃষ্টি হয় যার ফলে একদিকে যেমন মহীরুহ বৃক্ষগুলি ধ্বংস হয়, পশুপাখি ও মানুষেরা জীবনহানি হয়, তেমনি প্রবল দ্বীপের (coral reef) পর্যাপ্ত ক্ষতি হয়।

4. **মৃত্তিকা (Soil)** ঃ মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী যেমন উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল, আবার উদ্ভিদও মৃত্তিকার চরিত্রের উপর নির্ভর করে বৃদ্ধি পায়। কাজেই পৃথিবীর জীবনকেন্দ্রিক অঞ্চল বা বায়োস্ফিয়ারের অস্তিত্বের জন্য মৃত্তিকার বিরাট ভূমিকা আছে। উদ্ভিদ বিস্তারের ক্ষেত্রে মৃত্তিকার চরিত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। এ প্রসঙ্গে মৃত্তিকায় উপস্থিত নাইট্রোজেনের পরিমাণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নাইট্রোজেনের পরিমাণ অত্যন্ত কম হলে যেমন পাঁকপূর্ণ জমি (bogland) অথবা বালুকাময় জমিতে যে উদ্ভিদগুলি বেঁচে থাকে তারা অন্য উৎস থেকে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে। এইজন্য অ্যাল্ডার গাছের (Alder tree) শিকড়ে অর্বুদ (nodule) তৈরী হয় যেখানে বাতাস থেকে নাইট্রোজেন আবদ্ধকারী ব্যাকটেরিয়া জন্মায়। আবার পতঙ্গভুক ভেনাস ফ্লাই ট্রাপ ও কলসপত্রী উদ্ভিদ পতঙ্গের দেহ তরল থেকে (Venus fly trap and pitcher plant) নাইট্রোজেনের চাহিদা মেটায়।

5. **তাপমাত্রা (Temperature)** ঃ পার্থিব পরিবেশে তাপমাত্রাতারতম্য প্রধানতঃ দুটি কারণে যথা— আপতিত সৌরশক্তির পরিমাণ এবং স্থল ও জলভাগের বিস্তারের ফলে ঘটে থাকে। ভূমণ্ডলের উচ্চতর অক্ষাংশে সৌরকিরণ তির্যকভাবে আপতিত হওয়ার ফলে প্রতি একক ক্ষেত্রে কম পরিমাণে তাপশক্তি উদ্ভূত হয়। উদাহরণ স্বরূপ, মেরু প্রদেশে বিষুব অঞ্চলের তুলনায় মাত্র চল্লিশ শতাংশ তাপশক্তি পতিত হয়। স্থলদেশ এবং সামুদ্রিক পরিবেশেও তাপশক্তির শোষণে বৈষম্য দেখা যায়। স্থলদেশ দ্রুত উত্তপ্ত এবং শীতল হয়। ফলে স্থল নিয়ন্ত্রিত বা মহাদেশীয় (continental) জলবায়ুর প্রভাবে প্রাত্যহিক এবং ঋতুকালীন তাপমাত্রার সুস্পষ্ট তারতম্য দেখা যায়। মুখ্যতঃ উল্লম্বতলে মিশ্রণ ও উচ্চ আপেক্ষিক তাপের (Specific heat) জন্য জলভাগে প্রাত্যহিক তাপমাত্রার তারতম্য দেখা যায় না এবং এটি তুলনামূলকভাবে দেরীতে উত্তপ্ত ও শীতল হয়। তাপমাত্রার দ্বারা প্রায়শঃই জল ও স্থলভাগ কয়েকটি বিশেষ অঞ্চলে চিহ্নিত করা হয়। পৃথিবীর সমশীতোষ্ণ (temperate) মণ্ডলের হ্রদগুলিতে গ্রীষ্মকালে তিনটি অঞ্চল যথা—এপিলিম্‌নিয়ন (epilimnion) বা উপরিভাগের উষ্ণ পরিভ্রমণশীল জলস্তর, হাইপোলিম্‌নিয়ন (hypolimnion) বা নিম্নের শীতরল স্থির জলস্তর এবং মধ্যভাগের দ্রুত হ্রাসমান তাপমাত্রার জলস্তর থার্মোক্রাইন (thermoeline) অঞ্চল সৃষ্টি হয়।

তাপসমতা ঃ সব জীব তাপীয় পরিবেশে বসবাস করে। শক্তির বিনিময় কাজ দ্বারা জীব ও তাপীয় পরিবেশের মধ্যে সম্পর্ক বজায় থাকে। জীবদেহ ও পরিবেশের মধ্যে তাপের স্থানান্তর ক্রিয়া সঞ্চালন (conduction), পরিচালন (convection), বাষ্পীভবন (evaporation) এবং তাপীয় বিকিরণ (thermal

radiation) দ্বারা ঘটে থাকে। সঞ্চালন প্রক্রিয়ায় উষ্ণ বস্তু থেকে সরাসরি সংস্পর্শ দ্বারা তাপ শীতল বস্তুতে পরিবাহিত হয়। পরিচালন প্রক্রিয়ায় কোনও বস্তুর (তরল-কঠিন বা তরল-তরল) উপর দিয়ে বায়ু অথবা জল প্রবাহকালে তাপমাত্রার স্থানান্ত্র ঘটে। বাষ্পীভবন প্রক্রিয়াটিতে তরল পদার্থের বাষ্পে পরিণত হওয়ার সময় তাপমাত্রার স্থানান্তর দেখা যায়। তাপীয় বিকিরণকালে তাপমাত্রা বায়ুমাধ্যম দ্বারা ব্যাপন প্রক্রিয়ায় উষ্ণদেহ থেকে অপেক্ষাকৃত শীতল বস্তুতে পরিবাহিত হয়। এই কারণে সব জীবই তাপ উপার্জন ও তাপমোচন কার্য্যের মধ্যে তাপসমতা রক্ষায় সচেষ্ট হয়। জীবের তাপসমতা রক্ষার ঘটনাটি নিম্নোক্ত উপায়ে প্রকাশ করা হল ঃ

তাপ উপার্জন (সৌর বিকিরণ + তাপীয় বিকিরণ + খাদ্য শক্তির সঞ্চয়) = তাপ মোচন (তাপীয় বিকিরণ + সঞ্চালন + পরিচালন + বাষ্পীভবন)।

তাপমাত্রা এবং জীবকূল— প্রাণীকূলকে পরিবেশের তাপমাত্রার সহনশীলতার উপর নির্ভর করে দুটি মখ্য শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। অধিকাংশ প্রাণীই অসমোষ্ণ (poikilothermous) প্রকৃতির হয়। এদের দেহের তাপমাত্রা পরিবেশের তাপমাত্রার সমান হয়। পরিবেশের তাপমাত্রা অনুযায়ী তাদের দেহের তাপমাত্রাও উঠানামা করে। কিন্তু বিভিন্ন স্তন্যপায়ী ও পক্ষীর দেহের তাপমাত্রা সবসময় নির্দিষ্ট থাকে এবং পরিবেশের তাপমাত্রার পরিবর্তনে এটি প্রভাবিত হয় না। ফলে তাদের সমোষ্ণ (homeothermous) প্রাণী বলে। এছাড়া প্রাণীকূলকে বহিঃউষ্ণ (ectotherms) এবং অন্তঃউষ্ণ (endotherms) প্রকারেও বিভক্ত করা হয়। প্রথমোক্ত প্রাণীদেহে উষ্ণতা বজায় রাখার জন্য পরিবেশের উপর নির্ভর করতে হয়। এই প্রকার প্রাণীদেহের বিপাকীয় হার অত্যন্ত কম হয়। অন্যদিকে এন্ডোথার্ম প্রাণী বর্ধিত বিপাক হার দ্বারা দেহ তাপমাত্রা নির্দিষ্ট মাত্রায় বজায় রাখে। এদের তাপীয় সঞ্চালন ব্যবস্থা (thermal conductance) অত্যন্ত কম পরিমাণে ঘটে। যদিও প্রায় সকল সমোষ্ণ প্রাণী এন্ডোথার্ম চরিত্রের হয়ে থাকে। কিন্তু সব অসমোষ্ণ প্রাণী এক্টোথার্ম নাও হতে পারে। অসমোষ্ণ প্রাণী বাম্বল মৌমাছি (bumble bee) উড্ডয়নকালে ডানার পেশীর দ্রুত সংকোচন দ্বারা দেহের উষ্ণতা পরিবেশের থেকে বাড়াতে সক্ষম হয়।

তাপমাত্রা ও জীবনধারণ— পৃথিবীতে জীবনের অস্তিত্ব –196°C থেকে 100°C পরিসর পর্যন্ত পাওয়া গেছে। বহু প্রকারের নিমাটোড, রটিফার এবং টার্ডিগ্রেড সন্ধিপদী প্রাণী অত্যন্ত শীতলতম তাপমাত্রায় সহনশীলতা প্রদর্শন করে। কয়েক প্রকার কুমেরু প্রদেশীয় মাছ –1.9°C তাপমাত্রায় বেঁচে থাকে। এদের দেহের গ্লাইকোপ্রোটিন অণুসমূহ জৈবিক হিম-বিরোধী বস্তু (anti-freeze agent) রূপ কাজ করে। অন্যদিকে কাইরোনমিড লার্ভা এবং কয়েক প্রকার ডিপটেরা প্রাণী 55°C তাপমাত্রায় বেঁচে থাকতে পারে। জলজ প্রাণীগুলির তাপমাত্রা সহনশীলতা অত্যন্ত কম এবং এরা স্টেনোথার্মল (stenothermal) প্রাণীরূপে পরিচিত হয়। আবার কয়েক প্রকার প্রাণীর তাপমাত্রার সহনশীলতা অপেক্ষাকৃত বেশী হওয়ায় তাদের **ইউরিথার্মাল** (eurythermal) প্রাণী বলে।

তাপমাত্রা ও পরিস্ফুটন-- তাপমাত্রা প্রাণীর সহনশীলতার মাত্রা অতিক্রম করলে অবধারিতভাবে প্রাণীর মৃত্যু ঘটে। এক্ষেত্রে শুষ্কীভবন (deciccation), বর্ধিত বিপাক ক্রিয়া ও শক্তিক্ষয় মৃত্যুর কারণ হয়। অনুরূপ কম তাপমাত্রাতেও প্রাণীর স্বাভাবিক বিপাক ক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটে। গবেষণার দ্বারা প্রমাণ করা গেছে যে প্রতিকূল তাপমাত্রা প্রাণীর প্রজনন, পরিস্ফুরণ তথা বৃদ্ধিকেও প্রভাবিত করে। ক্রোটাগোনাস

(Chrotagonous trachypterus) নামে অর্থোপ্টেরা বর্গের স্ত্রী পতঙ্গটি যদিও 30°C থেকে 35°C তাপমাত্রায় পূর্ণতা লাভ করে, কিন্তু 30°C তাপমাত্রায় পতঙ্গটির প্রজনন প্রাচুর্যতা সর্বাধিক দেখা যায় (A. S. Atwal and G.S. Grewal, 1968)। ব্যাঙ ও স্যালামাণ্ডার জাতীয় উভচর প্রাণীও কম তাপমাত্রায় প্রজনন কাজ সম্পন্ন করে ও এদের দ্রুত পরিস্ফুরণ ঘটে থাকে (J.A. Moore, 1939)।

তাপমাত্রার অন্যান্য প্রভাব ঃ তাপমাত্রার হ্রাস-বৃদ্ধিতে প্রাণীর আচরণগত পরিবর্তন ঘটে। র‍্যাঠ্‌ল সাপ একপ্রকার বিশেষ অঙ্গ (pit organ) দ্বারা তাপীয় পরিবর্তন অনুভব করে। ফলে এরা অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে উষ্ণ-শোণিত বিশিষ্ট প্রাণী শিকার করতে পারে। প্রাণীর আকার ও বর্ণের উপরও তাপমাত্রার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এই প্রসঙ্গে নিম্নের সূত্রগুলি উল্লেখযোগ্য।

বার্গম্যানের সূত্র (Bergamann's rule) ঃ শীতল জলবায়ুতে প্রাণীর দেহ আকার বৃদ্ধির প্রবণতা প্রদর্শন করে।

অ্যালেনের সূত্র (Allen's rule) ঃ শীতল জলবায়ুতে প্রাণীর লেজ, কান এবং বাহুগুলি হ্রস্ব আকৃতির হয়।

গ্লজারের সূত্র (Gloger's rule) ঃ উষ্ণ, আর্দ্র জলবায়ুতে প্রাণীসমূহ ঘন বর্ণের (darker pigmentation) হয়।

রেন্‌শের সূত্র (Rensch's rule) ঃ শীতল জলবায়ুতে পক্ষীর ডানাদ্বয় অপ্রশস্ত এবং উষ্ণ জলবায়ুতে ডানাদ্বয় তুলনামূলকভাবে প্রশস্ত হয়।

ঋতুকালীন তাপমাত্রার পরিবর্তনহেতু সন্ধিপদ প্রাণী ডাফ্‌নিয়ার (Daphnia) মস্তকের উপবৃদ্ধিটির বিস্ময়কর পরিবর্তন ঘটে। তাপমাত্রার বৃদ্ধি জনিত জলের প্লবতা হ্রাসের ফলে ভেসে থাকার সুবিধার্থে ঐ উপবৃদ্ধিটি সুস্পষ্ট হয়। তাপমাত্রা হ্রাসে ঐ উপবৃদ্ধিটিও ক্ষীণ আকার ধারণ করে। ডাফ্‌নিয়ার বহিরাকৃতির এই তাপমাত্রাজনিত পরিবর্তনটিকে **সাইক্লোমরফোসিস** বলে।

6. **আলোক (Light) ঃ** প্রতিটি জীবের অস্তিত্ব আলোকের উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল। আলোকশক্তি প্রধানতঃ তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গরূপে সূর্যকিরণ দ্বারা পৃথিবী পৃষ্ঠে পতিত হয়। পৃথিবী পৃষ্ঠে আলোকের তীব্রতা আপতিত কোণ (angle of incidence), উচ্চতা, অক্ষাংশ, ঋতু, দিনের সময়, আবহজনিত শর্ত ইত্যাদি কারণে পার্থক্য প্রদর্শন করে। নিবিড় বনাঞ্চলে মহীরুহ বৃক্ষসমূহের উপর অধিকাংশ সূর্যালোক আপতিত হলেও মৃত্তিকা সংলগ্ন তলদেশে স্বল্প পরিমাণে আলোক পৌঁছায়। পৃথিবীর জলভাগেও সর্বত্র সমান আলোক পৌঁছায় না। আলোক ভেদ্যতা অনুযায়ী জলভাগকে 50 মিটার গভীরতা পর্যন্ত **ইউফোটিক** (euphotic) এবং 50 থেকে 200 মিটার গভীরতা পর্যন্ত ডিসফোটিক (disphotic) অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়। 200 মিটারের তদূর্দ্ধ আলোক-শূন্য জল প্রদেশটি **আফোটিক** (aphotic) অঞ্চলরূপে চিহ্নিত হয়।

আলোক এক অত্যন্ত প্রয়োজনীয় শর্তরূপে সালোক সংশ্লেষ (প্রধানতঃ লাল আলোক), আলোকবৃত্তি (photoperiodism), পর্যায়বৃত্তি (periodism) এবং প্রজনন ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। সবুজ উদ্ভিদ সালোক সংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় আলোক শক্তিকে রাসায়নিক শক্তিরূপে পরিবর্তিত করে এবং এরা বাস্তুতন্ত্রের মুখ্য উৎপাদক

(producer) রূপে পরিগণিত হয়। যদিও প্রক্রিয়াটি তীব্র আলোকের উপস্থিতিতে হ্রাস পায়। আলোক সহনশীলতার উপর নির্ভর করে উদ্ভিদ কূলেক আলোক-বিরাগী বা **সিওফাইট** (sciophyte) এবং আলোক অনুরাগী বা হেলিওফাইট (heliophyte) প্রকারের ভাগ করা যায়। সিওফাইট উদ্ভিদ মৃদু আলোকেও উঁচুহারে সালোক-সংশ্লেষ প্রক্রিয়া সম্পাদন করে।

অধিকাংশ উদ্ভিদ ও কয়েক প্রকার প্রাণী (যথা—ইউগ্লিনা) আলোকের উৎসের দিকে বৃদ্ধি ও গমন দেখায়। একে আলোকবৃত্তি বা ফোটোট্রপিজম্ বলে। আলোক উদ্দীপনার ফলে প্রাণীর গতির তারতম্য দেখালে ঘটনাটি **ফোটোকাইনোসিস** (photokinesis) নামে অভিহিত হয়।

আলোক ও অন্ধকারের প্রাত্যহিক চক্রটি বহু জীবের আচরণ ও বিপাক-ক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। এই প্রাকৃতিক ছন্দবদ্ধ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে জীবের প্রতিক্রিকে **পর্যায়বৃত্তি** (periodism) বলে। প্রাণীজগৎ শারীরবৃত্তীয়, বাস্তুতন্ত্রীয় এবং আচরণগতভাবে অভিযোজিত হয় ও পর্যায়বৃত্তি প্রদর্শন করে। ফলে প্রজাপতি, ফড়িং, মৌমাছি, বাজপাখী, কাঠবেড়ালী প্রভৃতি দিনের আলোকে সক্রিয় থাকে। অন্যদিকে রাত্রির অন্ধকারে শিয়াল, পেঁচা ও মথ প্রভৃতি প্রাণী খাদ্য অন্বেষণে বের হয়। বহু প্রাণী অন্তর্নিহিত নিয়ন্ত্রণ (intrinsic control) ব্যবস্থা দ্বারা সময় পরিমাপ করতে পারে। বহিঃ ও অন্তঃপরিবেশের ছন্দ বজায় রাখতে অলোক এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। অন্তর্নিহিত ছন্দটি আনুমানিক 24 ঘন্টা ব্যাপী স্থায়ী হয় এবং একে দৈনিক বা **সারকাডিয়ান** (circadian, circa = about, dian = a day) ছন্দ বলে। এছাড়া বিভিন্ন প্রাণী পাক্ষিক, ঋতুকালীন, বাৎসরিক এবং জোয়ার-ভাঁটা সময় সম্পর্কিত ছন্দও প্রদর্শন করে। প্রাণী বা উদ্ভিদের এই অন্তর্নিহিত সময় পরিমাপন ব্যবস্থাকে **জীবীয় ঘড়ি** (biological clock) বলে।

পাখীর প্রজনন-অঙ্গের বৃদ্ধির সঙ্গে দিনমান বৃদ্ধির সম্পর্ক দেখা যায়। শীত ঋতুতে পাখীর প্রজনন অঙ্গ সাধারণতঃ অত্যন্ত হ্রাসপ্রাপ্ত অবস্থায় থাকে। বসন্তকাল থেকে অঙ্গটির বৃদ্ধি ঘটে। পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে শীতকালীন দিন মানে দীর্ঘকাল ঐ পাখীগুলিকে প্রতিপালন করা হলে প্রজনন অঙ্গের বৃদ্ধি ঘটে না। কিন্তু শীতঋতুতে কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্ট গ্রীষ্মকালীন দিনমানে প্রজনন অঙ্গের দ্রুত বৃদ্ধি ঘটে থাকে।

7. **অক্সিজেন (Oxygen)** ঃ অক্সিজেন জীবনের মূল উৎস। এই প্রয়োজনীয় গ্যাসীয় পদার্থের অনুপস্থিতিতে জীবনের ক্রিয়াধারা অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব নহে। পরিবেশে অক্সিজেনের প্রাচুর্যতাহেতু জীবকূলের বিস্তারে এটি কদাচিৎ প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। যদিও সমুদ্রের গভীরতম অঞ্চলে প্রকৃতপক্ষে অক্সিজেন থাকে না।

অক্সিজেন সাধারণতঃ সবাত শ্বসনে অভ্যস্ত সকল জীবকূলের পক্ষেই একটি সীমা-নির্ধারণকারী শর্তরূপে পরিগণিত হয়। বায়বীয় পরিবেশে (প্রায় 21 শতাংশ) জলীয় পরিবেশ (প্রায় 10 শতাংশ) অপেক্ষা বেশী অক্সিজেন থাকে। স্থলভাগে সাধারণতঃ অক্সিজেনের বিশেষ পরিমাণগত তারতম্য দেখা যায় না। যদিও সুউচ্চ আলপাইন তুন্দ্রা অঞ্চলে বায়ুস্তর পাতলা হওয়ায় অক্সিজেনের পরিমাণ কমে আসে। অন্যদিকে জলজ পরিবেশে তাপমাত্রার তারতম্যতা ও দ্রবীভূত লবণের পরিমাণ অক্সিজেন ধারণে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য দেখায়। কম তাপমাত্রায় জলীয় পরিবেশে বেশী পরিমাণে অক্সিজেন দ্রবীভূত হয় এবং বেশী লাবণিকতায় এর দ্রবণীয়তা হ্রাস পায়। জলীয় পরিবেশে মূলতঃ ব্যাপন প্রক্রিয়ায় বায়ু থেকে অক্সিজেন দ্রবীভূত হয় ও জলজ উদ্ভিদের সালোক সংশ্লেষের ফলে অক্সিজেন মুক্ত হয়।

স্বাদু জলের কয়ে প্রকার প্রজাতির স্থানিক বিস্তারে (local distribution) অক্সিজেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। গ্রীষ্মকালে প্রাণী ও উদ্ভিদে ভরপুর অগভীর ইউট্রফিক (eutrophic) জলাশয়ের স্থির, অপ্রশস্ত তলদেশ বা হাইপোলিম্‌নিয়ন (hypolimnion) অঞ্চলে অক্সিজেনের অভাব দেখা যায় এবং ঐ অঞ্চলে শুধুমাত্র অবাত শ্বসনে অভ্যস্ত জীবসমূহ বেঁচে থাকে। কয়েক প্রকার কাইরোনমিড (chironmid) পতঙ্গের লার্ভার সামান্য অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় এবং ঐ পরিবেসে বেঁচে থাকে। অন্যদিকে প্রাণী ও উদ্ভিদে অপ্রচুর গভীর অলিগোট্রফিক (oligotrophic) জলাশয়ের প্রশস্ত, শীতল হাইপোলিম্‌নিয়ন অঞ্চলে সারা বছরই পর্যাপ্ত পরিমাণে অক্সিজেন থাকে। আম্লিক জলা পুকুর (acid bog lake) বা **ডিস্‌ট্রফিক** (dystrophic) জলাশয়ে বছরের অধিকাংশ সময়ে পচনক্রিয়ার ফলে প্রায়ই অক্সিজেন থাকে না। তুলনামূলকভাবে প্রবহমান ঝর্ণা বা অগভীর নদীতে নিরবচ্ছিন্ন গতিশীলতার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে অক্সিজেন জলে দ্রবীভূত থাকে। ঐ পরিবেশে বসবাসকারী জীবকূল কম অক্সিজেনে বসবাস করতে পারে না। বালুকাময় তটভূমিতে 60 সে.মি. পর্যন্ত গভীরতায় অক্সিজেনের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। মুখ্যতঃ এই অঞ্চলে ঢেউ-এর প্রাবল্য ও বালুকাকণার আকার অক্সিজেনের পরিমাণ নির্ধারণ করে। সমুদ্রের বেলাভূমির জলাশয়ে (tidal pool) প্রায়শঃই দিবাভাগের তপ্ত দিনগুলিতে শুষ্কীকরণের ফলে অক্সিজেনের পরিমাণ কমে আসে। ফলে কয়েক প্রকার বায়বীয় শ্বসনে অভ্যস্ত প্রাণীই ঐ জলাশয়ে বেঁচে থাকে। কিন্তু কাদাটে তটভূমিতে (mud beach) সূক্ষ্ম বালুকাকণার জন্য কম বায়ুগহ্বর ও ঢেউ-এর অপ্রতুলতাহেতু অক্সিজেন অত্যন্ত কম থাকে। ফলে ঐ অঞ্চলে গর্তবাসী প্রাণীকূল উপরের জলস্তর থেকে শ্বসনের জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেন সংগ্রহ করে।

3.2.2 বাস্তুতন্ত্রের বিভিন্ন সজীব বা বায়োটিক শর্তসমূহ (Biotic factors of ecosystem)

3.2.2.1 সংজ্ঞা ঃ পরিবেশের যে উপাদানগুলির জীবন আছে এবং জীবিতাবস্থায় পরিবেশের সঙ্গে এবং নিজেদের মধ্যে আন্তঃক্রিয়া করে তাদের সজীব বা বায়োটিক শর্ত বলে। বায়োটিক শর্তগুলি পার্থিব ভৌত ও রাসায়নিক পরিবেশকে পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখে।

3.2.2.2 বায়োটিক শর্তসমূহের শ্রেণীবিন্যাস

I পুষ্টির প্রকৃতির উপর নির্ভর দ্বারা

স্বভোজী (Autotrophs) ঃ বাস্তুতন্ত্রে যে সজীব উপাদানগুলি নিজেরা নিজেদের খাদ্য সংশ্লেষের ক্ষমতা রাখে তাদের স্বভোজী জীব বলে। এদের মধ্যে ক্লোরোফিল যুক্ত সবুজ উদ্ভিদ এবং কিছু ব্যাকটেরিয়া ও ইউগ্লিনা (নামক প্রাণী) উল্লেখযোগ্য (রাসায়নিক সংশ্লেষী এবং সালোক সংশ্লেষী প্রকারের)।

পরভোজী (Heterotrophs) ঃ এরা পুষ্টির ব্যাপারে স্বভোজী উদ্ভিদের উপর প্রত্যক্ষ (শাকাশী পরভোজী) বা পরোক্ষভাবে (মাংসাশী) নির্ভরশীল হয়। এরা আবার দু'প্রকারের হয়—

(i) ফ্যাগোট্রফ (Phagotroph) ঃ এই জীবেরা দেহাভ্যন্তরে খাদ্যবস্তু গ্রহণ (ingestion) এবং পাচনে (digestion) অভ্যস্ত হয়। এই সকল প্রাণীরা আবার প্রকৃতিতে শাকাশী, মাংসাশী এবং সর্বভূক প্রকারের হতে পারে।

(ii) অস্‌মোট্রফ (Osmotroph) ঃ এই জীবগুলি পাচন রস ক্ষরণ এবং খাদ্যবস্তুকে জারিত করে সরল খাদ্য কণা শোষণ করে। পরজীবী (parasitic) এবং মৃতজীবী (saprophytic or saprozoic) স্বভাবের

বিভিন্ন জীব যেমন ব্যাকটেরিয়া এবং ছত্রাক এই প্রকার পুষ্টির উদাহরণ। এদের বিযোজক (Decomposer) বা পরিবর্তকও (Transformer) বলা যেতে পারে। পরিবেশে এরাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

II. বাস্তুতান্ত্রিক বৃত্তির উপর নির্ভর দ্বারা

উৎপাদক (Producers) ঃ এরা স্বভোজী চরিত্রের হয়। অর্থাৎ সালোক সংশ্লেষ কম সবুজ উদ্ভিদ সূর্যালোকের সাহায্যে সরল অজৈব বস্তুগুলি থেকে জৈব বস্তু অর্থাৎ শর্করা জাতীয় খাদ্য উৎপাদন করে।

খাদক (Consumers) ঃ এরা সকলেই পরভোজী জীব। এদের অধিকাংশই প্রাণী যারা অন্য প্রাণীকে খাদ্যরূপে গ্রহণ করে অথবা জীবের দেহাবশেষ থেকে জৈব পদার্থ গ্রহণ করে বেঁচে থাকে। এই ধরনের জীবেরা আবার দু' প্রকারের হতে পারে—

ম্যাক্রোকন্‌জিউমার বা বড় আকারের খাদক ঃ এই প্রকার খাদক আকারে বড় হয় যেমন— পতঙ্গের লার্বা, মাছ, উভচর, সরিসৃপ, পাখী ও স্তন্যপায়ী প্রাণী ইত্যাদি।

মাইক্রোকন্‌জিউমার বা ক্ষুদ্র আকারের খাদক ঃ এরা আকারে অত্যন্ত ক্ষুদ্র হয় যেমন— স্থলজ ইকোসিস্টেমের কোলেম্বলা অথবা মাকড় জাতীয় সন্ধিপদী প্রাণী।

বিযোজক (Decomposers) ঃ ব্যাকটেরিয়া, ফ্ল্যাজেলেটে ও ছত্রাক জাতীয় স্যাপ্রোট্রফিক জীব মৃত জীবের দেহাবশেষ থেকে সরল জৈব বস্তু গ্রহণ কবে এবং অবশিষ্ট সরল পুষ্টিবস্তু পরিবেশে মুক্ত করে।

3.3 বায়োটিক শর্তগুলির বাস্তুতান্ত্রিক গুরুত্ব (Ecological importance of biotic components)

স্বভোজী বা অটোট্রফ

1. এরা সূর্যালোককে কাজে লাগিয়ে জৈব অণুর রাসায়নিক বন্ধনীর সংশ্লেষ ঘটায়। এই কাজের অনুপস্থিতিতে পৃথিবীতে জীবনের অস্তিত্ব সম্ভব হত না।

2. এরা মৃত্তিকা বা জল থেকে কিছু খনিজ দ্রব্য অথবা আয়ন সংগ্রহ করে প্রোটোপ্লাজমে আত্তীকরণ করে। প্রাণীরা ঐ বস্তুগুলিকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পেয়ে থাকে।

3. জীবের বিভিন্ন বাসস্থানের পক্ষে সহায়ক হয়।

4. পরিবেশের উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে যেমন—মৃত্তিকার প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়; জলবায়ুর পরিবর্তনেও বিশেষ ভূমিকা আছে। যেমন— বাতাসের প্রতিবন্ধকতা (wind break) সৃষ্টি ও বাষ্পমোচন বৃদ্ধি তথা তাপমাত্রা হ্রাসে সহায়ক হয়।

5. পরিবেশে গ্যাসীয় বস্তুর সাম্যতা বজায় রাখে।

পরভোজী বা হেটারোট্রফ

1. স্বভোজী উদ্ভিদ থেকে আয়ন, মৌল ইত্যাদি প্রাপ্তির পর পরভোজী জীবের প্রোটোপ্লাজমীয় বস্তুতে পরিণতকরণ এবং রেচনক্রিয়ার দ্বারা আবার পরিবেশে ফিরে আসা সম্ভব হয়।

2. সবুজ উদ্ভিদ কর্তৃক সৌরশক্তি হতে প্রস্তুত খাদ্যের কিছু অংশ এই জীবের প্রোটোপ্লাজমীয় অংশে পরিণতকরণ এবং বাকী অংশ তাপশক্তিরূপে বিমোচন ঘটে।

3. পরভোজী জীবেরা যেহেতু কেউ মাংসাশী, কেউ পরজীবী আবার কেউ বিযোজকরূপে ভূমিকা গ্রহণ করে কাজেই জীবের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণে এরা গুরুত্বপূর্ণ।

3.4 বায়োটিক আন্তঃক্রিয়াসমূহ (Biotic interactions)

3.4.1 প্রতিযোগিতা (Competition)

একই প্রজাতির অন্তর্গত অথবা ভিন্ন প্রজাতির সভ্যদের মধ্যে পুষ্টি ও বেঁচে থাকা নিয়ে যে সব ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া চলে তাদের প্রতিযোগিতা বলা হয়। দুটি প্রতিযোগী প্রজাতির মধ্যে বৃদ্ধি সম্পর্কিত যে প্রতিযোগিতামূলক প্রতিক্রিয়া চলে তা দুটি সমীকরণ দ্বারা গাণিতিকভাবে প্রকাশ করা যায়।

$$\frac{dN_1}{dt} = r_1 N_1 \left(\frac{K_1 - N_1 - \alpha N_2}{K_1} \right)$$

এবং $$\frac{dN_2}{dt} = r_2 N_2 \left(\frac{K_2 - N_2 - \beta N_1}{K_2} \right)$$

যেমন, α = প্রজাতি 1 এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রজাতি 2 এর প্রতিযোগিতামূলক গুণাঙ্ক (coefficient)

β = প্রজাতি 2 এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রজাতি 1 এর প্রতিযোগিতামূলক গুণাঙ্ক

K = পরিবেশের ধারণ ক্ষমতা বা carrying capacity

N = পপুলেশনের আকার

r = পপুলেশনের প্রজনন হার

এটি স্বীকার্য, যে প্রতিযোগীর প্রতিযোগিতামূলক গুণাঙ্ক অপেক্ষাকৃত বেশী সেটি অন্যকে দূরে হটিয়ে দেয়।

কাজেই, যখন $\frac{dN_1}{dt} = \frac{dN_2}{dt} = 0$ হয় তখন আবার সাম্যতা ফিরে আসে।

3.4.2 সহাবস্থান (Cohabitation)

স্বাভাবিক অবস্থায় দেখা যায় যে কোনও প্রজাতির পপুলেশন অন্য প্রজাতির পপুলেশনের সঙ্গে একই বাসস্থানে অবস্থান করে। যদিও বাস্তবিকভাবে একই রসদের জন্য প্রতিযোগিতা করে দুটি পপুলেশন এক বাসস্থানে থাকতে পারে না। দক্ষিণ আফ্রিকার সংরক্ষণাঞ্চলে এইরূপে পর্যটকরা কখনও আশা করেন না যে একই সময়ে তারা সিংহ, লেপার্ড এবং চিতা দেখার সুযোগ পাবেন। যদিও এই সব শিকারজীবী প্রাণীরা প্রায় একই বাসস্থানে থাকে। কিন্তু সিংহ প্রধানতঃ মহিষজাতীয় প্রাণী, লেপার্ড মূলতঃ বেবুন ও হনুমান এবং চিতা মূলতঃ হরিণজাতীয় প্রাণী শিকার করে।

3.4.3 শিকারজীবিতা (Predation)

এক্ষেত্রে দুটি প্রজাতীর আন্তঃক্রিয়ায় একে অপরের বৃদ্ধিকে এবং বেঁচে থাকার পক্ষে আশঙ্কার কারণ হতে পারে। শিকারজীবিতা নিম্নলিখিত প্রকারের হতে পারে।

1. **মাংসাশীবৃত্তি (Carnivory)** ঃ কোনও প্রাণী যখন শাকাশী প্রাণী অথবা মাংসাশী প্রাণী ভক্ষণ করে।

2. **পরজীবিতা (Parasitism)** ঃ প্রাণী বা উদ্ভিদ যখন অন্য আশ্রয়দাতা জীবের উপর পুষ্টির জন্য নির্ভরশীল হয়ে পড়ে কিন্তু যখন আশ্রয়দাতার জীবনহানি ঘটায় না।

3. **স্বপ্রজাতিভোক্তা (Cannibalism)** ঃ এটি একটি বিশেষ ধরনের শিকারজীবিতা যেখানে শিকারী ও শিকার একই প্রজাতিভুক্ত হয়ে থাকে।

3.4.4 মিথোজীবিতা (Symbiosis)

এক্ষেত্রে অংশগ্রহণরত দুটি প্রজাতির সভ্যেরা একে অপরের উপকারমূলক সম্পর্ক স্থাপন করে বেঁচে থাকে। মিথোজীবিতা সাম্প্রতিককালে মিউচুয়ালিজম (mutualism) নামে চিহ্নিত হয়। প্রবাল দ্বীপে প্রাপ্ত ক্লীনার ফিশ একদিকে যেমন প্রবাল প্রাণীর পরজীবী প্রাণীও মৃত চর্ম ভক্ষণ করে এবং অন্যদিকে সে আশ্রয়দাতা প্রবাল থেকে নিশ্চিন্ত আশ্রয় লাভ করে।

3.4.5 কমেন্‌সালিজম্‌ (Commensalism)

এটি দুই ভিন্ন প্রজাতির জীবের এমন এক নির্ভরশীলতা যেখানে একটি প্রজাতির সভ্য সর্বদা উপকৃত হয় এবং অন্য প্রজাতির কোনও সুবিধা বা ক্ষতি হয় না। উদাহরণস্বরূপ সন্ন্যাসী কাঁকড়ার খোলকে সী অ্যানিমোন নামক নিডারিয়া প্রাণীর আশ্রয়ের ফলে এই সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এতে নিশ্চল সী-অ্যানিমোন প্রাণীটি এক স্থান থেকে অন্যস্থানে যাওয়ার সুযোগ লাভ করে। কিন্তু খোলকের বাইরে সী-অ্যানিমোনের উপস্থিতিতে সন্ন্যাসী কাঁকড়ার কোনও লাভ বা ক্ষতি হয় না।

নিচের ছকে বায়োটিক আন্তঃক্রিয়ার বিভিন্ন সম্পর্কগুলি দেখানো হল ঃ

আন্তঃক্রিয়ার প্রকৃতি	প্রজাতি 1	প্রজাতি 2
মিউচুয়ালিজম্‌	+	+
কমেন্‌সালিজম্‌	+	0
হার্বিভোরা	+	–
প্রিডেশন	+	–
পরজীবিতা	+	–
প্রতিযোগিতা	+	–
+ = পজিটিভ ক্রিয়া,	0 = প্রতিক্রিয়াহীন	– = ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া

3.5 সারাংশ

পরিবেশে বর্তমান বিভিন্ন জীবসমূহের মধ্যে সর্বদাই একটি আন্তঃসম্পর্ক বিদ্যামান থাকে। এই সম্পর্কে সুস্থিতি দেবার জন্য কিছু নির্দিষ্ট উপকরণ বা শর্তের প্রয়োজন হয়। বাস্তুবিদ্যায় এই শর্তসমূহকে বায়োটিক এবং আবায়োটিক শর্ত হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। আবায়োকি শর্তসমূহের মধ্যে জলবায়ু, বায়ু, তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, আলো, অক্সিজেন প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ। আবার বায়োটিক শর্তসমূহের মধ্যে স্বভোজী ও পরভোজী জীবসমূহের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের কারণসমূহ উল্লেখযোগ্য। বর্তমান নিবন্ধ অনুশীলনের মাধ্যমে উল্লিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে আপনারা জ্ঞান আহরণ করেছেন।

3.6 প্রশ্নাবলী

(a) বাস্তুতন্ত্রের বিভিন্ন আবায়োটিক শর্তগুলি কি?

(b) পরজীবির সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ উল্লেখ করুন।

(c) বায়োটিক আন্তঃক্রিয়া সম্বন্ধে আপনারা মতামত ব্যক্ত করুন।

(d) শিকারজীবিতা কি?

(e) মিথোজিবীতা ও কমেন্‌সালিজিমের পার্থক্য নিরূপণ করুন।

3.7 উত্তরমালা

(a) নিবন্ধের 3.2.1.3. অংশ দ্রষ্টব্য

(b) নিবন্ধের 3.2.2.2 অংশ দ্রষ্টব্য

(c) নিবন্ধের 3.4 অংশ দ্রষ্টব্য

(d) এককের 3.4.3 অংশ দ্রষ্টব্য

(e) এককের 3.4.4 ও 3.4.5 অংশ দ্রষ্টব্য

একক 4 ❑ পপুলেশন ইকোলজি (Population Ecology)

গঠন

4.1 প্রস্তাবনা
উদ্দেশ্য

4.2 পপুলেশনের সংজ্ঞা

4.3 পপুলেশনের বৈশিষ্ট্যসমূহ

4.3.1 পপুলেশন ঘনত্ব

4.3.2 পপুলেশন বিসরণ

4.3.3 বয়সভিত্তিক গঠন

4.3.4 পপুলেশনের হ্রাস-বৃদ্ধি

4.3.5 পপুলেশন বিস্তার

4.3.6 জন্মহার বা ন্যাটালিটি এবং মৃত্যুহার বা মটালিটি

4.3.7 প্রতিযোগিতা ও যুগপৎ অবস্থান

4.3.8 r ও k নির্বাচন

4.4 পপুলেশনের ঘনত্ব নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া

4.5 সারাংশ

4.6 প্রশ্নাবলী

4.7 উত্তরমালা

4.1 প্রস্তাবনা

প্রকৃতিতে কোনও জীব পরিবেশ ছাড়া বাঁচতে পারে না। ইকোসিস্টেম অধ্যয়ন ও কমিউনিটি ইকোলজির এটি হল গোড়ার কথা। কমিউনিটি ও ইকোসিস্টেমে বহু প্রজাতি থাকে এবং প্রত্যেকে নিজের ভূমিকা পালন করে। প্রজাতির ভূমিকার যাবতীয় বিষয়গুলির অধ্যয়ন পপুলেশন ইকোলজির অন্তর্ভুক্ত হয়। জীববিজ্ঞানীদের কাছে পপুলেশন ইকোলজি একটি বিশেষ আগ্রহজনক বিষয় রূপে পরিগণিত হয়। কারণ পপুলেশন হল বিবর্তনের মূল একক।

উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি—

- পপুলেশন সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন।
- পপুলেশনের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাবেন।
- জন্মহার ও মৃত্যুহারের সঙ্গে পপুলেশন ঘনত্বের সম্পর্ক নিরূপন করতে পারবেন।
- প্রতিযোগিতা ও যুগপৎ অবস্থান সম্পর্কে ধারণা পাবেন।
- পপুলেশনের ঘনত্ব নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা পাবেন।

4.2 পপুলেশনের সংজ্ঞা (Definition of Population)

Mackenzie et al. (1999) এর মতে, "পপুলেশন হল একই প্রজাতির অন্তর্গত জীবগোষ্ঠী যারা একটি নির্দিষ্ট সময়ে ও নির্দিষ্ট এলাকায় বসবাস করে।" ইকোলজিস্টগণ প্রায়ই প্রকৃতিতে পপুলেশনের একটি সীমারেখা টানতে সক্ষম হন যেমন, কোনও দ্বীপপুঞ্জে ইঁদুরের পপুলেশন বা কোনও জলাশয়ে স্টিক্‌লব্যাক মাছের পপুলেশন ইত্যাদি। পপুলেশন প্রকৃতিতে ঐকিক (Unitary) জীবগোষ্ঠীরূপে থাকতে পারে। এক্ষেত্রে প্রতিটি জীব সরাসরি একটি জাইগোট থেকে উৎপাদিত হয়ে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে পরিস্ফুরিত হয়। যেমন, বিভিন্ন স্তন্যপায়ীর পপুলেশন। আবার বিপরীত দিকে, পপুলেশন ইপাংশীয় (moduler) জীবগোষ্ঠী রূপে আত্মপ্রকাশ করে। এক্ষেত্রে জাইগোট একটি গঠনগত এককরূপে পরিস্ফুরিত হয়। যেমন, প্রবাল এবং হাইড্রয়েড নিডারিয়া প্রাণীর অন্তর্গত বিশেষ প্রজাতির পপুলেশন।

4.3 পপুলেশনের বৈশিষ্ট্যসমূহ (Population Properties)

4.3.1 পপুলেশন ঘনত্ব (Population Density)

কোনও পপুলেশনের অন্তর্গত জীবের প্রতি একক এলাকাতে/আয়তন (area/volume) প্রাপ্ত সংখ্যার প্রকাশকে পপুলেশন ঘনত্ব বলে। সাধারণতঃ স্থলজ জীবের ক্ষেত্রে প্রথম এবং জলজ জীবের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় এককটি ব্যবহৃত হয়। উদাহরণস্বরূপ, বনাঞ্চলের প্রতি বর্গ কি.মি. এলাকায় হরিণের সংখ্যা মনে করা যাক 50টি অথবা পুকুরের প্রতি সি.সি. জলে 5টি ডাফনিয়া *(Daphnia)* আছে।

কিছু ক্ষেত্রে পপুলেশন ঘনত্ব প্রধানত দুটি উপায়ে প্রকাশ করা হয়—

(i) স্থূল ঘনত্ব (Crude density)— মোট এলাকা/আয়তন পিছু জীবের মোট সংখ্যা/বায়োমাসের প্রকাশকে এই প্রকার ঘনত্ব বলে। যেমন, স্থলভূমির প্রতি বর্গ কি.মি. পিছু হরিণ সংখ্যা। যদিও এক্ষেত্রে সামগ্রিক স্থলভূমির একটি নির্দিষ্ট অংশে হরিণ বিচরণ করে।

(ii) বাস্তুতান্ত্রিক ঘনত্ব (Ecological density)—প্রকৃত বসবাসযোগ্য মোট এলাকা/আয়তন পিছু মোট সংখ্যা/বায়োমাসের প্রকাশকে বাস্তুতান্ত্রিক ঘনত্ব বলা হয়। যেমন, পরিণত ধানগাছের ক্ষেত এলাকা পিছু মাজরা পোকার সংখ্যা।

পপুলেশন ঘনত্বের বিভিন্ন পরিমাপ করা যায়। যেমন, মোট সংখ্যা গণনা (total count) মোট বনাঞ্চলে বাঘ, হাতি ইত্যাদির ক্ষেত্রে করা সম্ভব। ব্যাপক বিস্তার প্রদর্শনকারী ছোট প্রাণীর ক্ষেত্রে (পতঙ্গ, অ্যানিলিডা প্রাণী) নমুনা প্রথা (sampling method) অত্যন্ত কার্যকর হয়। এক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি স্বল্প এলাকায় (বর্গ সে.মি. বা মি.) সংখ্যার নমুনা নিয়ে বড় এলাকায় (বর্গ কি.মি.) প্রকাশ করা হয়। এছাড়া পরোক্ষ প্রথায় (indirect method) যেমন, বর্জ্যবটিকা (faccal pellets) গণনা, শব্দের কম্পাঙ্ক (vocalisation frequency) দ্বারা পপুলেশন ঘনত্ব সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

4.4.2 পপুলেশন বিসরণ (Populaton Dispersion)

একে অপরের পরিপ্রেক্ষিতে পপুলেশনের সভ্যগুলির নির্দিষ্ট তলে ছড়িয়ে পড়ার ধরনকে বিসরণ বলে। তিন প্রকার বিসরণ চিহ্নিত করা যায়।

(i) নিয়মিত (regular)— যখন প্রজাতির সভ্যগুলি কোনও নির্দিষ্ট তলে নিয়মিতভাবে ছড়িয়ে থাকে। যেমন, ধানক্ষেতে ধান গাছের অবস্থান।

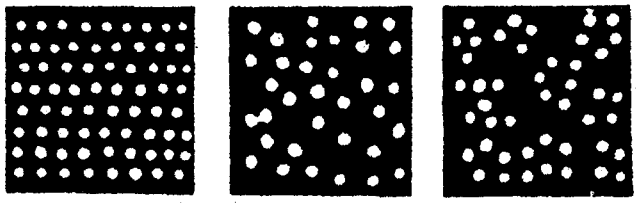

চিত্র নং 1 : পপুলেশনের বিভিন্ন প্রকার বিসরণের চিত্ররূপ
A নিয়মিত, B বিক্ষিপ্ত, C পুঞ্জ

(ii) বিক্ষিপ্ত (random)— যখন কোনও প্রজাতির সভ্যগুলি সম্ভাব্য বিভিন্ন এলাকায় যথেচ্ছভাবে ছড়িয়ে থাকে। যেমন, ময়দার নি ময়দার বিট্‌স্ পোকার অবস্থান।

(iii) পুঞ্জ (clumps)— যখন প্রজাতির সভ্যগুলি ব্যাপক এলাকায় সুবিধাজনক স্থানে পুঞ্জীভূত হয়ে ছড়িয়ে থাকে। যেমন, শহরে মানুষের অবস্থান।

4.3.3. বয়সভিত্তিক গঠন (Age Structure)

অধিকাংশ পপুলেশনের সভ্যগুলি বিভিন্ন বয়সের হয়। সভ্যগুলির বয়সভিত্তিক গোষ্ঠীর আনুপাতিক প্রকাশকে ঐ পপুলেশনের বয়সভিত্তিক গঠন বলা হয়। কোনও পুপলেশনের বিভিন্ন বয়স গোষ্ঠীর অনুপাত প্রজননগত সাফল্য/অসাফল্যকে চিহ্নিত করে। ফলে ঐ পপুলেশনের ভবিষ্যত চিত্র সম্পর্কেও আগাম ধারণা পাওয়া যায়। বাস্তুতান্ত্রিকভাবে যে কোনও পপুলেশন তিন প্রকার বয়সভিত্তিক গোষ্ঠী থাকে যেমন— প্রাক্-প্রজনন, প্রজনন এবং পরপ্রজনন-গত গোষ্ঠী। যে চিত্র দ্বারা পপুলেশনের বিভিন্ন বয়সভিত্তিক গোষ্ঠীকে

আনুপাতিক হারে প্রকাশ করা হয় তাকে বয়সভিত্তিক পিরামিড (age pyramid) বলে। তিন প্রকারের কাল্পনিক পিরামিডের প্রস্তাবনা বলা হয়। যেমন—

(i) চওড়া ভূমিযুক্ত পিরামিড (pyramid with broad base)— এই প্রকার গঠন কোনও পপুলেশনে বেশী সংখ্যক তরুণ সভ্যকে চিহ্নিত করে। দ্রুত বংশবৃদ্ধিকারী পপুলেশনে জন্মহার বেশী হয় এবং পপুলেশন অত্যন্ত দ্রুত হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে যেমন, প্যারামিসেয়ামের সংখ্যা বৃদ্ধি।

(ii) ঘন্টাকৃতি পলিগণ (bell-shaped polygon)— এই প্রকার গঠন প্রদর্শনকারী পপুলেশনে প্রাক্‌প্রজনন এবং প্রজননকারী গোষ্ঠী প্রায় সমসংখ্যক হয়। পর-প্রজনন গোষ্ঠী সবচেয়ে কম সংখ্যায় থাকে। কোনও সুস্থিত (stable) পপুলেশন এই প্রকার গঠন দেখায়।

(iii) ভস্বাধার আকৃতির গঠন (urn-shaped figure)— এই প্রকার গঠনযুক্ত পপুলেশনে কম সংখ্যক তরুণ সভ্য থাকে। প্রাক্‌প্রজনন গোষ্ঠী অন্য গোষ্ঠীর তুলনায় হ্রাস পেতে থাকে। কোনও বিলুপ্তপ্রায় পপুলেশন এই গঠন দেখায়।

চিত্র নং 2 : পপুলেশনের বয়সভিত্তিক গঠনের চিত্ররূপ

4.3.4 পপুলেশনের হ্রাস-বৃদ্ধি (Population Fluctuation)

প্রাকৃতিক পপুলেশন নিয়ে গবেষণাকালে দেখা যায় যে অন্ততঃপক্ষে তিন প্রকার ক্রম পরিবর্তন হতে পারে।

(i) হ্রাস-বৃদ্ধিহীন (non-fluctuating)— কিছু প্রজাতির পপুলেশন বছরের পর বছর সভ্যগুলির বৃদ্ধি ও হ্রাস প্রায় একই ভাবে চলে। আমেরিকায় bobwhite quail পাখির পপুলেশন দীর্ঘদিন কোনও এলাকায় একই হারে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে।

(ii) চক্রাকার (cyclic)— বেশ কয়েক বছরের ব্যবধানে কিছু প্রজাতির পপুলেশনে নিয়মিত হ্রাস-বৃদ্ধি দেখা যায়। অর্থাৎ এক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমিক সিগময়েড কার্ভ চোখে পড়ে। কানাডাতে প্রাপ্ত মাংসাশী *Lynx* প্রাণী এবং স্নোশু খরগোসের *(Lepux)* পপুলেশনে প্রায় প্রতি দশ বছর অন্তর ঐ দুটি প্রাণীর পপুলেশন বৃদ্ধি দেখা যায়।

(iii) সহসা ব্যাপক বৃদ্ধিযুক্ত (irruptive)— এক্ষেত্রে কিছু পপুলেশনের সংখ্যা দীর্ঘদিন নিয়মিত বৃদ্ধি দেখানোর পর হঠাৎ ব্যাপক সংখ্যায় বৃদ্ধি পায় এবং অচিরেই আবার নিয়মিত বৃদ্ধি চক্রে

ফিরে আসে। উদাহরণস্বরূপ, আমেরিকার ক্যালিফোর্ণিয়ার কার্ণ কাউন্টি এলাকায় 1926 সালে ইঁদুরের সংখ্যা হঠাৎ এই প্রকার বৃদ্ধি দেখায়, যার ফলে ঐ সময়ে প্রতি একরে প্রায় 80,000 সংখ্যায় প্রাণী পাওয়া গিয়েছিল।

4.3.5 পপুলেশন বিস্তার (Population Dispersal)

যে হারে কোনও স্থানের পপুলেশনে অন্য স্থান থেকে একই প্রজাতির কিছু সভ্য বাস করতে আসে। অথবা ঐ পপুলেশমন থেকে অন্য স্থানে বসবাসের জন্য গমন করে তাকে পপুলেশনের বিস্তার বলে। প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতা (barrier) এবং প্রাণীর নিজের গমন ক্ষমতার ওপর পপুলেশনের বিস্তার নির্ভর করে। প্রাণীরা সাধারণত খাদ্য সংগ্রহ বা খাদকের উৎপাদের জন বা জনসংখ্যার চাপে বা পরিবেশের প্রতিকূলতার জন্য অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ে। পপুলেশন বিস্তার তিন প্রকারের হতে পারে—

(i) প্রবাসে গমন বা এমিগ্রেশন (emigration)— কোন পপুলেশন থেকে অন্যত্র প্রাণীর গমন।

(ii) অভিবাসন বা ইমিগ্রেশন (immigration)— কোন পপুলেশনে অন্য স্থান থেকে প্রাণী বাস করতে আসা।

(iii) পরিমাণ বা মাইগ্রেশন (migration)— নিয়মিত ব্যবধানে প্রস্তান এবং ফিরে আসা। কোন এলাকার সমগ্র পপুলেশনে এই প্রকার বিস্তার দেখায়। পরিমাণ আবার দৈনিক (diurnal) বা ঋতুকালীন হতে পারে।

4.3.6 জন্মহার বা ন্যাটালিটি এবং মৃত্যুহার বা মটালিটি (Natality and Mortality)

নির্দিষ্ট একক সময়ে প্রজননের ফলস্বরূপ পপুলেশনে যে হারে নতুন সভা যুক্ত হয় তাকে ন্যাটালিটি বলে। এই ঘটনাকে দুইভাবে প্রকাশ করা যায় যেমন, সম্ভাবনাসূচক জন্মহার (potential notality) এবং বাস্তবিক জন্মহার (realised natality)। আদর্শ পরিবেশে কোনও প্রজাতি সর্বাধিক প্রজনন ক্ষমতা দ্বারা অপত্যের জন্ম দেওয়া বোঝাতে সম্ভাবনাসূচক জন্মহার বোঝায়। পরীক্ষাগারে আদর্শ কালচার মাধ্যমে প্যারামেসিয়ামের সংখ্যাবৃদ্ধি এই প্রকার জন্মহারের উদাহরণ হতে পারে। প্রকৃতিতে বিভিন্ন শর্তের পরিপ্রেক্ষিতে কোনও প্রজাতি প্রজননের ফলে যে অপত্যের জন্ম দেয় তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক বেঁচে থাকে। একে বাস্তবিক জন্মহার বলে। এই ঘটনাকে নিম্নোক্ত সূত্রের দ্বারা প্রকাশ করা যায়—

$$\text{জন্মহার } (B) = \frac{Nn}{t} \quad \frac{\text{পপুলেশনে নতুন সভ্যের যুক্ত হওয়ার সংখ্যা}}{\text{সময়}}$$

কোনও পপুলেশনের প্রকৃত সংখ্যক অপত্য জন্মদানের ক্ষমতাকে উর্বরতা (fertility) বলে। কিন্তু পপুলেশনের সর্বাধিক অপত্য উৎপাদনের সামর্থ্যকে অপত্য উৎপাদন ক্ষমতা (fecundity) বলা হয়।

নির্দিষ্ট একক সময়ে কোনও পপুলেশন থেকে যত সংখ্যক সভ্যের মৃত্যু ঘটে তার হারকে মৃত্যুহার বা মটালিটি বলে।

মৃত্যুহারকে নিম্নোক্ত উপায়ে প্রকাশ করা যায়—

$$m = \frac{d}{Nt}$$

অর্থাৎ, মৃত্যুহার (m) = $\frac{\text{নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে পপুলেশনের সভ্যের মৃত্যু সংখ্যা}}{\text{প্রারম্ভিক জীবিত সভ্য সংখ্যা}}$

কেন নির্দিষ্ট বয়সে কোনও পপুলেশনের কিছু সভ্যের মৃত্যু ঘটে এ বিষয়ে প্রাণীবিদ্‌গণ প্রায়ই আগ্রহ প্রকাশ করেন। এ সম্পর্কে দু' ধরনের আয়ুকালের প্রস্তাবনা করা হয়—

শারীরবৃত্তীয় আয়ুকাল (physiological longevity)— আদর্শ পরিবেশে কোন পপুলেশনের সভ্যের গড় আয়ুকালকে বলা হয়।

বাস্তুতান্ত্রিক আয়ুকাল (ecological longevity)—প্রকৃতিতে বসবাসরত কোনও পপুলেশনের সভ্যের গড় আয়ুকালকে এই প্রকারে চিহ্নিত করা হয়।

উত্তরজীবিতা (survivorship) হল মৃত্যুহারের বিপরীতার্থক প্রকাশ। অনেকক্ষেত্রে মৃত্যুহারের চেয়ে উত্তরজীবীর সংখ্যা নিরূপণ গুরুত্বপূর্ণ হয়। এই ঘটনাকে প্রত্যাশিত আয়ু (life expectancy) বলে। উত্তরজীবিকার পরিসংখ্যান থেকে **উত্তরজীববিতার লেখচিত্র** (survivorship curve) পাওয়া যায়। এটি তিন প্রকারের হতে পারে যেমন, উত্তর লেখচিত্র (convex curve), **অবতল লেখচিত্র** (concave curve) এবং **কৌণিক লেখচিত্র** (diagonal curve)।

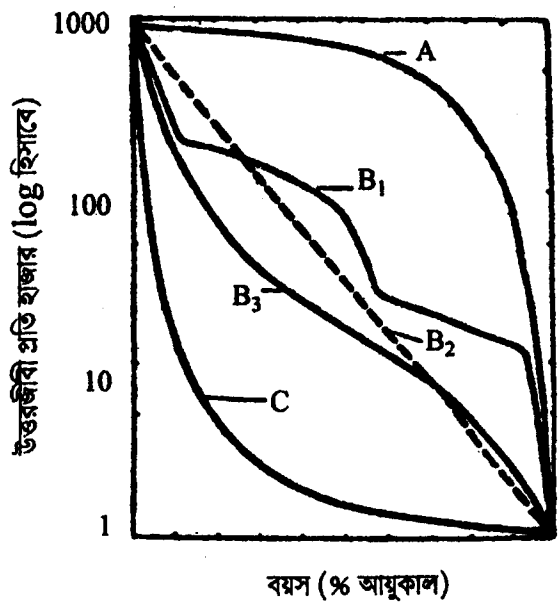

চিত্র নং 3 : উত্তরজীবির সংখ্যা এবং বয়সের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ধরনের উত্তরজীবিতার। B_2 লেখচিত্রটি কাল্পনিক যেখানে প্রাণীর বিভিন্ন বয়সে বেঁচে থাকা অপরিবর্তনীয়ভাবে লক্ষ্য করা যায়।

উত্তল লেখচিত্র— শাবক সংখ্যা অত্যন্ত বেশী এবং বয়স্ক সভ্যের মৃত্যু সংখ্যা বেশী, যেমন অধিকাংশ বড় আকারের স্তন্যপায়ী। উদাহরণ—লেখচিত্র A বা Type I প্রকৃতির।

অবতল লেখচিত্র— শাবক পর্যায়ে মৃত্যু অত্যন্ত বেশী, যেমন ঝিনুকের লার্ভা দশায় সবচেয়ে ক্ষয়ক্ষতি হয়। উদাহরণ—লেখচিত্র C বা Type III বলা হয়।

কৌণিক লেখচিত্র— জীবদ্দশায় প্রায় সব দশায় সমানহারে মৃত্যু ঘটে। বহু পাখির ক্ষেত্রে এই ঘটনা ঘটে। উদাহরণ—লেখচিত্র B_3। কিছু পতঙ্গ যেমন প্রজাপতির ক্ষেত্রে সিঁড়ির মত (stair steps) লেখচিত্র (B_1 হতে পারে)। এখানে জীবনচক্রের বিভিন্ন পর্যায়ে বেঁচে থাকার সময়কালে বিভিন্নতা দেখা যায়। এটিকে Type II লেখচিত্রও বলা হয়ে থাকে।

4.3.7 প্রতিযোগিতা ও যুগপৎ অবস্থান (Competition and Coexistence)

জীবমাত্রই বেঁচে থাকার জন্য একই প্রজাতির অন্য সভ্যের সঙ্গে (intraspecific) অথবা অন্য প্রজাতির সভ্যের সঙ্গে (interspecfic) প্রতিযোগিতা করে থাকে। প্রতিযোগিতা আবার দু'ধরনের চিহ্নিত হয়ে থাকে— রসদের জন্য **তীব্র কাড়াকাড়িমূলক বা রসদজনিত প্রতিযোগিতা** (scramble or resource competition) এবং **বিবাদমূলক বা সংগ্রামজনিত প্রতিযোগিতা** (contest or interference competition)। শেষোক্ত ক্ষেত্রে প্রজাতির সভ্যেরা অন্য সভ্যদের সঙ্গে দৈহিক বলপ্রয়োগে লিপ্ত হতে পারে। বলশালী সভ্যেরা কখনওবা এলাকা দখল করে অন্যদের হঠিয়ে দেয়। সাধারণত মেরুদণ্ডী প্রাণীদের ক্ষেত্রে সংগ্রামজনিত প্রতিযোগিতা দেখা যায়।

আমেরিকার Lotka (1925) এবং ইটালীর Volterra (1926) এই দুই গণিতবিদ্ স্বাধীনভাবে গাণিতিক পদ্ধতিতে প্রতিযোগিতামূলক আন্তঃক্রিয়া বর্ণনা করেছেন। পরবর্তীকালে এই গাণিতিক সূত্রটিকে Lotka-Volterra সমীকরণ বলা হয়। তাঁরা পপুলেশনের বৃদ্ধি সূচক logistic equationটিকে একই রচনার জন্য প্রতিযোগিতারত দুটি প্রজাতির সম্পর্ককে বোঝানোর জন্য কিছু পরিবর্তন করেন। এক্ষেত্রে প্রতি প্রজাতির জন্য একটি ধ্রুবক (constant) ব্যবহৃত হয় যা একে অপরের বৃদ্ধির বাধাকে (interference) সূচিত করে।

প্রজাতি 1 : $\frac{dN_1}{dt} = r_1 N_1 \left(\frac{K_1 - N_1 - aN_2}{K_1} \right)$

প্রজাতি 2 : $\frac{dN_2}{dt} = r_2 N_2 \left(\frac{K_2 - N_2 - \beta N_1}{K_2} \right)$

যেখানে r_1 এবং r_2 যথাক্রমে প্রজাতি 1 এবং 2 এর বৃদ্ধিহারকে বোঝায়। K_1 এবং K_2 যথাক্রমে একে অন্যের অনুপস্থিতিতে পপুলেশন আকারের সাম্যাবস্থাকে বোঝায়। a হল প্রজাতি 2-এর ধ্রুবক অর্থাৎ যার দ্বারা প্রজাতি 1-এর পপুলেশন বৃদ্ধির বিরুদ্ধে N_2 সভ্যের বাধাপ্রদানকে বোঝায়। একইভাবে b হল প্রজাতি 1-এর ধ্রুবক অর্থাৎ যার দ্বারা প্রজাতি 2-এর পপুলেশন বৃদ্ধির বিরুদ্ধে N_1 সভ্যের বাধাপ্রদানকে বোঝায়।

উপরোক্ত মডেলের জন্য কয়েকটি অনুমিত সত্য প্রস্তাবনার প্রয়োজন হয়—

1. পরিবেশ অবশ্যই সমপ্রকৃতির এবং অপরিবর্তনীয় চরিত্রের হওয়া প্রয়োজন।

2. প্রজাতি দুটির সভ্যের পরিযাণ নগণ্য হতে হবে।

3. প্রতিযোগিতার প্রতিক্রিয়া তাৎক্ষণিক হওয়া দরকার।

4. জৈবিক আন্তঃক্রিয়ার মধ্যে যাতে প্রতিযোগিতা মুখ্য ঘটনা হয়।

পরীক্ষাগারে প্রাণীর প্রতিযোগিতামূলক আন্তঃক্রিয়ার উদাহরণ—

বিগত শতাব্দীর চল্লিশের দশকে আমেরিকার চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী পার্ক (Thomas Park) এবং তাঁর ছাত্ররা ময়দা-পোকার (flour beetles) দুটি প্রজাতির মধ্যে প্রতিযোগিতা সম্পর্কে গবেষণা করেন। পোকার দুটি প্রজাতির নাম হল *Tribolium confusum* এবং *Tribolium castaneum*। পরীক্ষার শুরুতে পোকার পালন মাধ্যমটিতে আদ্যপ্রাণী পরজীবী *Adelina*-এর সংক্রমণে মুখ্যতঃ *T. castaneum*-এর পোকার মৃত্যু ঘটে। অর্থাৎ প্রারম্ভিকভাবে বেঁচে থাকার প্রতিযোগিতায় 74টি পরীক্ষার 66টি ক্ষেত্রে *T. castaneum*-এর পোকার মৃত্যু ঘটে। অর্থাৎ প্রারম্ভিকভাবে বেঁচে থাকার প্রতিযোগিতায় 74 টি পরীক্ষার 66টি ক্ষেত্রে *T. confusum* জয়ী হয়। কারণ তুলনামূলকভাবে এই প্রজাতিটি পরজীবী প্রতিরোধক্ষম হয়। এর *Adelina* পরজীবী নিয়ন্ত্রিত হলে *T. castaneum* 18টি পরীক্ষার মধ্যে 12টিতে জয়ী হয়। এর পর বিজ্ঞানী পার্ক অন্যান্য অজীবীয় বা আবায়োটিক শর্তের পরিপ্রেক্ষিতে পরীক্ষার বিভিন্ন ফলাফল লক্ষ্য করলেন। যার থেকে তিনি সিদ্ধান্তে পৌঁছালেন যে কোনও প্রজাতির প্রতিযোগিতার সামর্থ্য বিভিন্ন বায়োটিক ও আবায়োটিক শর্তের উপর নির্ভর করে।

ময়দা-পোকা *T. castaneum* এবং *T. confusum*-এর মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলাফল (Park, 1954)

তাপমাত্রা (0°C)	*আপেক্ষিক* আর্দ্রতা %	*জলবায়ু* সংখ্যা	*একপ্রজাতি*	*মিশ্র প্রজাতি (বিজয়ী %)*	
				T. confusum	*T. contaneum*
34	70	উষ্ণ-আর্দ্র	conf = cast	0	100
34	30	উষ্ণ-শুষ্ক	conf > cast	90	10
29	70	সমশীতোষ্ণ-আর্দ্র	conf < cast	14	86
29	30	সমশীতোষ্ণ-শুষ্ক	conf > cast	87	13
24	70	শীতল-আর্দ্র	conf < cast	71	29
24	30	শীতল-শুষ্ক	conf > cast	100	0

যুগপৎ অবস্থান—

সক্রিয় প্রতিযোগিতা মানেই যে একটি প্রজাতি স্থানচ্যুত হবে তা নাও হতে পারে। এর ফলে দেখা যায় যে এলাকায় দুটি প্রজাতি অবস্থান করে সেই স্থানে একটি প্রতিযোগী প্রজাতি তার জীবনযাত্রা পরিবর্তন দ্বারা অথবা খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন ঘটিয়ে প্রতিযোগিতাকে হ্রাস করে।

কার্যকরভাবে প্রতিযোগী দুই বা ততোধিক প্রজাতি একই বাসস্থানে থাকার ঘটনাকে প্রজাতির যুগপৎ অবস্থান বা কোএক্সিস্টেন্স (coexistence) বলে।

4.3.8 *r* এবং *k* নির্বাচন (*r* and *k* Selection)

পপুলেশনের প্রতিযোগিতা তত্ত্ব থেকে *r* এবং *k* নির্বাচন নামক একটি জনপ্রিয় ধারণায় পৌঁছানো যায়। বিজ্ঞানী MacArthur এবং Wilson (1967) *r* এবং *k* প্রজাতি সম্পর্কে প্রথম ধারণা প্রদান করেন। সব জীব অন্যের সঙ্গে ভালোভাবে প্রতিযোগিতা নাও করতে পারে। কিছু প্রজাতির জীব অত্যন্ত প্রতিকূল পরিবেশে ভালোভাবে মানিয়ে নিয়ে বাঁচতে সক্ষম, আবার কিছু প্রজাতি উপরোক্ত পরিবেশে আদৌ বসবাসে উপযোগী নয়। অর্থাৎ *k*-নির্বাচিত প্রজাতি প্রতিযোগিতাপূর্ণ পরিবেশে ভালোভাবে বেঁচে থাকে; কিন্তু *r*-নির্বাচিত প্রজাতির জীবনচক্র সংক্ষিপ্ত (fugitives), এরা দ্রুত বংশবিস্তারে সমর্থ কিন্তু প্রতিযোগিতাপূর্ণ পরিবেশে থাকার ক্ষমতা এদের একেবারে নেই বললেই চলে। বিজ্ঞানী Pianka বর্ণিত *r* এবং *k* নির্বাচনের পার্থক্য নীচের তালিকায় উল্লেখিত হল—

বৈশিষ্ট্য	*r*-নির্বাচন	*k*-নির্বাচন
অনুকূল জলবায়ু	পরিবর্তনশীল এবং পূর্বানুমান সম্ভব হয়, অনিশ্চিত।	মোটামুটি অপরিবর্তনীয়, পূর্বানুমান যোগ্য এবং নিশ্চিত।
মৃত্যু	প্রায়ই দুর্যোগের কারণে অনির্দেশিত এবং ঘনত্ব অনির্ভর।	অধিকাংশই নির্দেশিত। ঘনত্ব নির্ভর।
উত্তরজীবিতা	প্রায়সই Type III ধরনের।	সাধারণত Type I ও Type II ধরনের হয়।
পপুলেশনের আকার	সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে পার্থক্য দেখায়, অসাম্যতা চিহ্নিত হয়।	সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে প্রায় একই থাকে সাম্যতা দেখা যায়।
আন্তঃ ও অন্তঃ প্রজাতি প্রতিযোগিতা	পার্থক্য দেখায় এবং শিথিল ধরনের	তীক্ষ্ণ ধরনের।
নির্বাচনের আনুকূল্য	1. দ্রুত পরিস্ফুরণ 2. বেশী প্রজনন হার 3. দ্রুত পরিণতি ও প্রজনন ক্ষমতালাভ 4. ছোট দেহ আকার 5. একবার প্রজনন ক্রিয়াক্ষম	1. ধীর পরিস্ফুরণ 2. অত্যন্ত প্রতিযোগিতা সহনশীল 3. দেরীতে পরিণতি লাভ 4. বড় দেহ আকার 5. বারবার প্রজনন ক্রিয়াক্ষম
জীবনকাল	সংক্ষিপ্ত	দীর্ঘ
পরিচালিত হয়	উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য	যোগ্য প্রতিযোগী সৃষ্টির জন্য

4.4 পপুলেশনের ঘনত্ব নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া (Regulation of Population Density)

প্রকৃতিতে চার পকার পপুলেশন ঘনত্ব নিয়ন্ত্রণ শর্ত কার্যকর হয়।

(a) **ঘনত্ব সাপেক্ষ শর্ত** (Density dependent factors) : প্রতিদ্বন্দ্বিতা, খাদকচাপ, এমিগ্রেশন এবং ব্যাধি ইত্যাদি প্রজাতি অন্তঃস্থ শর্তের পরিপ্রেক্ষিতে পপুলেশন বৃদ্ধি বা ঘনত্ব হ্রাস পায়। উদাহরণস্বরূপ, *Drosophila melanogaster* মাছির পরীক্ষামূলক পপুলেশনের ডিমের সংখ্যা বৃদ্ধিতে দেখা যায় যে পরিণত মাছির সংখ্যা এবং অপত্য উৎপাদন ক্ষমতা (fecundity) হ্রাস পায়।

(b) **ঘনত্ব নিরপেক্ষ শর্ত** (Density independent factors) : এক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিবেশগত বা প্রজাতি বহিঃস্থ শর্ত পপুলেশনের ঘনত্ব নিয়ন্ত্রণ করে। যেমন, খাদ্য ও বাসস্থানের অভাব, পরিবেশের প্রতিকূলতার ফলে স্বাভাবিক কারণেই পপুলেশনের বৃদ্ধি বাধা পায়।

(c) **বিপরীত ঘনত্ব সাপেক্ষ শর্ত** (Inverse density dependent factors) : এক্ষেত্রে পপুলেশনের ঘনত্ব বৃদ্ধি পেলে বিভিন্ন স্বয়ং উদ্ভূত বাধাপ্রদানকারী (self limiting) শর্তগুলি কাজ করে এবং প্রতি একক সময়ে পপুলেশনের সভ্যের যোগদান হ্রাস পেতে থাকে।

(d) Allee বর্ণিত বৃদ্ধি শর্ত (Allee growth factors) : বিজ্ঞানী W.C. Allee (1961) নামাঙ্কিত এই শর্তে দেখা গেছে যে পপুলেশনের অন্তর্বর্তী ঘনত্বে কিছু প্রজাতির বর্দ্ধিত হারে প্রজনন ঘটে। দলবদ্ধ পাখীরা (colonial birds) ছোট দলে থাকলে অনেক সময় প্রজননগত সাফল্যতা দেখাতে ব্যর্থ হয়। আবার দলে অতিরিক্ত পাখী থাকলেও প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস পেতে থাকে।

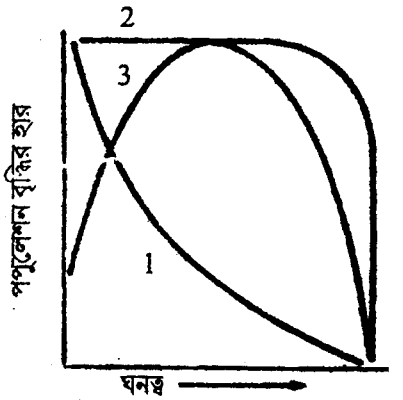

চিত্র নং 4 : পপুলেশন ঘনত্ব সম্পর্কিত তিন ধরনের পপুলেশন বৃদ্ধির হার

1. ঘনত্ব বৃদ্ধিতে পপুলেশনে বৃদ্ধির হার হ্রাস পায় (বিপরীত ঘনত্ব সাপেক্ষ শর্ত), 2. প্রজাতি বহিঃস্থ শর্ত পপুলেশনের বৃদ্ধিতে বাধা দেয় (ঘনত্ব নিরপেক্ষ শর্ত), 3. অন্তর্বর্তী ঘনত্বে পপুলেশন বৃদ্ধি বেশী হয় (Allee বর্ণিত শর্ত)।

4.5 সারাংশ

বর্তমান অংশে আমরা জেনেছি যে, পপুলেশন হল একই প্রজাতির অন্তর্গত জীবগোষ্ঠী যারা একটি নির্দিষ্ট সময়ে ও নির্দিষ্ট এলাকায় বসবাস করে। আবার পপুলেশন হল বিবর্তনের মূল একক। ঘনত্ব, বিসরণ, বয়সভিত্তিক গঠন, জন্মহার ও মৃত্যুহার প্রভৃতি হল পপুলেশনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। একটি আদর্শ পরিবেশে কোন পপুলেশনের সভ্যের গড় আয়ুকালকে শারীরবৃত্তীয় আয়ুকাল বলে। আবার প্রকৃতিতে বসবাসরত কোন পপুলেশনের সভ্যের গড় আয়ুকালকে বাস্তুতান্ত্রিক আয়ুকাল বলে। পপুলেশনের ঘনত্ব বিভিন্ন প্রকার শর্ত দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই শর্তগুলি হল—ঘনত্ব সাপেক্ষ শর্ত, ঘনত্ব নিরপেক্ষ শর্ত, বিপরীত ঘনত্ব সাপেক্ষ শর্ত ইত্যাদি।

4.6 প্রশ্নাবলী

1. পপুলেশনের সংজ্ঞা দাও।
2. নিয়মিত ও বিক্ষিপ্ত পপুলেশন পার্থক্য নিরূপণ কর।
3. জন্মহার বলতে কি বুঝ?
4. উত্তরজীবিতা কাকে বলে?
5. r-নির্বাচন ও k-নির্বাচনের পার্থক্য কি?
6. Allee বর্ণিত বৃদ্ধি শর্ত কি?

4.7 উত্তরমালা

1. এককের 4.2 অংশ দ্রষ্টব্য।
2. এককের 4.3.2 অংশ দ্রষ্টব্য।
3. এককের 4.3.6 অংশ দ্রষ্টব্য।
4. এককের 4.3.6 অংশ দ্রষ্টব্য।
5. এককের 4.3.8 অংশ দ্রষ্টব্য।
6. এককের 4.4 অংশ দ্রষ্টব্য।

একক 5 ❑ পপুলেশনের বৃদ্ধি (Population Growth)

গঠন

5.1 প্রস্তাবনা
উদ্দেশ্য

5.2 বৃদ্ধিরীতির প্রকারভেদ
5.2.1 J-আকৃতির বৃদ্ধিরীতি
5.2.2 S-আকৃতির বৃদ্ধিরীতি

5.3 J-আকৃতির এবং S-আকৃতির বৃদ্ধিরীতির তুলনা

5.4 সারাংশ

5.5 প্রশ্নাবলী

5.6 উত্তরমালা

5.1 প্রস্তাবনা

পপুলেশন মাত্রই গতিময় চরিত্রের হয়। জীবের প্রকৃতি অনুযায়ী পপুলেশন সংখ্যা প্রতি ঘন্টায়, দিনে, ঋতুতে এবং বছরে বছরে পরিবর্তিত হয়। কোনও বিশেষ বছরে কিছু জীব পর্যাপ্ত সংখ্যায় পাওয়া যায়, আবার অন্য বছরে ঐ জীবের সংখ্যা অত্যন্ত কমে যেতে পারে। কোনও বিশেষ স্থানে কোনও পপুলেশন আবির্ভূত হতে পারে, সংখ্যা বৃদ্ধি দ্বারা ছড়িয়ে পড়তে পারে, সংখ্যা হ্রাস হতে পারে অথবা অবলুপ্ত হওয়াও আশ্চর্যের বিষয় নয়। চিন্তাশীল মানুষ প্রজাতির বিভিন্ন ধরনের বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ করে দু'ধরনের বৃদ্ধিরীতি ব্যাখ্যা করেছেন।

উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি—

- পপুলেশনের বৃদ্ধি কিভাবে সংঘটিত হয় জানতে পারবেন।
- বিভিন্ন প্রকার বৃদ্ধিরীতি সম্বন্ধে জানতে পারবেন।
- সিগময়েড কার্ভ সম্বন্ধে জানতে পারবেন।
- পপুলেশন সম্পর্কিত বিভিন্ন লেখচিত্র সম্পর্কে ধারণা পাবেন।

5.2 বৃদ্ধিরীতির প্রকারভেদ

5.2.1 J-আকৃতির বৃদ্ধিরীতি

যখন কোনও পপুলেশনের অন্তর্গত কিছু জীবকে কোনও অনধিকৃত স্থানে ছেড়ে দেওয়া হয় তখন ঐ স্থানে পপুলেশনটি জ্যামিতিক হারে দ্রুত সংখ্যা বৃদ্ধি (geometric growth) করে। এরপর চূড়ান্ত পর্যায়ে পরিবেশজনিত বিভিন্ন বাধার জন্য সংখ্যা বৃদ্ধি হ্রাস পায় এবং অবশেষে সংখ্যার পতন ঘটে। প্রকৃতিতে অত্যধিক পুষ্টি বস্তুর জন্য শৈবালের সংখ্যা বৃদ্ধি (algal bloom), পরীক্ষাগারে কালচার মাধ্যমে প্যারামিসিয়ামের সংখ্যা বৃদ্ধি ইত্যাদি এই বৃদ্ধিরীতি দেখায়। এই ঘটনাটি নিম্নোক্ত সূত্র দ্বারা প্রকাশ করা সম্ভব।

$$\frac{dN}{dt} = rN$$

যেখানে $\frac{dN}{dt}$ নির্দিষ্ট সময়ে পপুলেশন বৃদ্ধির হার নির্দেশক। rN = সংখ্যাবৃদ্ধির অন্তঃস্থ হার × পপুলেশনের আকার। অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে *(t)* পপুলেশনের সংখ্যার পরিবর্তন (N) পপুলেশনের প্রজনন হারের (r) সমান হয়।

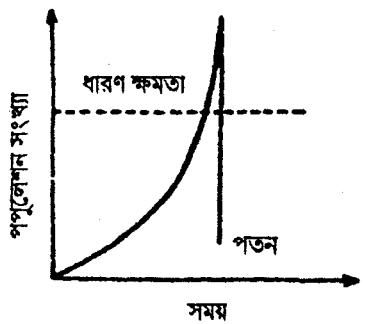

চিত্র নং 1 : J-আকৃতির বৃদ্ধির লেখচিত্র

প্রকৃতিতে অধিকাংশ পপুলেশন এই ধরনের বৃদ্ধি দেখায় না। কারণ তাদের পরিবেশগত শর্তগুলি এই বৃদ্ধিকে প্রতিহত করে। প্রকৃতিতে ধারণ ক্ষমতা (carrying capacity) পর্যন্ত পপুলেশন বৃদ্ধির সর্বোচ্চ সীমা দেখা যায়। এরপর পপুলেশনের সভাসংখ্যা বৃদ্ধি ফিডব্যাক (feedback) পদ্ধতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

প্রাকৃতিক পরিবেশে এই প্রকার এক্সপোনেন্‌শিয়াল বৃদ্ধি (exponential growth) আলাস্কার St. Paul দ্বীপে রেইনডিয়ার (reindeer) হরিণের ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছিল। 1910 সালে এই দ্বীপে 4 টি পুরুষ ও 22টি স্ত্রী রেইনডিয়ার ছাড়া হয়েছিল। মাত্র ত্রিশ বছরের ব্যবধানে রেইনডিয়ারের সংখ্যা বেড়ে 2000 -এ পৌঁছায়।

কিন্তু এরপর রসদের অভাবে এদের সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকে এবং 1950 সাল নাগাদ প্রাণীটির সংখ্যা বিপজ্জনকভাবে কমে যায়।

5.2.2 S-আকৃতির বৃদ্ধিরীতি

এক্সপোনেন্‌শিয়াল বৃদ্ধি জীবীয় কারণে (biologically) বাস্তবিক নয়। কারণ কোনও পপুলেশন অনির্দিষ্টকালীন বৃদ্ধি দেখায় না। পরিবেশও স্থায়ী বৈশিষ্ট্যের হয় না এবং সম্পদ অর্থাৎ খাদ্য ও বাসস্থানের পরিসরও সীমাবদ্ধ। এইজন্য পপুলেশন ঘনত্ব বৃদ্ধি পেলে রোগ, অনাহার, খাদক প্রাণীর চাপ, ক্রমহ্রাসমান প্রজনন ক্ষমতা, বাস্তুত্যাগ ইত্যাদি কারণে পপুলেশনের বৃদ্ধি কমে আসে। যে অবস্থায় পপুলেশন তার পরিবেশের সঙ্গে আন্তঃক্রিয়ার ফলে একটি সর্বোচ্চ সাম্যতায় (equilibrium) পৌঁছায় তাকে ধারণ ক্ষমতা (carrying capacity) বলে। লজিস্টিক সমীকরণে এই অবস্থাকে K অক্ষর দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। গণিত শাস্ত্রবিদ্ Verhulst (1838) প্রথম ব্যক্ত করেন যে পপুলেশনের আকার যত বৃদ্ধি পায় ততই বৃদ্ধি পরিশেষে কমতে থাকে। কোনও পপুলেশন একটি নির্দিষ্ট এলাকায় অবস্থানকালে যদি সেখানে রসদ অপর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে তবে প্রাথমিকভাবে পপুলেশনের ধীরে বৃদ্ধি ঘটে (positive acceleration phase)। কিন্তু এরপর পপুলেশনের অত্যন্ত দ্রুত বৃদ্ধি ঘটে (logarithmic phase) এবং পরে বিভিন্ন পরিবেশগত কারণে বৃদ্ধি কমে আসে (negative acceleration phase)। এই কারণে প্রাকৃতিক পরিবেশে বৃদ্ধিরীতি S-আকৃতির মত দেখায়। পরিবেশের নির্দিষ্ট ধারণক্ষমতা পর্যন্ত পপুলেশন বৃদ্ধি (logistic growth) পেতে থাকে। এরপর পপুলেশনের বৃদ্ধি হার প্রায় শূন্যে পৌঁছায়। কারণ এই সময় পপুলেশনের সভ্যগুলি পর্যাপ্ত সংখ্যায় জড়ো হয় এবং রসদও কমে আসে। অন্তঃপ্রজাতি সংগ্রাম সর্বোচ্চ স্তরে পৌছায়। বিজ্ঞানী Verhaulst (1838) সালে এই ঘটনাকে নিম্নোক্ত সূত্র দ্বারা প্রকাশ করেন যাকে 'logistic equation' বলা হয়।

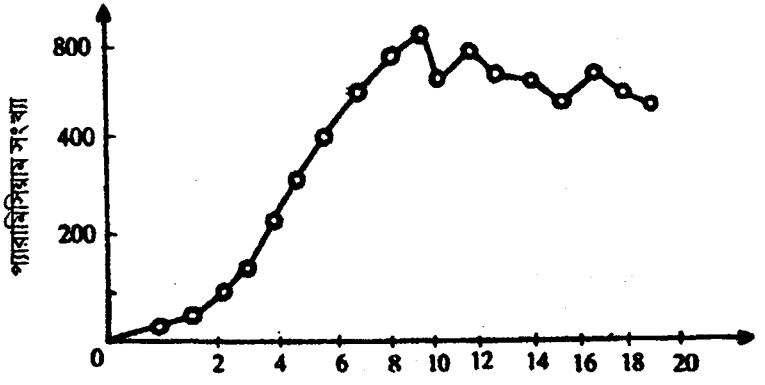

চিত্র নং 2 : পরীক্ষাগারে প্যারামিসিয়ামের সংখ্যা বৃদ্ধির লেখচিত্র

$$\frac{dN}{dt} = rN\left(1-\frac{N}{K}\right)$$

অর্থাৎ t সময়ে পপুলেশনের আকার পরিবর্তনের হার = পপুলেশন বৃদ্ধির অন্তঃস্থ হার × পপুলেশনের আকার × ঘনত্ব-নির্ভর শর্ত।

যখন পপুলেশনের আকার *(N)* ছোট হয় (পপুলেশন বৃদ্ধির প্রথম পর্যায়) তখন $\frac{N}{K}$ অনুপাত ছোট হয়। এর ফলে $1-\frac{N}{K}$ এর মান 1-এর প্রায় কাছাকাছি হয়। পপুলেশন বৃদ্ধি প্রায় rN মানের সমান অর্থাৎ জ্যামিতিক (geometric) হারে ঘটে। বিপরীতভাবে যদি N-এর মান বড় হয় এবং পপুলেশনের আকার $N=K$ হয় তবে $1-\frac{N}{K}$ ক্রমশঃ $1-\frac{K}{K}$ অর্থাৎ শূন্যে পৌঁছায়। এর ফলে পপুলেশনের বৃদ্ধির হার শূন্যে পৌঁছায় অর্থাৎ সাম্যাবস্থা বা অপরিবর্তনীয় (constant) চরিত্র দেখায়।

সিসময়েড বা লজিস্টিক বৃদ্ধিজনিত অনুমিত সত্য (Assumption related to sigmoid or logistic growth) :

1. পপুলেশন ঘনত্ব এবং বৃদ্ধির হারের সম্পর্ক রৈখিক হয়।
2. পপুলেশনের বৃদ্ধির হারের উপর ঘনত্বের প্রভাব অবিলম্বে চিহ্নিত হয়।
3. পরিবেশ (এবং K) অপরিবর্তিত প্রকৃতির হয়ে থাকে।
4. সকল সভ্য সমভাবে প্রজননক্ষম ধরা হয়।
5. পপুলেশনের সভ্যদের মধ্যে অভিবাসন (immigration) বা অন্যত্র গমন (emigration) ঘটে না।

পরীক্ষাগারে প্রতিপালিত ক্ষুদ্র জীবের মধ্যে উপরোক্ত অনুদানগুলি সহজে প্রমাণিত হলেও প্রকৃতিতে অবস্থানরত পপুলেশন (field population) ঐ অনুমানগুলির প্রায়ই ব্যতিক্রম দেখা যায়। কারণ বিভিন্ন প্রজাতির জীবনচক্র জটিল প্রকৃতির হয়ে থাকে। প্রকৃতিতে K-এর মান ঋতুকালীন বা জলবায়ুজনিত পার্থক্য দেখায়। প্রকৃতিতে সব সভ্যদের প্রজনন সমানভাবে ঘটে না। এছাড়া প্রাকৃতিক পরিবেশে জীবের বিস্তারে বহুবিধ প্রতিবন্ধকতা কাজ করে।

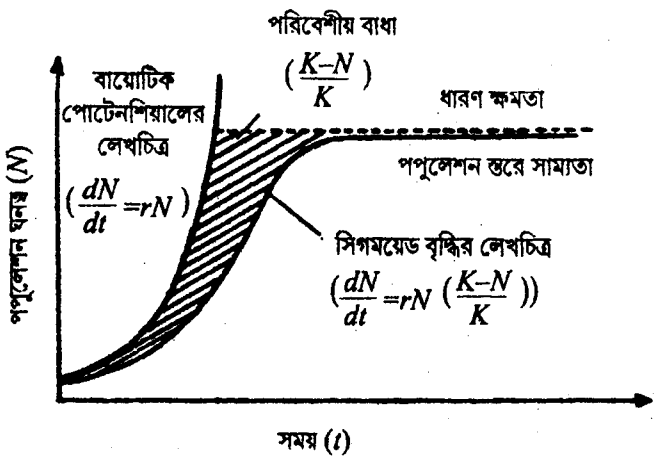

চিত্র নং 3 : পপুলেশনের সিগময়েড বৃদ্ধির লেখচিত্র

5.3 J-আকৃতির এবং S-আকৃতির বৃদ্ধিরীতির তুলনা

J-আকার বা **exponential** বৃদ্ধি	S-আকার বা **sigmoid** বৃদ্ধি
1. এই লেখচিত্র থেকে কোনও পপুলেশনের বিভিন্ন চরিত্র যেমন, অপত্য সংখ্যা উৎপাদন, জীবিত অপত্য সংখ্যা, প্রজনন ক্ষমতার সীমা ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।	1. পপুলেশনের বিভিন্ন চরিত্র সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায় না কারণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং পরিবেশগত বাধা কার্যকর হয়।
2. এই প্রকার বৃদ্ধিতে কিছুটা বংশগতীয় এবং জীবন বৃত্তান্তগত শর্ত প্রভাব বিস্তার করে।	2. বিভিন্ন শর্ত কার্যকর হওয়ার জন্য পপুলেশনে পূর্বোক্ত শর্তগুলির প্রভাব আদৌ বোঝা যায় না।
3. ধারণ ক্ষমতার *(K)* নির্দিষ্ট সীমারেখা নেই।	3. ধারণ-ক্ষমতা *(K)* পর্যন্ত পপুলেশনের বৃদ্ধি ঘটে।
4. বৃদ্ধি 'ঘনত্ব অ-নির্ভর' হয়।	4. বৃদ্ধি 'ঘনত্ব-নির্ভর' হয়।
5. পপুলেশন ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়।	5. পপুলেশন প্রাথমিকভাবে ধীর গতিতে, পরে দ্রুত গতিতে এবং ধারণ ক্ষমতায় পৌঁছানোর পর বৃদ্ধি হার কমে আসে।

5.4 সারাংশ

একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোন একক আয়তনের একটি নির্দিষ্ট প্রজাতির সংখ্যাকে পপুলেশন বলে। এই পপুলেশনের বৃদ্ধি সর্বদাই একটি নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলে। কিন্তু এই বৃদ্ধি কখনই ধারণ ক্ষমতা (carrying capacity) অতিক্রম করে না। বর্তমান নিবন্ধে আপনারা জেনেছেন দুই ধরনের বৃদ্ধিরীতি পপুলেশনে পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এর নিজস্ব তাৎপর্য বর্তমান। এছাড়াও সিগময়েড কার্ভ-জনিত অনুমিত সত্য সম্পর্কেও আপনারা ধারণা লাভ করেছেন।

5.5 প্রশ্নাবলী

a. J-আকৃতির বৃদ্ধিরীতি কি?

b. সিগময়েড কার্ভ কি?

c. লগারিদমিক দশা বলতে কি বোঝায়?

d. পপুলেশনের সিগময়েড বৃদ্ধির লেখচিত্র অঙ্কন করুন।

5.6 উত্তরমালা

a. নিবন্ধের 5.2.1 অংশ দ্রষ্টব্য।

b. নিবন্ধের 5.2.2 অংশ দ্রষ্টব্য।

c. নিবন্ধের 5.2.2 অংশ দ্রষ্টব্য।

d. চিত্র 3 দ্রষ্টব্য।

একক 6 ❑ কম্যুনিটি ইকোলজি (Community Ecology)

গঠন

6.1 প্রস্তাবনা

উদ্দেশ্য

6.2 কম্যুনিটি ইকোলজির মুখবন্ধ

6.3 কম্যুনিটির ধারণা ও সংজ্ঞা

6.3.1 ধারণা

6.3.2 সংজ্ঞা

6.3.3 জীবগোষ্ঠীর প্রকারভেদ

6.4 কম্যুনিটির গঠন

6.4.1 প্রজাতি প্রাচুর্য

6.4.2 প্রজাতির আনুপাতিক প্রাচুর্য

6.4.3 খাদ্যস্তর

6.4.4 জীবগোষ্ঠীর স্থায়িত্ব

6.4.5 আবহাওয়ার পরিবর্তন

6.4.6 ইকোটোন ও প্রান্তীয় প্রভাব

6.4.7 বাস্তুবিদ্যার সূচক

6.4.8 স্তরীভবন

6.5 কম্যুনিটির আন্তঃক্রিয়া

6.5.1 সীমিত সম্পদের জন্য প্রতিযোগিতা

6.5.2 নিশ্

6.5.3 প্রজাতির নিজস্ব নিশ্

6.5.4 কম্যুনিটিতে একই নিশে একাধিক প্রজাতি থাকতে পারে না।

6.5.5 প্রতিযোগিতামূলক নিশ্ অপসারণ ও কম্যুনিটির প্রজাতি বৈচিত্র্য

6.5.6 সীমিত সম্পদ বিভাজন

6.6 ইকোলজিক্যাল ক্রমপরিবর্তন

6.7 চিত্রাবলী

6.8 সারাংশ

6.9 প্রশ্নাবলী

6.10 উত্তরমালা

6.1 প্রস্তাবনা

ইকোলজিস্টরা জীবের সাথে প্রকৃতির পারস্পরিক সম্পর্ক বিভিন্ন স্তরে এবং বিভিন্ন আঙ্গিকে অধ্যয়ন করেন। যেমন, একক জীবের দেহ সংগঠন কিভাবে তার প্রাকৃতিক বাসভূমির পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজনকে পরিস্ফুট করে তা বোঝবার জন্য ইকোলজিস্টরা কোন বিশেষ প্রজাতির একক জীবদের অধ্যয়ন করেন। আবার, একই প্রজাতির অন্তর্গত জীবেরা যারা একটি নির্দিষ্ট স্থানে একই সময়ে বসবাস করছে, তারা কিভাবে নিজেদের প্রজাতি চরিত্র অনুযায়ী ও পরিবেশের প্রভাবে সংখ্যায় বৃদ্ধি বা হ্রাস পায় বা স্থিতিশীল থাকে, পপুলেশন স্তরের অধ্যয়নে ইকোলজিস্টদের সেটা লক্ষ্য থাকে। এর পরবর্তী অধ্যয়নের স্তর হলো কম্যুনিটি ইকোলজি, যেখানে, ইকোলজিস্ট একই জায়গায় বসবাসরত একাধিক প্রজাতির পপুলেশনদের মধ্যে কি ধরনের আন্তঃক্রিয়া ঘটে এবং তার ফলে ঐ প্রজাতিদের পপুলেশানে কি ধরনের তুলনামূলক পরিবর্তন ঘটে ইত্যাদি জানতে চান।

উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি—

- জীবগোষ্ঠীর একটি প্রকৃত সংজ্ঞা দিতে পারবেন।
- জীবগোষ্ঠীর প্রকারভেদ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- প্রধান জীবগোষ্ঠী এবং অপ্রধান জীবগোষ্ঠীর মধ্যে তুলনা করতে পারবেন।
- জীবগোষ্ঠীর গঠন সম্পর্কে ধারণা দিতে পারবেন।
- বাস্তুবিদ্যার নিশ্ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- বাস্তুবিদ্যার নিশের কি কি বৈশিষ্ট্য হতে পারে তার ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।
- নিশের প্রকারভেদ সম্পর্কে একটা ধারণা দিতে পারবেন।
- বাস্তুতান্ত্রিক পর্যায় সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

6.2 কম্যুনিটি ইকোলজির মুখবন্ধ

প্রকৃতিতে প্রায় কখনই, কোন জায়গায় একটিমাত্র জীব থাকে না। একাধিক প্রজাতির জীব একই জায়গার থাকার ফলে তাদের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বা আন্তঃক্রিয়া (Intersections) ঘটে এবং

বিভিন্ন ধরনের পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। শিকার ও শিকারী প্রজাতিদের মধ্যে আতঃক্রিয়া, একই সম্পদের জন্য সহবাসী জীবদের মধ্যে প্রতিযোগিতা, পরজীবী ও পোষণদের সম্পর্ক, ভিন্ন প্রজাতির জীবদের মধ্যে প্রতিযোগিতা, ভিন্ন প্রজাতির জীবদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা—এই ধরনের পারস্পরিক আন্তঃক্রিয়া একই জায়গায় বসবাসকারী জীবদের একাধিক প্রজাতির মধ্যে ঘটতে পারে। কম্যুনিটি ইকোলজিতে এই ধরনের পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত প্রজাতিগোষ্ঠীকে অধ্যয়ন করা হয়। পারস্পরিক আন্তঃক্রিয়ার সম্পর্কযুক্ত সহবাসী অর্থাৎ কোন একটি নির্দিষ্ট স্থানে প্রাকৃতিকভাবে বসবাসকারী প্রজাতিগোষ্ঠীকে বা প্রজাতিদের সমষ্টিকে একটি ইকোলজিক্যাল কম্যুনিটি বা শুধু কম্যুনিটি (Community) বা জীবগোষ্ঠী বলে। একটি কম্যুনিটির প্রজাতি বৈচিত্র্য (Species richness) অর্থাৎ, (abundance) এবং ঐ প্রজাতিগুলির মধ্যে যেসব আন্তঃক্রিয়াজাত গমন (Pattern) দেখা যায় ইত্যাদি কম্যুনিটি ইকোলজি অধ্যয়নের বিষয়বস্তু।

জীবগোষ্ঠী বাস্তুবিদ্যার একটি অতি জটিল সংগঠন। অণুজীব সম্প্রদায় (Microbial community), উদ্ভিদ সম্প্রদায় (Plant community) এবং প্রাণী সম্প্রদায় (Animal community) একই বসতি স্থানে বাস করে এই জটিল জীবগোষ্ঠী গঠন করে। এই জীবগোষ্ঠীর একক অনেক বড় হতে পারে, যেমন, বিরাট অঞ্চল জুড়ে চিরহরিৎ গাছের বন, আবার খুব ছোট হতে পারে, যেমন, পচিত (Decomposed) কাঠের গুঁড়িতে অমেরুদন্ডী প্রাণী ও ছত্রাকের সম্প্রদায়। সাধারণতঃ বিভিন্ন বসতি স্থানের (Habitat) এবং বিভিন্ন পরিবেশের জীবগোষ্ঠী বিভিন্ন প্রকার হয়।

6.3 কম্যুনিটির ধারণা ও সংজ্ঞা

6.3.1 ধাবণা

বিভিন্ন ইকোলজিক্যাল চিন্তাধারার ধারকরা (School of thoughts) বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে কম্যুনিটিকে চিহ্নিত করায় কম্যুনিটি-সংক্রান্ত ধারণাগুলি অনেক সময়-ই পারস্পরিকভাবে সংঘাতমূলক ও অপরিচ্ছন্ন হয়ে দাঁড়ায়।

কম্যুনিটি ইকোলজি শুরু হয় ঐতিহাসিকভাবে উদ্ভিদ ইকোলজির অধ্যয়ন থেকে। এই অধ্যয়নের উদ্দেশ্য ছিলো— 'কোন একটি জায়গায় যে সমস্ত প্রজাতির উদ্ভিদ একসাথে পাওয়া যায় তা কোন্ নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়'—এই প্রশ্নটির উত্তর খোঁজা। প্রাথমিকভাবে, যে মতটি সবথেকে বেশী গুরুত্ব পেয়েছিলো, সেটি আমেরিকান উদ্ভিদ বিজ্ঞানী এফ্. ই. ক্লিমেন্টস্-এর (1916, 1936)। এঁর মত অনুসারে, কোন একটি নির্দিষ্ট উদ্ভিদ কম্যুনিটি কতকগুলি সুনির্দিষ্ট উদ্ভিদ প্রজাতিদের পারস্পরিক নির্ভরশীলতার উপর ভিত্তি করে সংগতি হয়, যাতে প্রতিটি প্রজাতির ভূমিকা অপরিহার্য। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যদি দেখা যায় একটি কম্যুনিটি ক, খ, গ ও ঘ প্রজাতির উদ্ভিদদের নিয়ে সংগঠিত, তবে ঐ একই কম্যুনিটি ক, খ, গ ও ঙ প্রজাতির উদ্ভিদদের নিয়ে সংগঠিত হতে পারে না। ক্লিমেন্টস্-এর ধারণা অনুসারে প্রতিটি কম্যুনিটির একটি সুনির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমা থাকে। এই ধারণা অনুযায়ী, প্রতিটি কম্যুনিটির সদস্য প্রজাতিরা আতঃক্রিয়াজাত পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে এত সুসংবদ্ধ ও পারস্পরিকভাবে নির্ভরশীল

যে তাদের একটি একক পূর্ণাঙ্গ জীবের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। অর্থাৎ, একটি কম্যুনিটি যেন একটি অতিজীব (Superorganism)।

ক্লিমেন্টস্ ও তাঁর অনুগামীদের কম্যুনিটি-সংক্রান্ত মতবাদের বিরুদ্ধ মতবাদ পোষণ করতেন ব্রিটিশ উদ্ভিদবিদ্ এইচ্. এ. গ্লিসান (1926, 1939) ও তাঁর অনুসারীরা। তাদের মতানুসারে, যে কোন জায়গার উদ্ভিদ প্রজাতির সমষ্টিগত উপস্থিতি নির্ভর করে অনেকটাই, ঐ জায়গার পরিবেশগত চরিত্রগুলির সাথে নির্দিষ্ট প্রজাতির উদ্ভিদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষমতার উপর এবং বাকীটা অনির্দিষ্ট সম্ভাবনার (Random chance events) ঘটনার উপর।

বর্তমানে, ক্লিমেন্টস্-এর 'অতিজীব সদৃশ' কম্যুনিটির ধারণাটি প্রায় পুরোপুরি বর্জন করা হয়েছে এবং আধুনিক কম্যুনিটি-সংক্রান্ত ধারণাগুলি অনেকাংশেই গ্লিসান-এর মতানুসারী।

আধুনিক কম্যুনিটি ইকোলজিতে (যেমন, বেগন *et al.*, 2000; রিক্লেফ ও মিলার, 2000 ; ক্রেবস্, 2002 প্রমুখের লেখা ইকোলজির পাঠ্যপুস্তকগুলিতে) একটি ইকোলজিক্যাল কম্যুনিটিকে চিহ্নিত করার জন্য তার কোন সুনির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমা নির্ধারণ আবশ্যিক বলে মনে করা হয় না। প্রাকৃতিকভাবে, আন্তঃপ্রজাতি ক্রিয়া ঘটে এরকম যে কোন প্রজাতির সমষ্টিকেই কম্যুনিটি বলে চিহ্নিত করা যায়। এক্ষেত্রে, একইস্থানে বসবাসকারী কোন্ প্রজাতিসমষ্টিকে কম্যুনিটি হিসাবে চিহ্নিত করা হবে তা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে যিনি কম্যুনিটিটি অধ্যয়ন করবেন তাঁর বৈজ্ঞানিক উদ্দেশ্যের উপর। যেমন, একটি জঙ্গলের জীবগোষ্ঠীর মধ্যে থেকে একজন কম্যুনিটি ইকোলজিস্ট নিম্নলিখিতভাবে একটি কম্যুনিটিকে চিহ্নিত করতে পারেন।

- সকল রুমিন্যানশিয়া (Ruminantia) ফ্যামিলিভুক্ত স্তন্যপায়ীদের কম্যুনিটি। এক্ষেত্রে কম্যুনিটি ইকোলজিস্টের বৈজ্ঞানিক উদ্দেশ্য হলো, একই ইকোলজিক্যাল পরিস্থিতিতে বিবর্তনের মাধ্যমে নিকট সম্পর্কযুক্ত স্তন্যপায়ীদের মধ্যে কি ধরনের আন্তঃপ্রজাতি ক্রিয়া ঘটে তা জানা। এই ধরনের একই ট্যাক্সোনমিক গোষ্ঠীভুক্ত প্রজাতিদের কম্যুনিটিকে আসেমব্লেজ (Assemblge) বলা হয়।
- তৃণভোজী প্রাণীদের কম্যুনিটি ঃ এক্ষেত্রে ইকোলজিস্ট-এর উদ্দেশ্য হলো ঐ জঙ্গলে তৃণজাতীয় একই ধরনের খাদ্যসম্পদের উপর নির্ভরশীল স্তন্যপায়ী প্রাণিদের মধ্যে আন্তঃপ্রজাতি প্রতিযোগিতা ও অন্যান্য ধরনের আন্তঃপ্রজাতি ক্রিয়া ঘটে, ঐ প্রজাতিগুলির কি ধরনের তুলনামূলক জনসংখ্যা (Relative abundance) দ্বারা কম্যুনিটিটি সংগঠিত এবং এই সংগঠনের ধরনের (Pattern) সাথে উপরোক্ত আন্তঃপ্র জাতি ক্রিয়াগুলির কি সম্পর্ক ইত্যাদি। এক্ষেত্রে, তৃণভোজী প্রাণিদের কম্যুনিটিতে রুমিন্যান্ট প্রজাতিগুলি ছাড়াও হাতী, গন্ডার, খরগোশের মতো অন্যান্য তৃণভোজী স্তন্যপায়ী প্রজাতিরা সদস্য হিসাবে গণ্য হতে পারে।
- মাংসাশী বৃহদাকার স্তন্যপায়ীদের কম্যুনিটি ঃ এক্ষেত্রে জঙ্গলের বৃহদাকার শিকারী প্রাণী প্রজাতি, যেমন—চিতা, চিতাবাঘ, ভাল্লুক, এমনকি কুমীর, একটি একই কম্যুনিটির সদস্য বলে গণ্য করা হবে।

উপরোক্ত প্রতিটি ক্ষেত্রেই চিহ্নিত কম্যুনিটিগুলি বৈজ্ঞানিকভাবে গ্রহণযোগ্য যেহেতু, সেগুলির প্রত্যেকটি প্রাকৃতিক প্রজাতিগোষ্ঠী এবং প্রজাতিগুলির মধ্যে প্রাকৃতিকভাবে ঘটা আন্তঃক্রিয়াই বৈজ্ঞানিক অধ্যয়নের উদ্দেশ্য।

6.3.2 সংজ্ঞা

পারস্পরিক আন্তঃক্রিয়ার সম্পর্কযুক্ত যে কোন প্রাকৃতিক প্রজাতিসমষ্টিকে একটি কম্যুনিটি বা ইকোলজিক্যাল কম্যুনিটি বলা যেতে পারে।

মন্তব্য ঃ

(ক) যেহেতু পারস্পরিক আন্তঃক্রিয়ার সম্পর্ক থাকতে হলে যে কোন প্রাকৃতিক প্রজাতিসমষ্টিকে একই স্থানে, একই সময়ে বসবাস করতে হবে সেহেতু কম্যুনিটির সংজ্ঞায় 'একই স্থান' ও 'একই সময়' মাত্রা দুটির ব্যবহার অপ্রয়োজনীয়।

(খ) অনেকক্ষেত্রে, কম্যুনিটি বা ইকোলজিক্যাল কম্যুনিটিকে বায়োটিক কম্যুনিটিও বলা হয়।

6.3.3. জীবগোষ্ঠীর প্রকারভেদ

বাস্তুবিদ কেনডাই (1974) জীবগোষ্ঠী বা জীব সম্প্রদায়কে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। যেমন— (i) প্রধান জীবগোষ্ঠী (Major Community), (ii) লঘু জীবগোষ্ঠী (Minor community)।

এবার আমরা এই দুই জীবগোষ্ঠীর পার্থক্য জানব ঃ

(i) প্রধান জীবগোষ্ঠী— যে সকল জীবগোষ্ঠী তাদের বাসস্থানসহ অপরিহার্য সৌরশক্তি দ্বারা এক স্বনিয়ন্ত্রিত একক বা বাস্তুতন্ত্র গঠন করে তাদের প্রধান জীবগোষ্ঠী বা Major community বলে।

(ii) লঘু জীবগোষ্ঠী—এদের সোসাইটিও বলে। এরা প্রধান জীবগোষ্ঠীর সঙ্গে গৌণ জীবগোষ্ঠী গঠন করে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখে এবং শক্তি প্রবাহের দিক থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন নয়, ফলে প্রধান জীবগোষ্ঠীর ওপর নির্ভরশীল।

6.4 কম্যুনিটির গঠন

বিজ্ঞানী ক্লাকহাম জুনিয়র (1973)-এর মতে প্রতিটি জীবগোষ্ঠী বাস্তুতন্ত্রের একটি গতিময় উপাদান এবং এর অন্তর্ভুক্ত সকল পপুলেশন সর্বদাই নিজেদের মধ্যে বিক্রিয়া করে এবং এই বিক্রিয়াগুলি সময় এবং কালের সঙ্গে পরিবর্তিত হয়। পপুলেশনের এই কাজ সব সময় পরিবেশের জটিল শর্তগুলি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কাজের এই জটিল বৈশিষ্ট্যগুলিকে জীবগোষ্ঠীর গঠন বলে। কোন একটি কম্যুনিটির সংগঠন বলতে ঐ কম্যুনিটির প্রজাতি বৈশিষ্ট্য (Species diversity) -সংক্রান্ত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে বোঝানো হয়। এই গঠনে প্রতিটি প্রজাতির বাসস্থান, প্রকার, সংখ্যা ও তাদের মধ্যে বিক্রিয়া এবং শক্তির প্রবাহে প্রতিফলন ঘটে।

6.4.1 প্রজাতি প্রাচুর্য (Species Richness)

কোন কম্যুনিটি যে কটি সদস্য প্রজাতি নিয়ে সংগঠিত সেই সংখ্যাকে ঐ কম্যুনিটির প্রজাতি প্রাচুর্য বলে। সাধারণতঃ S অক্ষরটির দ্বারা ঐ চরিত্রকে সংকেত কগরা হয়। অর্থাৎ, যদি কোন কম্যুনিটি S=12 হয়, এর অর্থ ঐ কম্যুনিটিতে 12টি প্রজাতি আছে। অন্য একটি কম্যুনিটির S=7 হলে বোঝা যাবে, দ্বিতীয় কম্যুনিটির প্রজাতি প্রাচুর্য কম।

6.4.2 প্রজাতির আনুপাতিক প্রাচুর্য (Relative Abundance of Species)

কম্যুনিটির প্রজাতি প্রাচুর্য জানা থাকলেই কম্যুনিটিটির সামগ্রিক সাংগঠনিক চরিত্র প্রকাশিত হয় না এবং দুটি কম্যুনিটির সংগঠন চরিত্রকে তুলনা করা যায় না। যেমন, দুটি ভিন্ন কম্যুনিটির প্রজাতি প্রাচুর্য যদি 5 হয়, অর্থাৎ, দুটি কম্যুনিটিই যদি পাঁচটি সদস্য প্রজাতি দ্বারা সংগঠিত হয়, কিন্তু তাদের সদস্য প্রজাতিদের আনুপাতিক প্রাচুর্য (Relative abundance) যদি নিম্নরূপ হয় :

	আনুপাতিক প্রাচুর্য	
প্রজাতিটির নাম	1নং কম্যুনিটি	2নং কম্যুনিটি
ক	30%	20%
খ	0 (অর্থাৎ, নেই)	25%
গ	2%	0 (অর্থাৎ, নেই)
ঘ	8%	35%
ঙ	0 (অর্থাৎ, নেই)	20%
চ	60%	0 (অর্থাৎ, নেই)

স্পষ্টতই, উপরোক্ত কম্যুনিটি দুটির সংগঠনগত চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলির অনেকগুলি দিক শুধুমাত্র S সংকেত দ্বারা পরিস্ফুট হয় না। তার জন্য নিম্নলিখিত পরিমিতি (Parameter)-র বর্ণনা দরকার হয়।

সাম্যতা (Evenness) ও প্রকটতা (Dominance) : কম্যুনিটির সদস্য প্রজাতিগুলির আনুপাতিক প্রাচুর্যে কতটা সাম্যতা বা অসাম্যতা আছে তার উপর কম্যুনিটি সংগঠনের প্রজাতি বৈচিত্র্য নির্ভর করে। সাম্যতা বেশী হলে অর্থাৎ প্রজাতিগুলির আনুপাতিক প্রাচুর্য কাছাকাছি হলে, কম্যুনিটির প্রজাতি বৈচিত্র্য বেশী। এবং সেক্ষেত্রে, কম্যুনিটিতে আনুপাতিক প্রাচুর্যের বৈষম্যর প্রকটতা কম। উপরোক্ত উদাহরণমূলক কম্যুনিটি দুটির মধ্যে 1নং কম্যুনিটিতে প্রকটতা বেশী ও সাম্যতা কম (এক্ষেত্রে, 2নং কম্যুনিটির তুলনায়)। অতএব, প্রজাতি প্রাচুর্য বা S-এর মান এক হওয়া সত্ত্বেও 2নং কম্যুনিটিটির প্রজাতি বৈচিত্র্য বেশী বলে ধরা যাবে।

দুটি পদ্ধতিতে কম্যুনিটি সংগঠনের বর্ণনা করা যায় যাতে প্রজাতি প্রাচুর্য ও আনুপাতিক প্রাচুর্য দুটি আঙ্গিক-ই অন্তর্গত থাকে। এরা হলো—

(ক) প্রজাতি বৈচিত্র্যের সংখ্যারূপ সূচক (Species Diversity Index) : এই সূচকগুলি প্রজাতি বৈচিত্র্যের মান ও আনুপাতিক প্রাচুর্যের মানগুলির ভিত্তিতে একটি সূচক মান গণনা করে। ঐ সূচক মানটি দুটি কম্যুনিটির প্রজাতি বৈচিত্র্যের তুলনায় ব্যবহৃত হয়। অনেক ধরনের প্রজাতি বৈচিত্র্যের সূচক ইকোলজিস্টরা ব্যবহার করেন। এর মধ্য থেকে দুটি বহুল ব্যবহৃত সূচক-কে নীচে বর্ণনা করা হলো :

শ্যানন-উইনার (Shanon-Wiener) সূচক : তথ্য বিজ্ঞানের (Information science) উৎস হিসাবে ব্যবহৃত এই সূচকটি কম্যুনিটি ইকোলজিতে বহুলভাবে এখন ব্যবহার করা হয়। সূচকটি হলো—

$$H = -\sum_{i=1}^{S} p_i \times \ln(p_i)$$

p_i = i-তম প্রজাতিটির আনুপাতিক প্রাচুর্য

ln = প্রাকৃতিক log বা $\log_e$

কম্যুনিটিটিতে S সংখ্যক প্রজাতি থাকায় $i=1$ to S, অর্থাৎ S সংখ্যক p_i গণনা করতে হবে। যেহেতু, কোন ভগ্নাংশের log-এর মান ঋণাত্মক (–) হয় (p_i-এর মান ভগ্নাংশে প্রকাশিত হবে) তাই সবকটি $p_i \times \ln(p_i)$-এর যোগফলও একটি ঋণাত্মক সংখ্যা হবে। এক্ষেত্রে, ঋণাত্মক বা ধনাত্মক নির্দেশ সূচকটির ক্ষেত্রে কোন বিশেষ তাৎপর্য বহন করে না বলে সুবিধার জন্য ঐ যোগফলটিকে (– 1) দ্বারা গুণ করা হয়। অতএব, শ্যানন-উইনার সূচকের মান একটি ধনাত্মক সংখ্যা হিসাবে প্রকাশিত হয়। পূর্বে আলোচিত কম্যুনিটি দুটির প্রজাতি বৈচিত্র্য তুলনায় এই সূচককে কিভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে উদাহরণ হিসাবে তা নিচে দেখানো হলো—

	1নং কম্যুনিটি			2নং কম্যুনিটি		
প্রজাতি নং	p_i	$\ln(p_i)$	$p_i \times \ln(p_i)$	p_i	$\ln(p_i)$	$p_i \times \ln(p_i)$
ক	0·3	–1·204	–0·3612	0·2	–1·609	–0·3218
খ	নেই	—	—	0·25	–1·386	–0·0625
গ	0·02	–3·912	–0·0078	নেই	—	—
ঘ	0·08	–2·525	–0·202	0·35	–1·049	–0·3671
ঙ	নেই	—	—	0·2	–1·609	–0·3218
চ	0·6	–0·5108	0·3064	নেই	—	—

$H = -\Sigma\, p_i \times \ln(p_i) = 0{\cdot}8774$ $\quad$ $H = -\Sigma\, p_i \times \ln(p_i) = 1{\cdot}0724$

অর্থাৎ, 2নং কম্যুনিটির শ্যানন-উইনার সূচকের মান 1নং কম্যুনিটির থেকে বেশী, অতএব, 2নং কম্যুনিটিটির প্রজাতি বৈচিত্র বেশী বলে গণ্য করা যায়। শ্যানন-উইনার সূচকটি প্রজাতি বৈচিত্র্য পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত সবথেকে বেশী পরিচিত সূচক হলেও অন্য বেশ কয়েকটি সূচকও প্রজাতি বৈচিত্র্য পরিমাপের জন্য বহুলব্যবহৃত। যথা—

- সিম্প্সন-এর সূচক $D = \dfrac{1}{\sum_{i=1}^{S} (p_i)^2}$, যেখানে, মোট S সংখ্যক প্রজাতির ith প্রজাতিটির আনুপাতিক প্রাচুর্য হলো p_i

- প্রজাতি সাম্যতার সূচক (Equatability or Evenness Index) : সিম্প্সন-এর সূচক বা শ্যানন উইনার-এর সূচক থেকে এই সূচক পাওয়া যায়।

  সিম্প্সন-এর প্রজাতি সাম্যতার সূচক $E = \dfrac{1}{\sum_{i}^{S} (p_i)^2} \times \dfrac{1}{S}$

  শ্যানন-উইনার-এর প্রজাতি সাম্যতার সূচক $J = \dfrac{-\sum^{S} P_i \ln(p_i)}{\ln(S)}$

(খ) কম্যুনিটির প্রজাতি প্রাচুর্যের লেখচিত্র (Graph) : এই পদ্ধতিতে x-অক্ষে কম্যুনিটির প্রতিটি প্রজাতিকে (ক, খ, গ ইত্যাদি) তাদের প্রাচুর্যের অনুপাতের স্থান অনুসারে ক্রমবর্ধমান অথবা ক্রমহ্রাসমান পর্যায়ে সাজানো হয়। y-অক্ষে ঐ প্রতিটি প্রজাতি আনুপাতিক প্রাচুর্যের স্কেলটি থাকে। প্রতিটি প্রজাতির x- অক্ষের অবস্থান অনুযায়ী প্রাচুর্যের মান লেখচিত্রে বসালে কম্যুনিটিটির প্রজাতি প্রাচুর্যের একটি চিত্ররূপ পাওয়া যায় যা অন্য একটি কম্যুনিটির সমভাবে অঙ্কিত চিত্ররূপের সাথে তুলনীয় (চিত্র নং 1)।

6.4.3 খাদ্যস্তর

একটি জীবগোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্ন পপুলেশনের মধ্যে খাদ্য ও খাদক সম্পর্কের মাধ্যমে যে শক্তির প্রবাহ ঘটে তাকে খাদ্যস্তর বলে। একটি জীবগোষ্ঠীর সকল সবুজ উদ্ভিদ হচ্ছে স্বভোজী, এই স্বভোজীদের যারা ভক্ষণ করে, যেমন, হরিণ ইত্যাদি হচ্ছে শাকাশী আবার এই শাকাশীদের যারা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে যেমন, বাঘ, সিংহ ইত্যাদি হচ্ছে মাংসাশী। সুতরাং এখান থেকে দেখা যাচ্ছে যে একটি বড় জীবগোষ্ঠীতে বিভিন্নভাবে খাদ্যজাল তৈরী হয়। বিভিন্ন খাদ্যজালের মাধ্যমে শক্তি প্রবাহিত হয় বলেই জীবগোষ্ঠীর স্থিতাবস্থা বজায় থাকে।

6.4.4 জীবগোষ্ঠীর স্থায়িত্ব

জীবগোষ্ঠী স্থায়িত্ব নির্ভর করে পপুলেশনের আকারের ওপর এবং পপুলেশনের পরিবর্তনশীলতার ওপর।

6.4.5 আবহাওয়ার পরিবর্তন

জীবগোষ্ঠীর আকার কিন্তু আবহাওয়া দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। যেমন, মরুভূমিতে এক বিশেষ ধরনের জীবগোষ্ঠী দেখা যায় যারা ঐ ধরনের অধিক তাপ, জলশূন্যতা ইত্যাদির সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছে। আবার ঠাণ্ডা অঞ্চলে এক বিশেষ ধরনের জীবগোষ্ঠীকে দেখা যায়, সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আবহাওয়া বা ভৌত পরিবেশ জীবগোষ্ঠীর আকারকে অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করে।

6.4.6 ইকোটোন ও প্রান্তীয় প্রভাব

দুটি বা অধিক জীবগোষ্ঠীর মধ্যবর্তী অঞ্চলকে আমরা ইকোটোন বলব। যেমন, একটি তৃণভূমি ও একটি বনাঞ্চল-এর সংযোগকারী অঞ্চল। অনেক সময় দেখা যায় যে একটি প্রাণী বা উদ্ভিদের পপুলেশন এই ইকোটোন অঞ্চলে বেশী এবং এরা মুখ্য জীবগোষ্ঠীর অন্তর্গত নাও হতে পারে, এই ব্যাপারটিকেই প্রান্তীয় প্রভাব বলে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে কিছু প্রজাতির পেঁচা, যারা ইকোটোন বা ইকোটোনের কাছাকাছি অঞ্চলে বাস করে, এরা বসবাস করছে বনভূমির কাছে আবার খাবারের জন্য তৃণভূমিতে আসছে।

6.4.7 বাস্তুবিদ্যার সূচক

কিছু কিছু ক্ষেত্রে বসতিস্থানের জীব দেখে ঐ অঞ্চলের ভৌত পরিবেশ কি প্রকার তা বলা যায়। দেখা গেছে কিছু কিছু আণুবীক্ষণিক জীব, উদ্ভিদ এবং পাণীর ভৌত পরিবেশের শর্তের আপেক্ষিকতা আছে যার জন্য তাদের বিস্তার সীমিত, এই ধরনের জীবকূলকে বাস্তুবিদ্যার সূচক হিসাবে ব্যবহার করা যায়। যেমন, কায়রোলোমাস লার্ভা জল দূষণের সূচক।

6.4.8 স্তরীভবন

বিজ্ঞানী হুইটটাকার (1970)-এর মতে গঠনগতভাবে জীবগোষ্ঠীর তিন প্রকার স্তরবিন্যাস দেখা যায়।

(i) শীর্ষক স্তরবিন্যাস (Vertical stratification)— অধিকাংশ জীবগোষ্ঠীতে এই ধরনের স্তরবিন্যাস দেখা যায়। এই বিন্যাস ভূমির ওপর থেকে বিশেষ উচ্চতা অবধি আবার জলতল হতে জলের গভীরতা পর্যন্তও লক্ষ্য করা যায়। এক একটি স্তরে বিভিন্ন প্রজাতি বাস করে। একটি জঙ্গলে এই স্তরবিন্যাস খুব ভালোভাবে দেখা যায়।

(ii) আনুভূমিক স্তরবিন্যাস (Horizontal stratification)— উদ্ভিদের ক্ষেত্রে স্থানে স্থানে যেখানে আলোকশক্তি পৌঁছায়, সেখানে এই প্রকার স্তর দেখা যায়।

(iii) সময়গত স্তরবিন্যাস (Temporal stratification)— যেহেতু পরিবেশের অজৈব উপাদানগুলি যেমন, আলো, তাপমাত্রা প্রভৃতি বাৎসরিক বা দৈনিক চক্রাকারে পরিবর্তিত হয় তেমন জীবগোষ্ঠীও ঐ ছন্দে তাদের জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। এই ধরনের ছান্দিক জলজ বাস্তুতন্ত্রে (Plankton) খুব ভালোভাবে দেখা যায়। দিনের বা সপ্তাহের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন প্রজাতির সাক্ষাৎ মেলে, এই চক্রাকার পরিবর্তনকেই ছান্দিক পর্যাবৃত্তি বা Periodicity বলে।

6.5 কম্যুনিটির আন্তঃক্রিয়া (Intersections in a Community)

একটি কম্যুনিটিতে একাধিক প্রজাতিদের মধ্যে আন্তঃক্রিয়া যে যে বিষয়ের উপর নির্ভর করে হতে পারে, তাদের মধ্যে সীমিত সম্পদের জন্য প্রতিযোগিতা প্রধানতম বলে গণ্য করা হয়। অন্যান্য বিষয়গুলি হলো—শিকার ও শিকারীর মধ্যে আন্তঃক্রিয়া, পোষক ও পরজীবীর মধ্যে আন্তঃক্রিয়া এবং পারস্পরিক সহযোগিতামূলক আন্তঃক্রিয়া।

6.5.1 সীমিত সম্পদের জন্য প্রতিযোগিতা

এই ধরনের আন্তঃক্রিয়ার মূলভিত্তি হলো সীমিত সম্পদ (Limiting resource)। কম্যুনিটি ইকোলজিতে সীমিত সম্পদ বলতে বোঝায়—খাদ্য, বাসস্থান, বা পরিবেশের অন্য যা কিছু, যা জীবণধারণের জন্য অপরিহার্য এবং যা একটি জীব কিছুটা ব্যবহার করলে একই পপুলেশন বা কম্যুনিটির অন্তর্ভুক্ত অন্য জীবদের কাছে ঐ বস্তুটির প্রাপ্যতা / প্রাচুর্য সমানুপাতে কমে যায়।

উদাহরণ—একই ঘন জঙ্গলের কম্যুনিটির সদস্যদের কাছে সূর্যের আলো, ভূ-পৃষ্ঠের স্থান উভয়ই সীমিত সম্পদ। যার জন্য আন্তঃপ্রজাতি ও অন্তঃপ্রজাতি উভয় ধরনের প্রতিযোগিতা ঘটে। জঙ্গলের পাখিদের মধ্যে গাছের কোটরে বাসা বানানো পাখিদের কম্যুনিটিতে গাছের কোটর একটি সীমিত সম্পদ। একইভাবে, খাদ্যবস্তু, পানীয় জল, সীমিত সম্পদের উদাহরণ, তবে, জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য হলেই সেই জিনিস সীমিত সম্পদ বলে গণ্য হবে না যদি তার প্রাচুর্য কম্যুনিটির সদস্যদের কাছে অপরিসীম থাকে। যেমন, সাভানা ঘাসজমি (Savana grassland) ধরনের বাসভূমিতে (Habitat) উদ্ভিদ কম্যুনিটির কাছে সূর্যের আলো

সীমিত সম্পদ নয়। অক্সিজেন জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য হলেও এর যোগান প্রয়োজনের তুলনায় অপরিসীম বলে বায়ুর অক্সিজেন স্থলবাসী জীবেদের কাছে সীমিত সম্পদ নয়। সাধারণতঃ, সীমিত সম্পদের প্রাচর্য বাড়লে ঐ সম্পদ ব্যবহারকারী জীবেদের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিযোগিতা কমে, তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ও বাঁচবার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। আবার উল্টোভাবে, সীমিত সম্পদের প্রাচুর্য কমলে কম্যুনিটিতে সদস্যদের মধ্যে তার জন্য প্রতিযোগিতা বেড়ে যায়। কম্যুনিটি ইকোলজিতে শুধু সম্পদ শব্দটি প্রায়ঃশই ব্যবহার করা হলেও তা সর্বদা সীমিত সম্পদকেই বোঝায়।

6.5.2 নিশ্ (Niche)

কম্যুনিটি ইকোলজিতে Niche বা নিশ্ সংক্রান্ত ধারণাটি বহুকাল যাবৎ একটি কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেছে। সাধারণভাবে, 'নিশ' শব্দটি কোন ব্যক্তি বা জীবের সুবিধাজনকভাবে অস্তিত্ব রক্ষাকারী অবস্থানকে বোঝায়। ইকোলজিতে এই শব্দটি ব্যবহার জনপ্রিয় হয় প্রাণী ইকোলজিস্ট চার্লস এল্টন দ্বারা। এল্টন একটি প্রাণীর নিশ্ বলতে ঐ জীবটি তার কম্যুনিটিতে কিভাবে বেঁচে থাকে তা বোঝাতে চেয়েছিলেন। যেমন, একটি বেজির নিশ্ বলতে বোজায়—বেজিটি কি খায়, যাদের শিকার করে এরকম প্রাণী কারা, কোন্ ধরনের বাসভূমিতে (Habitat) বেজিরা থাকে, সেখানকার তাপমাত্রা, আর্দ্রতার সীমা কি, ইত্যাদির বর্ণনা। এই ধরনের ধারণা থেকে কোন প্রজাতির বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয় উপাদান/শর্ত-এর ধরন অনুযায়ী একই জীবের বিভিন্ন নিশ্ থাকে। যেমন—

ট্রফিক (Trophic) বা খাদ্য নিশ্। প্রজাতির সদস্য জীবরা যে যে ধরনের খাদ্য গ্রহণ করে তার বর্ণনাকে ট্রফিক বা খাদ্য নিশ্ বলে।

বাসভূমি (Habitat) নিশ্ ঃ প্রজাতির সদস্য জীবদের যে ধরনের বাসভূমিতে পাওয়া যায় তার বর্ণনাকে (ভৌগোলিক অবস্থান, তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, উচ্চতা/গভীরতা ইত্যাদি) বাসভূমি বা (Habitat) নিশ্ বলে।

গত শতাব্দীর পঞ্চাশ দশকের শেষ নাগাদ নিশ্ সম্পর্কিত ধারণাগুলিকে সাজিয়ে গুছিয়ে আরও বৈজ্ঞানিকভাবে আকার দেন আধুনিক কম্যুনিটি ইকোলজির জনক ই. ডাব্লিউ. হাটিন্সন। হাটিন্সনের ধারণা অনুযায়ী কম্যুনিটিতে অন্তর্গত প্রতিটি প্রজাতির নিশ্-কে একটি n-অক্ষীয় অতিস্থান বা n-ডাইমেনশনাল হাইপারভল্যুম (n-dimensional hypervolume) রূপে বর্ণনা করা হয় যার প্রতিটি x-অক্ষ (অর্থাৎ, x_1, x_2, x_3, ..., x_{n-1}) কোন একটি সীমিত সম্পদের (যেমন, বীজভক্ষক পাখির কম্যুনিটির ক্ষেত্রে পাখিদের খাওয়া সব ধরনের বীজের) বা বাসভূমির কোন অপরিহার্য শর্তের (যেমন, আর্দ্রতা, আলোর প্রাচুর্য, গভীরতা/উচ্চতা ইত্যাদি) পরিমাপের ক্রমান্বয়ে পরিবর্তনশীল (continuounsly variable) মাত্রা বা scale নির্দেশ করে। y-অক্ষকে x-অক্ষে নির্দেশিত সম্পদ প্রজাতিটির কতসংখ্যক একক জীব ব্যবহার করছে তা অর্থাৎ Frequency of use নির্দিষ্ট করা হয়। প্রতিটি x-অক্ষ ধরে y-অক্ষ বরাবর প্রজাতিটির একটি দ্বি-অক্ষীয় নিশ্ বর্ণিত হয়, যা একটি ঘন্টাকৃতি নর্মাল কার্ভ (normal curve)-এর রূপে প্রকাশিত হয়। একটি প্রজাতির পূর্ণাঙ্গ নিশ্টি হলো— এইরূপ n-1 সংখ্যক দ্বি-অক্ষীয় একক নিশের সমন্বয়, যাকে হাটিন্সনের n-dimensional নিশ্ বলা হয়।

6.5.3 প্রজাতির নিজস্ব নিশ্

একই কম্যুনিটিতে বসবাসকারী প্রতিটি প্রজাতির একটি নিজস্বতম নিশ্ (সঠিকভাবে বলতে গেলে, একটি নিজস্ব *n*-dimensional নিশ্) থাকে। ঐ নিশে প্রজাতিটির সদস্য জীবদের বেঁচে থাকবার ও বংশবৃদ্ধি করবার ক্ষমতা (অর্থাৎ, সংক্ষেপে ডারউইনিয়ান ফিট্নেশ) একই কম্যুনিটিতে সহবাসী অন্য প্রজাতির জীবদের থেকে বেশী। মূলতঃ সম্পদের জন্য কম্যুনিটির সদস্য প্রজাতি জীবদের মধ্যে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে কোন প্রজাতির নিশ্ নির্দ্দিষ্ট হয়।

বিবর্তনে লব্ধ চরিত্র অনুযায়ী কোন একটি প্রজাতি সর্বাধিক যে আয়তনের নিশ্ দখল করতে পারে তাকে প্রজাতিটির **ভিত্তিমূলক** নিশ্ **(Fundamental Niche)** বলে। কম্যুনিটির অন্য প্রজাতিদের সঙ্গে প্রতিযোগিতার দরুন কোন প্রজাতি তার পরিপূর্ণ ভিত্তিমূলক নিশ্ জুড়ে অবস্থান করতে পারে না, কিছুটা সংকুচিত নিশে অবস্থান করে। এই সংকুচিত আয়তনের নিশ্কে **বাস্তব নিশ্ (Realized Niche)** বলে।

প্রতিযোগিতা কমে গেলে কোন প্রজাতির বাস্তব নিশ্ প্রসারিত হয়, এবং প্রতিযোগিতা সম্পূর্ণ দূর হলে তা পরিপূর্ণ ভিত্তিমূলক নিশের আয়তন ফিরে পেতে পারে (চিত্র নং 2)।

6.5.4 কম্যুনিটিতে একই নিশে একাধিক প্রজাতি থাকতে পারে না

কম্যুনিটিতে হুবহু একই ভিত্তিমূলক নিশের অধিকারী একাধিক প্রজাতি বসবাস করতে শুরু করলে যে কোন একটি প্রজাতির সদস্যরা প্রতিযোগিতায় অন্য প্রজাতির সদস্যদের থেকে সুবিধাজনক অবস্থায় থাকে। ফলে, প্রতিযোগিতায় অন্য প্রজাতিগুলি ঐ নিশ্ থেকে অপসারিত হয়। এর ফলে, ঐ কম্যুনিটি থেকে অপসারিত নিশে অবস্থানকারী প্রজাতিটি সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হতে পারে, অথবা বিবর্তিত হয়ে ঐ প্রজাতিটি অন্য কোন নিশ্ অধিকার করে ঐ কম্যুনিটিতেই থেকে যেতে পারে। অর্থাৎ, একটি কম্যুনিটিতে একই নিশ্ অধিকার করে একাধিক প্রতিযোগী প্রজাতি সহাবস্থান করতে পারে না (Complete competitors cannot coexist)। এই ধারণাকে সংক্ষেপে প্রতিযোগিতামূলক নিশ্ অপসারণ নীতি (Competitive Niche Exclusion Principle) বলে।

ইকোলজিতে উপরোক্ত ধারণাটি বেশ পুরোনো এবং এর প্রভাবও অত্যন্ত গভীর। প্রধানতঃ লোত্কা ও ভলতেরা-র (1932) ম্যাথ্মেটিক্যাল মডেলিং এবং গাউস-এর (1934) পরীক্ষাগারের অধ্যয়ন থেকে প্রতিযোগিতামূলক নিশ্ অপসারণের ধারণা পরিচিতি পেয়েছে।

গাউস-এর পরীক্ষা ঃ বিখ্যাত রাশিয়ান ইকোলজিস্ট জি. এফ. গাউস (G.F. Gause) উপযুক্ত মাধ্যমে আলাদা আলাদা করে প্যারামিশিয়ামের দুটি প্রজাতি *Paramecium causdatum* ও *P. aurelia* লালন করেন। দুটি ক্ষেত্রেই প্রজাতি দুটির পপুলেশন সংখ্যায় বৃদ্ধি পেয়ে একটি নির্দ্দিষ্ট জনসংখ্যায় স্থিতিশীল হয় (চিত্র নং 3a, b)। কিন্তু, গাউস যখন ঐ প্রজাতি দুটিকে ঐ একই মাধ্যমে একসাথে লালন করেন তখন ভিন্ন চিত্র লক্ষ্য করেন। প্রথমে দুটি প্রজাতির পপুলেশন একই সাথে বৃদ্ধি পায়। তারপর, *P. aurelia*-এর পপুলেশন আরও কিছুটা বৃদ্ধি পাওয়ার পর স্থিতিশীল হয়। কিন্তু, *P. caudatum*-এর পপুলেশন দ্রুত

কমতে থাকে এবং একসময় বিলুপ্ত হয়ে যায় (চিত্র নং 3c)। গাউস-এর এই পর্যবেক্ষণ নিম্নলিকিথভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যা একই নিশে একাধিক প্রতিযোগী প্রজাতি অবস্থান করতে পারে না, এই ধারণাকে সমর্থন করে। আলাদা আলাদা ভাবে লালিত হওয়া কালীন প্রজাতি দুটি প্রতিযোগিতাহীন পরিবেশে তাদের ভিত্তিমূলক নিশ্ অধিকার করে পপুলেশন বৃদ্ধি করে। একসঙ্গে তাদের লালন করা কালীন প্রথমে যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের ব্যবহৃত সম্পদের (অর্থাৎ লালন মাধ্যম) যোগান পর্যন্ত থাকছে ততক্ষণ দুটি প্রজাতি একই নিশে (অর্থাৎ একই সম্পদ ব্যবহারকারী) থাকা সত্ত্বেও পপুলেশনে বৃদ্ধি পাবে। লালন মাধ্যমও পরিবেশে *P. caudatum* অপেক্ষা সুঅভিযোজিত হওয়ার দরুণ প্রবলতর প্রতিযোগী। তাই, *P. aurelia* প্রতিযোগিতায় *P. caudatum* হঠিয়ে বেশী সম্পদের ভাগ নিতে থাকে ও পপুলেশন বৃদ্ধি করতে থাকে। তাদের পপুলেশন বৃদ্ধির সাথে সাথে *P. caudatum*-এর উপর প্রতিযোগিতার চাপ-প্রবলতর হতে থাকে, তাদের জনসংখ্যা দ্রুত কমতে থাকে এবং এক সময় বিলুপ্ত হয়ে যায়। *P. aurelia* কম্যুনিটির ঐ বিশেষ নিশটি একাই সম্পূর্ণরূপে অধিকার করে।

বিজ্ঞানী পার্ক (1948, 1954) একই রকম পরীক্ষা চালান *Trilobium confusum* ও *T. castaneum* নামক দুটি প্রজাতির ময়দান পোকার উপর এবং একই রকম সিদ্ধান্তে উপনীত হন।

6.5.5. প্রতিযোগিতামূলক নিশ্ অপসারণ ও কম্যুনিটির প্রজাতি বৈচিত্র্য

গাউস ও পার্ক-এর পরীক্ষালব্ধ এই ব্যাখ্যাগুলি কম্যুনিটি ইকোলজির উপর গভীর প্রভাব ফেলেছিলো। হাচিন্সন ও তার শিয়ারা, যেমন, রবার্ট ম্যাকআর্থার, পরবর্তীকালে সীমিত সম্পদের জন্য প্রতিযোগিতা ও একই নিশ্ থেকে প্রতিযোগিতামূলক অপসারণকে কম্যুনিটি সংগঠনের একমাত্র তাৎপর্যপূর্ণ পদ্ধতি বলে মনে করতে থাকেন। হ্যাচিন্সনের মতে, নিশ থেকে প্রতিযোগিতামূলক অপসারণের ফলে প্রজাতিরা বিবর্তনের মাধ্যমে নতুন নিশে প্রবেশ করে এবং তার ফলে একই স্থানে একাধিক প্রজাতি বসবাস করতে পারে। কম্যুনিটিতে এইভাবেই প্রজাতি বৈচিত্র্য স্থায়ী হয়।

সীমিত সম্পদের জন্য প্রতিযোগিতা কম্যুনিটি সংগঠনের একক তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকাকে কেন্দ্র করে আধুনিক কম্যুনিটি ইকোলজিস্টদের মধ্যে বিতর্ক বর্তমান। সিম্বারলফ্, কোনেল প্রমুখ ইকোলজিস্টরা তাত্ত্বিক দিক থেকে বাস্তবে কম্যুনিটি সংগঠনের প্রতিযোগিতার ভূমিকা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণ করার অসুবিধাগুলিকে নির্দ্দিষ্ট করেন। এঁরা প্রতিযোগিতা ছাড়াও কম্যুনিটি সংগঠনে শিকারী-শিকার মূলক (Prey-Predator) ও পোষক-পরজীবী মূলক আন্তঃপ্রজাতি ক্রিয়ার ভূমিকাকে গুরুত্ব দেন।

6.5.6 সীমিত সম্পদ বিভাজন (Resource Partitioning)

হাচিন্সনের *n*-অক্ষীয় নিশের সংজ্ঞা আধুনিক কম্যুনিটি ইকোলজিকে বৈজ্ঞানিক রূপ দিতে প্রধান ভূমিকা পালন করলেও বাস্তবে এই সংজ্ঞা পুরোপুরি অনুসরণ করে কম্যুনিটি সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ আন্তঃক্রিয়াগুলিকে অধ্যয়ন করা প্রায় অসম্ভব। কেননা, বাস্তবে কোন প্রজাতির নিশ্ পূর্ণাঙ্গভাবে নির্দ্দিষ্ট করতে সবকটি সম্পদ বা অজীবীয় শর্ত সংক্রান্ত *x*-অক্ষ বর্ণনা করা অসম্ভব। কার্যতঃ একটি বা দুটি *x*-অক্ষের বর্ণনার মাধ্যমে কোন প্রজাতির নিশ্ বা কম্যুনিটিতে সহাবস্থানকারী প্রজাতিদের মধ্যে আন্তঃক্রিয়ার

ধরণ অধ্যয়ন করা হয়ে থাকে। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই এই অক্ষগুলি কম্যুনিটিতে ব্যবহৃত কোন সীমিত সম্পদকে বর্ণনা করে।

আধুনিক কম্যুনিটি ইকোলজিতে কম্যুনিটি সংগঠনে প্রতিযোগিতার বাজারে বুঝতে গুরুত্বপর্ণতম একটি সীমিত সম্পদকে বেছে নিয়ে কম্যুনিটির সদস্য প্রজাতিদের দ্বারা তার ব্যবহারের ধরনকে অধ্যয়ন করা হয়। কম্যুনিটিতে একই ধরনের সীমিত সম্পদকে ভাগাভাগি করে সদ্যস প্রজাতিরা ব্যবহার করার মাধ্যমে প্রতিযোগিতা এড়ায়—এই ধারণাকে সীমিত সম্পদ বিভাজন বা Resource partitioning বলে।

6.6 ইকোলজিক্যাল ক্রমপরিবর্তন (Ecological Succession)

6.6.1 সংজ্ঞা

সময়ের সাথে কোন একটি প্রাকৃতিক কম্যুনিটির সংগঠনরত ও অন্যান্য চারিত্রিক পরিবর্তনকে ইকোলজিক্যাল ক্রমপরিবর্তন বা Succession বলা হয়। এই পরিবর্তনের ফলে পুরোনো কম্যুনিটির থেকে নতুন কম্যুনিটির উদ্ভব হয়।

সাধারণভাবে, ইকোলজিক্যাল ক্রমপরিবর্তনের ধারণা ও অধ্যয়ন উদ্ভিদ কম্যুনিটির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয়। তবে, উদ্ভিদ কম্যুনিটির পরিবর্তনের সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট প্রাণী কম্যুনিটি ক্রমপরিবর্তন ও অনেক ক্ষেত্রেই অধ্যয়নের লক্ষ্যে থাকে।

ইকোলজ়িক্যাল ক্রমপরিবর্তন নির্দ্দিষ্ট দিকমুখী। অর্থাৎ, একটি কম্যুনিটি নির্দ্দিষ্ট শর্ত অনুযায়ী পরিবর্তিত হলে একটি বিশেষ ধরনের নতুন কম্যুনিটির উদ্ভব ঘটে। যেমন, একটি পড়ে থাকা অগভীর ডোবার জলজ উদ্ভিদ কম্যুনিটির ক্রমপরিবর্তনে, যা ডোবার গভীরতা পলি জমে হ্রাস পাওয়ার সাথে অবিচ্ছিন্নভাবে সংশ্লিষ্ট একটি ডাঙ্গার উদ্ভিদ কম্যুনিটির উদ্ভব ঘটে।

কোন জায়গায় জীবের বসবাসযোগ্য একটি বাসভূমি (Habitat) সৃষ্টি হলে সেখানে প্রথমে ঐরকম পরিবেশে অভিযোজিত এক বা একাধিক প্রজাতির জীবেরা এসে পৌঁছায়। অগ্ন্যুৎপাত থেকে সৃষ্ট পাথুরে, প্রাণহীন দ্বীপ থেকে আরম্ভ করে, নতুন বর্ষার জলে সৃষ্ট অস্থায়ী জলাশয়, এমনকি সদ্য মৃত জীবদেহকে নতুন বাসভূমি হিসাবে এইসব জীবেরা ব্যবহার করে কম্যুনিটির পত্তন ঘটায়। পূর্বে কোন কম্যুনিটির অস্তিত্ব ছিল না এরকম নতুন সৃষ্ট বাসভূমিতে যেসব প্রজাতিরা একটি কম্যুনিটির পত্তন ঘটিয়ে ইকোলজিক্যাল ক্রমপরিবর্তনের সূচনা করে তাদের **পথপ্রদর্শক বা Pioneer প্রজাতি** বলা হয়। পাইওনীয়ার প্রজাতিরা তাদের জীবনধারণের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবে ঐ নতুন বাসভূমির গুরুত্বপূর্ণ চারিত্রিক পরিবর্তন ঘটায়। যার ফলে, একসময়, ঐ পরিবর্তিত পরিবেশ তাদের জীবনধারণের পক্ষে প্রতিকূল এবং অন্য প্রজাতিদের পক্ষে অনুকূল হয়ে ওঠে। তখন, দ্বিতীয় ধরনের প্রজাতিরা ঐ বাসভূমিতে ক্রমশঃ বেশী সংখ্যায় গেঁড়ে বসতে থাকে। ফলে, একটি দ্বিতীয় পর্যায়ের কম্যুনিটির উদ্ভব ঘটে। আবার, এই দ্বিতীয় পর্যায়ের কম্যুনিটির কার্য্য-ক্রিয়া এমনভাবে বাসভূমির পরিবেশের চারিত্রিক পরিবর্তন ঘটাতে থাকে যা তাদের সদস্য প্রজাতিদের পক্ষে প্রতিকূল হয়ে ওঠে ও তৃতীয় কোন কম্যুনিটির দ্বারা তাদের অপসারণের পরিস্থিতি তৈরী করে দেয়। এইভাবে একটি নতুন কম্যুনিটির দ্বারা পূর্ববর্তী কম্যুনিটির অপসারণ ঘটতে থাকে যতক্ষণ না পর্যন্ত নতুন কম্যুনিটিটি

পর্ববর্তী কম্যুনিটিদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত অনেক বেশী স্থিতিশীল পরিবেশ বজায় রাখতে সক্ষম হয়। এই শেষ কম্যুনিটিটিকে চূড়ান্ত বা Climax কম্যুনিটি বলা হয়।

6.6.2 প্রকারভেদ

ইকোলজিক্যাল ক্রমপরিবর্তন বাসভূমির কম্যুনিটি সংক্রান্ত ইতিহাস অনুসারে দু'রকমের হতে পারে।

প্রাথমিক ক্রমপরিবর্তন (Primary Succession) : কোন একটি সম্পূর্ণ জীবহীন বাসভূমিতে (যেমন, অগ্ন্যুৎপাতে সৃষ্ট পাথুরে দ্বীপ বা পুরু বরফের স্তর থেকে মুক্তি পাওয়া জমি) পথপ্রদর্শক কম্যুনিটির বসবাস ও তাদের থেকে ক্রমপরিবর্তনে ঐ পরিবেশের পক্ষে উপযুক্ত চূড়ান্ত কম্যুনিটির উদ্ভবের ঘটনাকে প্রাথমিক ক্রমপরিবর্তন বলা হয়।

পরবর্তী ক্রমবিবর্তন (Secondary Succession) ঃ কোন একটি কম্যুনিটি বসবাস করছে এরকম অবস্থায় থাকা কোন একটি বাসভূমি থেকে ঐ বসবাসকারী কম্যুনিটি কোন কারণে ধ্বংস হয়ে গেলে আবার পূর্ববর্তী কোন পর্যায়ের কম্যুনিটি (একদম প্রথম বা পথপ্রদর্শক কম্যুনিটিও হতে পারে) ফিরে আসে এবং নতুন করে সেই পর্যায় থেকে ক্রমপরিবর্তন শুরু হয়। এই ধরনের ক্রমপরিবর্তনকে পরবর্তী ক্রপরিবর্তন বা Secondary Succession বলে। যেমন, বন্যার তোড়ে নদীর চরে উদ্ভূত ক্রমপরিবর্তনের প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় পর্যায়ে থাকা কোন কম্যুনিটি সম্পূর্ণ অপসারিত হয়ে সম্পূর্ণ কম্যুনিটিহীন নগ্ন চর সৃষ্টি হতে পারে ও সেখানে নতুনভাবে ক্রমপরিবর্তন শুরু হতে পারে। একে পরবর্তী বা সেকেন্ডারী ক্রমপরিবর্তন বলা হবে। একটি জঙ্গলের অংশ দাবানলে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হলে বা মানুষের দ্বারা অপসারিত হলে, সেই বাসভূমিতে যে ক্রমপরিবর্তন আবার শুরু হবে তাকে সেকেন্ডারী ক্রমপরিবর্তন বলা হবে।

বাসভূমির চরিত্র ও বাসভূমিতে বসবাসকারী কম্যুনিটিদের পরিবর্তনের কারণের উৎস অনুসারে ক্রমপরিবর্তন দু'রকমের হতে পারে। যথা—

স্বজাত বা Autogenic ক্রমপরিবর্তন ঃ যখন শুধুমাত্র একটি বাসভূমিতে বসবাসকারী কম্যুনিটির প্রভাবেই ঐ বাসভূমিটির চারিত্রিক পরিবর্তন ঘটে যার ফলস্বরূপ ক্রমপরিবর্তনে নতুন কম্যুনিটির উদ্ভব ঘটে, তখন ক্রমপরিবর্তনটিকে স্বজাত বা Autogenic ক্রমপরিবর্তন বলে ধরা হয়। কেননা, বহিরাগত কোন প্রভাব এই ক্রমপরিবর্তনে ভূমিকা নেয় না।

উদাহরণ ঃ একটি ঘাস জমিতে নিম্নলিখিতভাবে উদ্ভিদ কম্যুনিটির স্বজাত/স্বপ্রণোদিত ক্রমপরিবর্তন ঘটতে পারে। ঘাসজমির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির সাথে সাথে মাটিতে জমতে থাকা মৃত জীবভর (ঘাসের, গুল্ম ইত্যাদি ঘাস জমির উদ্ভিদের মৃত দেহাংশ) পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে— মাটিতে হিউমাস্ বেশী পরিমাণে তৈরী হবে — মাটির চরিত্র পরিবর্তন হবে— বৃক্ষ জাতীয় উদ্ভিদের উপযোগী উর্ব্বর মাটির সৃষ্টি হবে— বৃক্ষ জাতীয় উদ্ভিদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে — বৃক্ষের ঘনত্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় বাসভূমির ছায়াময়তা বৃদ্ধি পাবে — ছায়া পছন্দকারী প্রজাতি বৃক্ষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে, ইত্যাদি।

পরপ্রণোদিত বা Allogenic Succession / ক্রমপরিবর্তন ঃ যখন কোন একটি বাসভূমির গুরুত্বপূর্ণ চারিত্রিক পরিবর্তন (যা ক্রমপরিবর্তন ঘটায়) ঐ বাসভূমিতে বসবাসকারী কম্যুনিটির ক্রিয়াজাত কোন প্রভাব ব্যতীত বাহ্য কোন প্রভাবের দ্বারা ঘটে তাকে পরপ্রণোদিত ক্রমপরিবর্তন বা Allogenic succession বলে।

উদাহরণ ঃ বন্যার প্রভাবে কোন নদীখাতের মুখ পলি পড়ে বন্ধ হয়ে গেলে ঐ নদীখাত প্রবাহহীন বিল বা দহ জাতীয় প্রবাহহীন জলাশয়ে পরিণত হয়। এর ফলে পুর্ববর্তী প্রবাহযুক্ত জলাশয়ে অভিযোজিত কম্যুনিটিরা ক্রমান্বয়ে প্রবাহহীন জলাশয়ের কম্যুনিটির দ্বারা অপসারিত হয়।

এছাড়াও, মানুষের কর্মকান্ডের ফলে প্রাকৃতিক কোন বাসভূমি ও সেখানকার কম্যুনিটির চরিত্রের ক্রমপরিবর্তন ঘটে। এই ধরনের ক্রমপরিবর্তনকে **মনুষ্যসৃষ্ট বা Anthropogenic Succession** বলে। যেমন, অতিরিক্ত গরু, ছাগল চরাবার ফলে কোন জঙ্গলের প্রাকৃতিক হার্ব (Herb) ও শ্রাব্ (Shurb) স্তরের উদ্ভিদ কম্যুনিটি ধ্বংস হয়ে কাঁটাযুক্ত ও বিষাক্ত পদার্থ ক্ষরণকারী উদ্ভিদের প্রজাতি প্রাধান্য বিস্তার করে। বস্তুত পক্ষে, বর্তমানে পৃথিবীর বেশীরভাগ বাসভূমিতেই যে ক্রমপরিবর্তন ঘটে তা অন্ততঃ কিছুটা পরিমাণে মনুষ্যসৃষ্ট।

6.6.3 সেরে (Sere)

যে কোন ধরনের ক্রমপরিবর্তনের ক্ষেত্রে উদ্ভিদ কম্যুনিটির ক্রমপরিবর্তনের পর্যায়ক্রমকে সেরে (Sere) এবং প্রতিটি পর্যায়কে এক একটি সেরাল পর্যায় (Seral stage) বলে।

অগভীর জলাশয় (wetlands) জাতীয় বাসভূমিতে অভিযোজিত উদ্ভিদ কম্যুনিটির ক্রমপরিবর্তনকে hydrosere (হাইড্রোসেরে), এবং পাথুরে জমিতে প্রায় জীবহীন দশা থেকে বিভিন্ন উদ্ভিদ কম্যুনিটিতে ক্রমপরিবর্তনকে xerosere (জেরোসেরে) বলে। নিচে একটি xerosere-র উদাহরণ দেওয়া হলো—

বাসভূমির চরিত্র	উদ্ভিদ কম্যুনিটি
নগ্ন পাথর/পাথুরে জমি	কোন উদ্ভিদ নেই
1নং সেরে ঃ বৃষ্টি, হাওয়ায় ক্ষয়িষ্ণু পাথুরে ত্বক	মস ও লাইকেন জাতীয় উদ্ভিদের কম্যুনিটি
2নং সেরে ঃ ফাটল ধরা, ক্ষয়িষ্ণু পাথুরে ত্বক, দানাময় পাথুরে জমি	ঘাস জাতীয় উদ্ভিদের কম্যুনিটি
3নং সেরে ঃ নবীন, বালির প্রাধান্যযুক্ত মাটি	দ্বিবীজপত্রযুক্ত, N_2 সংশেষক ব্যাকটেরিয়ার নড়ুলযুক্ত মূল আছে এরকম উদ্ভিদের কম্যুনিটি
4নং সেরে ঃ হিউমাস সমৃদ্ধ পূর্ণাঙ্গ মাটি	বৃক্ষ, গুল্ম ও বীরুৎ জাতীয় উদ্ভিদের কম্যুনিটি

6.7 চিত্রাবলী

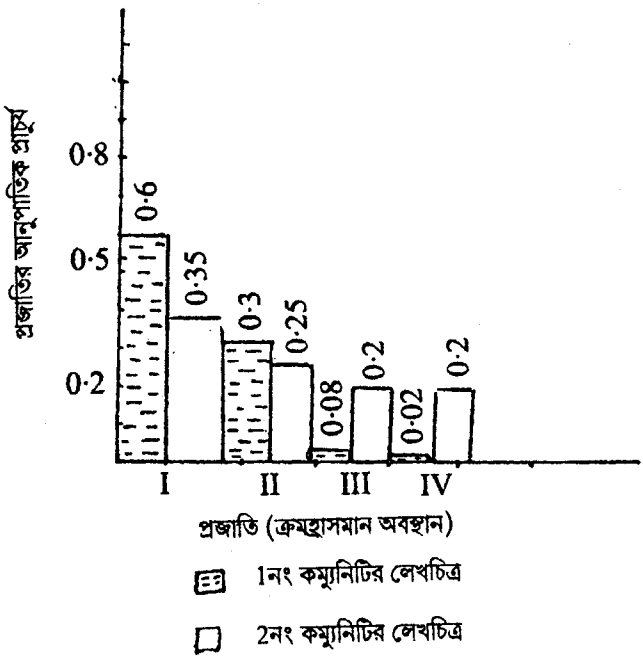

চিত্র নং 1 : দুটি কম্যুনিটির প্রজাতি প্রাচুর্যের লেখচিত্র

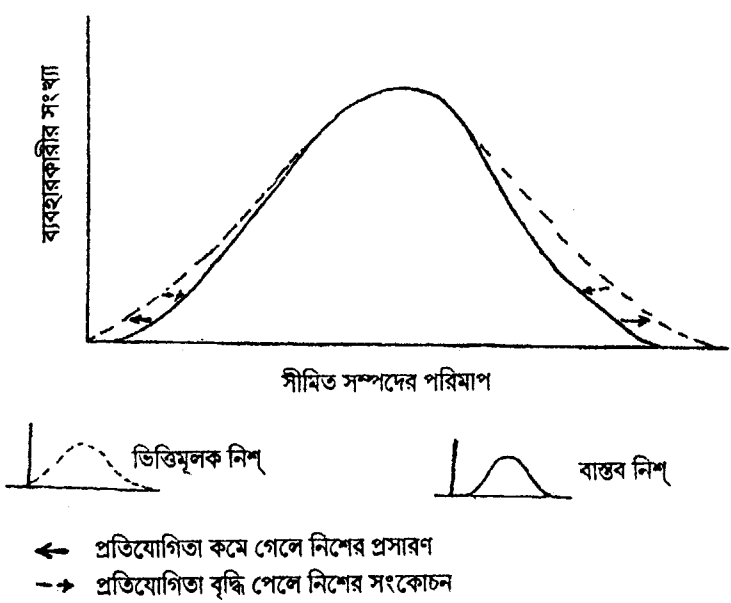

চিত্র নং 2 : বাস্তব ও ভিত্তিমূলক নিশ্

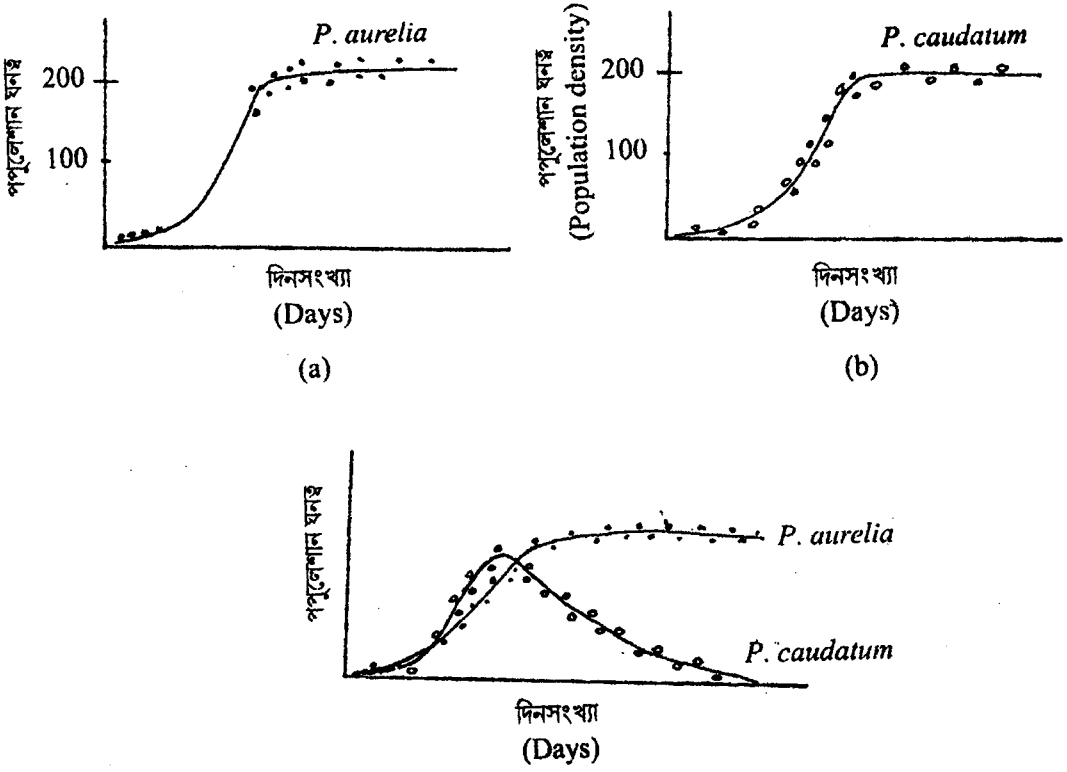

চিত্র নং 3 : গাউস-এর নিশ্ সংক্রান্ত পরীক্ষা

6.8 সারাংশ

আধুনিক কম্যুনিটি ইকোলজিতে একটি কম্যুনিটি বলতে যে কোন প্রাকৃতিকভাবে আন্তঃক্রিয়ারত একাধিক প্রজাতির সমষ্টিকে বোঝায়। এই ধারণা, ক্লিমেন্টস্-এর উদ্ভিদ কম্যুনিটির ধারণা থেকে অনেকটাই আলাদা, বরং, গ্লিসান-এর উদ্ভিদ কম্যুনিটি-র ধারণার অনুসারী। কম্যুনিটির প্রজাতি বৈচিত্র্য ঐ কম্যুনিটির সংগঠনগত চরিত্রকে পরিস্ফুট করে। সদস্য প্রজাতি সংখ্যা ও সদস্য প্রজাতিদের তুলনামূলক প্রাচুর্য (Relative abundance)-এই দুটি বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে কম্যুনিটির সংগঠনকে বর্ণনা করা হয়। সাংখ্য সূচক (Numerical index) বা তুলনামুলক প্রাচুর্যের লেখচিত্র (Relative abundance graph)— এই দুইভাবে ঐ বর্ণনা করা যায়।

কম্যুনিটির সদস্য প্রজাতিদের মধ্যে আন্তঃক্রিয়া মূলতঃ তিন ধরনের হতে পারে— (ক) সীমিত সম্পদের (Limiting resource) জন্য প্রতিযোগিতা (খ) শিকার-শিকারী জাতীয় আন্তঃক্রিয়া (গ) পরজীবী-পোষক জাতীয় আন্তঃক্রিয়া। এর মধ্যে সীমিত সম্পদের জন্য প্রতিযোগিতা সার্বিকভাবে কম্যুনিটির সংগঠনগত চরিত্র নির্ধারণের পরিপ্রেক্ষিতে সর্বাধিক বলে মনে করা হয়। প্রজাতির নিজস্ব নিশ্ (Niche)

এবং নিশ্ বিভাজন ইত্যাদি নিস্ সংক্রান্ত ধারণাগুলি এই প্রতিযোগিতামূলক আন্তঃক্রিয়াকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে। পূর্ববর্তী খাদ্য-নিশ্ বা বাসভূমি-নিশের ধারণা আধুনিক কম্যুনিটি ইকোলজির জনক হাচিন্সনের হাইপারভল্যুম নিশের ধারণার মধ্যে আত্মীভূত হয়েছে। ইদানীং, সীমিত সম্পদ বিভাজন (Resource partitioning)-এর ধারণাটিকে বেশী বাস্তবসম্মত বলে মনে করা হচ্ছে।

6.9 প্রশ্নাবলী

1. সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন ঃ

(a) আধুনিক ইকোলজিতে কম্যুনিটি বলতে কী বোঝায়?

(b) কম্যুনিটির সংগঠনগত চরিত্র কী কী ভাবে প্রকাশ করা যায়?

(c) দুটি কম্যুনিটির সদস্য প্রজাতি সংখ্যা এক হলেও তাদের সংগঠনগত চরিত্র কিভাবে ভিন্ন হতে পারে?

(d) দুটি আত্মপরিচিত প্রজাতি বৈচিত্র্যের সাংখ্যসূচকের পরিচিতি দাও।

(e) 'হাইপারভল্যুম নিশ্' কী?

(f) কোন প্রজাতির 'ভিত্তিমূলক নিশ্' ও 'বাস্তব নিশ্' বলতে কী বোঝায়?

(g) ইকোলজিক্যাল ক্রমপরিবর্তন (Succession) কাকে বলে?

(h) মনুষ্যসৃষ্ট (Anthropogenic) ক্রমপরিবর্তন বলতে কি বোঝায়? উদাহরণ দিন।

2. তুলনা করুন ঃ

(a) ক্লিমেন্টস্ ও গ্লিসানের (উদ্ভিদ) কম্যুনিটি সংক্রান্ত ধারণা।

(b) Autogenic ও Allogenic ক্রমপরিবর্তন।

(c) Pioneer কম্যুনিটি ও চূড়ান্ত কম্যুনিটি।

3. দীর্ঘ উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

(a) উদাহরণ হিসাবে দুটি কম্যুনিটি কল্পনা করে নিয়ে তাদের মাধ্যমে কম্যুনিটির সংগঠনগত চরিত্র কিভাবে বর্ণনা করা হয় তা দেখান।

(b) 'একটি কম্যুনিটিতে একটি নিশে একাধিক প্রজাতি থাকতে পারে না'—এই ধারণাটিকে একটি পরীক্ষার মাধ্যমে সমর্থন করুন।

(c) কোন বাসভূমিতে ইকোলজিক্যাল ক্রমপরিবর্তন কী কী ভাবে ঘটতে পারে এবং তার চূড়ান্ত পরিণতি কী ঘটতে পারে উদাহরণসহ বোঝান।

6.10 উত্তরমালা

অনুশীলনী—1

(a) 6.3 (সংজ্ঞা অংশটুকু)

(b) 6.4.1 ও 6.4.2 (প্রজাতি বৈচিত্র্য-র মাধ্যমে যা প্রজাতি প্রাচুর্য ও সদস্য প্রজাতিদের তুলনামূলক প্রাচুর্যের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়)

(c) 6.4.2

(d) 6.4.2 (শ্যানন-উইনার সূচক ও সিম্পসন-এর সূচক)

(e) 6.5.2

(f) 6.5.3

(g) 6.6.1

(h) 6.6.3

অনুশীলনী—2

(a) 6.3

(b) 6.6.3

(c) 6.6.1

অনুশীলনী—3

(a) 6.4.2

(b) 6.5.4

(c) 6.6.3

একক 7 ❑ জীববৈচিত্র্য সম্বন্ধে ধারণা, জীববৈচিত্র্যের প্রকারভেদ, জীববৈচিত্র্যের গুরুত্ব, মহাবৈচিত্র্যের স্থানসমূহ এবং ভারতবর্ষের জীববৈচিত্র্যময় স্থানসমূহের বিবরণ (Concept of Biodiversity, Types of Biodiversity, Value of Biodiversity, Mega Diversity Zones and Biodiversity Hotspots with Special Reference to India)

গঠন

7.1 প্রস্তাবনা

উদ্দেশ্য

7.2 জীববৈচিত্র্য সম্বন্ধে ধারণা

7.3 জীববৈচিত্র্যের প্রকারভেদ

7.4 জীববৈচিত্র্যের গুরুত্ব

7.5 মহাবৈচিত্র্যের স্থানসমূহ

7.6 ভারতবর্ষের জীববৈচিত্র্যময় স্থানগুলির উল্লেখ

7.7 সারাংশ

7.8 প্রশ্নাবলী

7.9 উত্তরমালা

7.1 প্রস্তাবনা

পৃথিবী বৈচিত্র্যময়, কোথাও জল, কোথাও স্থলভাগ। স্থলভাগের কোথাও শ্যামল গভীর অরণ্য, কোথাও অগভীর বনানী, কোথাও মরুভূমি আবার কোথাও বরফের আস্তরণে ঢাকা। এইরকম ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশ নিয়েই এই পৃথিবী। ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশের গাছপালা এবং প্রাণীরাও বিভিন্ন ধরনের হয়। এইরকম কোন পরিবেশের প্রাণী, উদ্ভিদ ও জীবাণুর একত্র উপস্থিতিই ঐ পরিবেশের জীববৈচিত্র্য। অর্থাৎ বাস্তুতন্ত্রের সজীব বস্তুর উপাদানই জীববৈচিত্র্যকে সূচিত করে। এই জীববৈচিত্র্যের সম্বন্ধে বিশেষভাবে জ্ঞান অর্জন করা এই এককের উদ্দেশ্য। জীববৈচিত্র্য কোথায় কি প্রকারের হয়, এর বৈশিষ্ট্য কি, এই জীববৈচিত্র্যের সঙ্গে পৃথিবীর সংযোগ কোথায়, তদুপরি আমাদের বেঁচে থাকার সঙ্গে এই জীববৈচিত্র্যের সংযোগ কোথায়, কেন একে সংরক্ষণ করতে হবে ইত্যাদি বিষয়ই এই এককের আলোচ্য বিষয়।

উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি—

- জীববৈচিত্র্যের সুস্পষ্ট সংজ্ঞা দিতে পারবেন।
- পৃথিবীর সর্বাধিক জীববৈচিত্র্যের দেশগুলি সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- জীববৈচিত্র্য প্রাণীদের ভারসাম্য রক্ষায় কতটা সহায়ক তা নির্ধারণ করতে পারবেন।
- জীববৈচিত্র্য কিভাবে পরিবেশকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে তা জানতে পারবেন।
- জীববৈচিত্র্য রক্ষা করার দায়িত্ববোধ সম্পর্কে সচেতন হবেন।

7.2 জীববৈচিত্র্য সম্বন্ধে ধারণা (Concept of Biodiversity)

পৃথিবী বিভিন্ন প্রকাররে উদ্ভিদ, প্রাণী এবং জীবাণু (microbe) দ্বারা পরিপূর্ণ। এই সব সজীব উপদানগুলির পরিবেশের সঙ্গে সুষ্ঠু সমন্বয়েই বাস্তুতন্ত্র গড়ে ওঠে। ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে ভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ, প্রাণী, আবহাওয়া ইত্যাদি দেখা যায়। যেমন স্থলভাগের কথাই ধরা যাক। পৃথিবীর চারভাগের একভাগ স্থলভূমি। স্থলভূমিরও আবার একই রকম পরিবেশ দেখা যায় না। কোথাও শুষ্ক মরুভূমি, কোথাও স্যাঁতসেঁতে জমি, কোথাও অরণ্য, কোথাও শ্যামল প্রান্তর, কোথাও পর্বত কোথাও সমভূমি, কোথাও নদী, কোথাও পুকুর। এইসব বিভিন্ন স্থানের বাস্তুতন্ত্রও আলাদা রকমের। ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশের উদ্ভিদ, প্রাণীকুলও বৈচিত্র্যময়। পেঙ্গুইন একমাত্র মেরু বরফের দেশেই পাওয়া যায়। বাঘ, সিংহ, গণ্ডার, হাতী, ইত্যাদিরা গভীর অরণ্যেই বাস করে। পুকুরে, নদীতে মাছেদের বাস। তিতির পাখী হালকা ঝোপঝাড়ে থাকতে ভালবাসে। তবে স্থলভূমির প্রায় সব রকম পরিবেশেই মানুষ বাস করে। পরিবেশের উদ্ভিদ-প্রাণী এমনকি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবাণুর সমন্বয়ই সেই পরিবেশের জীববৈচিত্র্য গঠনে সহায়ক অর্থাৎ ঐ সময় জীবের একত্র উপস্থিতিই জীববৈচিত্র্য।

বৈজ্ঞানিক স্টর্ক ও উইলসনের (stork, 1988 : Wilson, 1988) মতে এই পৃথিবীতে প্রায় 100 লক্ষ থেকে 800 লক্ষ প্রজাতির বসবাস। এর মধ্যে মাত্র 1.4 শতাংশ প্রজাতির নাম তালিকাভুক্ত করা গেছে। এই বিশাল সংখ্যক প্রজাতি কিন্তু একদিনে সৃষ্টি হয়নি। প্রায় 60 কোটি বছর ধরে অত্যন্ত ধীরগতিতে এর সৃষ্টি হয়েছে।

জীববৈচিত্র্যের সংজ্ঞা

1992 সালে ব্রাজিলের রিও-ডি-জেনোরোর সম্মেলনে জীববৈচিত্র্যের একটি সুন্দর সংজ্ঞা দেওয়া হয়। সেই সংজ্ঞা অনুযায়ী "The variablility among living organisms from all sources including

inter alia, terrestrial, marine, and other aquatic ecosystem and the ecological complexes of which they are part : this includes diversity within species, between species and ecosystems." অর্থাৎ পরিবেশ বা প্রকৃতিতে জীব বা জীবের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বাস্তুতন্ত্রে সকল রকম বহুরূপতাই জীববৈচিত্র্য।

7.3 জীববৈচিত্র্যের প্রকারভেদ (Types of Biodiversity)

জীববৈচিত্র্যকে তিনভাবে বিশ্লেষণ করা যায় ঃ

1. জীবসম্প্রদায়ের বৈচিত্র্য এবং বাস্তুতন্ত্র
2. একটি জীবসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রজাতিগত বৈচিত্র্য, একে স্পিসিস ডাইভারসিটি বলা হয়।
3. কোন বিশেষ প্রজাতির মধ্যে জীবগত বৈচিত্র্য, একে জেনেটিক ডাইভারসিটি বলা হয়।

1. জীবসম্প্রদায়ের বৈচিত্র্য এবং বাস্তুতন্ত্র

সজীব উপাদানের সমৃদ্ধির ফলেই একটি বাস্তুতন্ত্রে তার বৈশিষ্ট্যময় জীবসম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। উদাহরণস্বরূপ একটি পুকুরের ও একটি সমুদ্রের বাস্তুতন্ত্রের কথাই ধরা যাক। পুকুরে যে ধরনের জীব বাস করে তারা সমুদ্রের নোনা জলে বাস করতে পারে না। অপরপক্ষে সমুদ্রের নোনা জলের জীবকে পুকুরের জলে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব নয়। একটি রুই মাছ সমুদ্রের লে মরে যাবে। আবার হাঙর পুকুরের জলে বাস করতে পারবে না। বিশেষ বিশেষ বাস্তুতন্ত্রের সজীব ও অজীব উপাদানগুলি সেই বাস্তুতন্ত্রের জৈবিক সম্প্রদায়ের (Biotic community) জীবনধারণ প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে বিশেষ বিশেষ বাস্তুতন্ত্রে নির্দিষ্ট প্রকারের জীবসম্প্রদায়ের উপস্থিতি দেখা যায়।

2. একটি জীবসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রজাতিগত বৈচিত্র্য (Species diversity)

একটি বাস্তুতন্ত্রে কয়েকটি বিশেষ প্রজাতি বাস করতে পারে। এরা সংখ্যায় বহু। ঐ প্রজাতিগুলি একে অন্যের জীবন সহায়ক প্রক্রিয়ার (Life support system) অংশগ্রহণ করতে পারে এবং অজৈব উপাদানগুলির সঙ্গেও এদের আদানপ্রদান ঘটে। উদাহরণস্বরূপ, বৃষ্টি অরণ্যে (Rain forest) প্রজাতির প্রকরণ অত্যন্ত বেশী। এত প্রাণীবৈচিত্র্যে ভরা বনাঞ্চল পৃথিবীর বুকে অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। একে চিরহরিৎ অরণ্যও বলা হয়। চিরহরিৎ অরণ্যের প্রতি বর্গ কিলোমিটারে শত শত প্রজাতির বৃক্ষ দেখা যায়। আবার এই বৃক্ষরাজির মধ্যেই বাস করে হাজার হাজার প্রজাতির প্রাণী।

3. কোন বিশেষ প্রজাতির মধ্যে জীনগত বৈচিত্র্য (Genetic diversity)

একটি প্রজাতির জনসংখ্যায় বহু সংখ্যক সদস্য-জীব বাস করে। এদের মধ্যে বিভিন্ন জাতি, উপজাতি, বংশ ইত্যাদি থাকে। এইসব বিভাগগুলি প্রকৃতপক্ষে জীনগত কাঠামোর ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, কোন কোন ধান উচ্চফলনশীল। কোন কোন ধান আবার কম জলে অথবা স্বল্প সময়ে ফলনশীল। কোন কোন ধান পোকামাকড়ের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারে। এইসব চরিত্রই নির্ভর করে জীনগত বৈশিষ্ট্যের উপর। একেই জীনগত বৈচিত্র্য বলে। অর্থাৎ একটি প্রজাতির মধ্যে অবস্থিত একক প্রাণীসত্তার (individual) মধ্যে প্রাপ্ত জীনগত পার্থক্যই জীনগত বৈচিত্র্য। এই জীনগত বৈচিত্র্যের জন্যই একই প্রজাতিভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও আকৃতি অথবা প্রকৃতিগতভাবে, অথবা বিশেষত্বের দিক থেকে এক গোষ্ঠী অন্য গোষ্ঠীর থেকে সামান্য আলাদা।

7.4 জীববৈচিত্র্যের গুরুত্ব (Value of Biodiversity)

জীবমণ্ডল মানুষের নিকট একটি জীবন সহায়ক প্রক্রিয়া (Life support system)। এই জীবমণ্ডলে প্রত্যেক প্রজাতির একটি নির্দিষ্ট ভূমিকা আছে। এর কিছুটা প্রত্যক্ষ কিছুটা পরোক্ষ। প্রত্যক্ষই হোক বা পরোক্ষই হোক এই জীববৈচিত্র্য জীবমণ্ডলকে সুস্থিত রাখে। কিভাবে তা সম্ভব হয় নিম্নে তা আলোচনা করা হল ঃ

1. জীববৈচিত্র্য একটি মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ

একটি নির্দিষ্ট পরিবেশে প্রত্যেকটি প্রাণী এবং উদ্ভিদ পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। এদের মধ্যে একটি সুন্দর ও ভারসাম্য রক্ষাকারী সুস্থ আদানপ্রদান ব্যবস্থা বর্তমান। জীবের বৃদ্ধির ও বিকাশের জন্য অক্সিজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড ও নাইট্রোজেন ইত্যাদির প্রয়োজন হয়। এই সবই প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবন ও বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন হয়। প্রাণীরা কার্বন ডাইঅক্সাইড ত্যাগ করে। উদ্ভিদ তা আত্তীকরণ করে সালোকসংশ্লেষের মাধ্যমে। এভাবে বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত হয়। সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় জল জারিত হয়ে অক্সিজেন মুক্ত হয়। এই অক্সিজেন প্রাণীদের শ্বসনের জন্য অত্যন্ত জরুরী। এই ঘটনাকে জীবের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বলে। মানুষের নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই তাকে উদ্ভিদ ও প্রাণীজ সম্পদের উপর নির্ভর করতে হয়। মানুষ প্রায় 2500 প্রজাতির কৃষিজ উদ্ভিদের চাষ করে। এটি সমগ্র উদ্ভিদ প্রজাতির 10 শতাংশ মাত্র। মানুষের প্রয়োজনে ব্যবহৃত প্রাণীর সংখ্যা আরও কম। এই বিশাল সংখ্যক উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতি সৃষ্টি হতে প্রচুর সময় লেগেছে। প্রায় 600 কোটি বৎসর ধরে ধীরে ধীরে এইসব প্রজাতির সৃষ্টি হয়েছে। প্রকৃতিতে মাত্র 17.5 লক্ষ প্রজাতিকে সনাক্ত

করা গেছে। 1995 এর UNEP (United Nations Environment Programme, Global Biodiversity Assessment) এর সমীক্ষা অনুযায়ী নিম্নে একটি জীববৈচিত্র্যের তালিকা দেওয়া হল।

পৃথিবীর বুকে চিহ্নিত জীবসম্পদের তালিকা (1995)

	প্রজাতির নাম	*প্রজাতির সংখ্যা*
1	ভাইরাস	4 হাজার ধরনের
2	ব্যাক্টেরিয়া	4 হাজার ধরনের
3	ছত্রাক	72 হাজার ধরনের
4	প্রোটোজোয়া	40 হাজার ধরনের
5	শৈবাল	40 হাজার ধরনের
6	উদ্ভিদ	2 লক্ষ 70 হাজার ধরনের
7	নিমাটোড	25 হাজার ধরনের
8	কীটপতঙ্গ	9 লক্ষ 50 হাজার ধরনের
9	শামুক	70 হাজার ধরনের
10	মেরুদন্ডী প্রাণী	45 হাজার ধরনের
11	অন্যান্য	2 লক্ষ 30 হাজার ধরনের
	মোট জৈববৈচিত্র্যের সংখ্যা	17.5 লক্ষ ধরনের

এইসব বিশাল সংখ্যক প্রজাতির মাত্র কিছুটা অংশই মানুষের ব্যবহারযোগ্য হয়ে উঠেছে। একবিংশ শতাব্দীতেও মানুষ খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের জন্য এই প্রজাতিবৈচিত্র্যের উপরই নির্ভর করে। যদি সিঙ্কোনা গাছ কিংবা পেনিসিলিয়াম প্রজাতি আবিষ্কারের পূর্বেই বিলুপ্ত হত তবে বোধহয় মানবজাতির অস্তিত্বই সঙ্কটময় হয়ে উঠত। সুতরাং এটি সুনিশ্চিত যে প্রজাতিবৈচিত্র্য পৃথিবীর এক গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ।

2. জীববৈচিত্র্য একটি মূল্যবান জীনগত সম্পদ

প্রজাতি সৃষ্টি হয় জীনগত কারণে। ধরা যাক ধান। এই পৃথিবীতে ধানের অনেক প্রজাতি আছে। এগুলির কিছু বন্য প্রজাতি (Wild species) কিছু সংকর (Hybrid) পদ্ধতিতে তৈরী। কিন্তু সব ধানেরই জীনগত গঠন একে অপরের থেকে কিছুটা আলাদা। এদের মধ্যে কিছু ধান আছে যারা নিজেরাই বিশেষ জীনগত বৈশিষ্ট্যের কারণে নানা প্রকারের পোকামাকড় প্রতিহত করতে পারে। ঐ বিশেষ জীনগত বৈশিষ্ট্যটি যদি অন্য জাতের ধানে প্রতিস্তাপিত করা যায় তাহলে নতুন প্রজাতির ধানটিও ঐ সব পোকামাকড়ের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারবে। জীনগত বৈচিত্র্যের কারণেই এটি সম্ভব হয়।

কখনও কখনও দেখা যায় যে একই ক্ষেতে একই প্রজাতির (জীনগত) ধান চাষ করলে ঐ ফসলে বিসেষ ধরনের রোগ পোকার আক্রমণ ঘটে। বিশেষজ্ঞদের মতে ঐ ক্ষেতে যদি অন্য প্রজাতির ধান চাষ করা যায় তবে ঐ বিশেষ ধরনের পোকামাকড় তার মেতন ক্ষতি করতে পারে না। এটি একমাত্র জীনগত বৈচিত্র্যের কারণেই সম্ভব। 1963 তে উত্তরপ্রদেশেই একটি বন্য প্রজাতির ধানের চাষ করে গ্রাসি ষ্টান ভাইরাসের হাত থেকে প্রায় 300 লক্ষ হেক্টর জমির ফলন বাঁচানো সম্ভব হয়েছিল। ভারতবর্ষেই প্রায় 20 প্রকারের জীনগত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বন্য প্রজাতির নিজেদের বাঁচাতে সক্ষম। বর্তমানে তাই সংকর প্রজাতির ধানের থেকে বন্য প্রজাতির ধান চাষ করার জন্যই পরামর্শ দেওয়া হয়। বায়োটেক্‌নোলজি বর্তমান বিজ্ঞানের একটি সম্ভাব্যপূর্ণ দিক। ঐ বায়োটেক্‌নোলাজর সাহায্যে কোন প্রজাতির অনিষ্টকারী জীনকে সুস্থ জীনদ্বার প্রতিস্থাপন করে সুস্থ নীরোগ প্রজাতির উদ্ভব সম্ভব হচ্ছে।

ইন্দোনেশিয়ায় *Saccharum spontancum* নামক এক প্রকারের গাছ পাওয়া যায় যাতে একটি বিশেষ ধরনের জীন পাওয়া যায়। এই জীনটি আখের রেড রট (Red rot) রোগ প্রতিহত করতে পারে। ঐ জীনটি যদি আগে প্রতিস্থাপিত করা যায় তবে রেড রট রোগের হাত থেকে আখের ফলন বাঁচানো সম্ভব। এটি পৃথিবীতে জীনগত বৈচিত্র্যের কারণে সম্ভব। উত্তরপ্রদেশে একপ্রকারের তরমুজের পাউডারী মিলুড্য নামক রোগ প্রতিহত করার ক্ষমতা আছে।

জীনগত বৈচিত্র্য আবার মিউটেশনঘটিত কারণেও সম্ভব। মিউটেশন একটি জীনের মধ্যে এমন পরিবর্তন ঘটায় যে তা অন্য জীনে রূপান্তরিত হয়। মশা ম্যালেরিয়ার জীবাণু বহন করে সংক্রমণ ঘটায়। গত বিশ্বযুদ্ধের সময় DDT স্প্রে করে মশককূল ধ্বংস করা শুরু হয়েছিল; কিন্তু দীর্ঘদিন DDT ব্যবহারের কারণে মশার জীনে এমন পরিবর্তন ঘটল যে বর্তমানে DDT দিয়ে আর মশা মারা সম্ভব হচ্ছে না। বর্তমানে তাই ম্যালেরিয়াও পূর্ণ উদ্যমে ফিরে আসছে। মিউটেশন পদ্ধতিতে এই জীনের পরিবর্তন ঘটেছে।

সুতরাং দেখা যায় যে জীনগত বৈচিত্র্যও পৃথিবীর এক বিশাল সম্পদ।

3. জীববৈচিত্র্য বাস্তুতন্ত্রকে সুস্থিত ও স্বাস্থ্যকর রাখে

একটি বাস্তুতন্ত্রের প্রত্যেকটি জীব পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। বাস্তুতন্ত্রে যেমন জৈব ও অজৈব পদার্থ পরস্পরের সহায়তায় বাঁচে তেমনি প্রত্যেকটি প্রজাতি প্রত্যেকটি প্রজাতির উপর প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে নির্ভর করে। বাস্তুতন্ত্রে জীবগোষ্ঠী খাদ্যশৃঙ্খল দ্বারা পরস্পরের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। আমাদের বাস্তুতন্ত্র অসংখ্য আন্তঃসম্পর্কযুক্ত খাদ্যশৃঙ্খল দ্বারা গঠিত। বাস্তুতন্ত্রের বিভিন্ন খাদ্যশৃঙ্খলের আন্তঃসহযোগেই গড়ে ওঠে খাদ্যজালিকা (Food web)।

বাস্তুতন্ত্রের সুস্থিরতা বজায় রাখে এই খাদ্যজালিকাই। একই খাদ্যশৃঙ্খলের (Food chain) যে কোন খাদক (Consumer) প্রাণীর একাধিক জীব খাদ্য হতে পারে। যেমন তৃণভূমির একটি খাদ্যজালে 5টি খাদ্যশৃঙ্খল দেখা যায়।

1. ঘাস — ঘাস ফড়িং — বাজপাখী
2. ঘাস — ঘাস ফড়িং — গিরগিটি — বাজপাখী
3. ঘাস — খরগোস — বাজপাখী
4. ঘাস — ইঁদুর — বাজপাখী
5. ঘাস — ইঁদুর — সাপ — বাজপাখী

এর মধ্যে কোন একটি প্রজাতি অবলুপ্ত হলে সেই খাদ্যশৃঙ্খলে সাময়িকভাবে অসাম্য বটে। কিন্তু অন্যানা খাদ্যশৃঙ্খল সেই খাদ্যজালিকাকে সচল রাখে। অর্থাৎ যদি গিরগিটি প্রজাতির অবলুপ্তি ঘটে তবে 2 নং খাদ্যশৃঙ্খল বিঘ্নিত হয়। যেহেতু ঐ খাদ্যজালিকার অন্যান্য খাদ্যশৃঙ্খল বর্তমান তাই খাদ্যশৃঙ্খল খাদ্যজালিকাকে সচল রাখে। বাস্তুতন্ত্রে বহু প্রজাতির উপস্থিতি একটি প্রজাতির অবলুপ্তির পরিপূরক হিসাবে কাজ করে। কারণ বিকল্প যে সব প্রজাতি খাদ্যজালিকায় বর্তমান তারাই ঐ খাদ্যজালিকার ধারাকে অব্যাহত রাখতে সাহায্য করে। এটি প্রজাতিবৈচিত্র্যের অন্যতম সুফল। কিন্তু যদি একটি মাত্র খাদ্যশৃঙ্খল থাকত তাহলে ঐ তৃণভূমির খাদ্যজালিকা ব্যাহত হতো। ফলে ঐ সব অঞ্চলের বাস্তুতন্ত্রও সুস্থির থাকত না (চিত্র নং 1)। খাদ্যজালিকা যত সরল হয় ততই বাস্তুতন্ত্রের সুস্থিরতা কমে। পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনের কথাই ধরা যাক। সুন্দরবনে ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদই ঐ অঞ্চলের বাস্তুতন্ত্রকে সুস্থির রাখে। ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ নোনা জলে জন্মালেও নূতন গাছ জন্মাবার জন্য একটি বিশেষ প্রকারের জলের প্রয়োজন হয় যাতে মিষ্টিজলের পরিমাণটাই বেশী থাকে। বিভিন্ন নদী বিশেষতঃ গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, পদ্মা ইত্যাদি নদীগুলি থেকে মিষ্টি জল বাহিত হয়ে জলে নুনের পরিমাণ সীমিত রাখে। কিন্তু বর্তমানে দুটি কারণে এই ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল হ্রাস পাচ্ছে। (1) কাঠের জন্য নির্বিচারে গাছ কাটা হচ্ছে। (2) নদীগুলিতে বিভিন্ন জায়গায় বাঁধ দিয়ে জল ধরে রাখার ফলে নদীগুলির নাব্যতা হ্রাস পাচ্ছে। ফলে নদীবাহিত সুমিষ্ট জলের পরিমাণও প্রভূত পরিমাণে কমে গেছে। সুমিষ্ট জলের অভাবে নতুন গাছও জন্মাচ্ছে না, আবার পুরানো গাছগুলিও নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে 1947-48 সালে সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলের আয়তন ছিল। 1750 বর্গ মাইল। 1998 তে এই অঞ্চলের আয়তন কমে গিয়ে 1630 বর্গ মাইলে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে এই বনাঞ্চল আরও হ্রাস পেয়েছে। বনাঞ্চল হ্রাসের কারণে ভূমিক্ষয় হয়েছে এবং মোহনার গভীরতা

কমে যাওয়ার দরুন ঐ অঞ্চলে মাছের চাষ ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সর্বোপরি জোয়ারের সময় নোনা জল ক্ষেতজমিতে ঢুকে পড়ে মাটির pH নষ্ট করে দিচ্ছে। ফলে চাষবাসও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

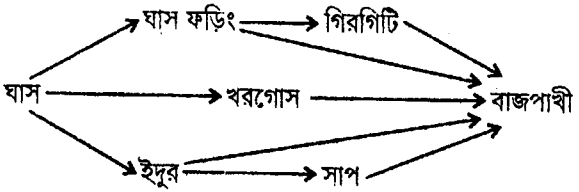

চিত্র নং 1 : তৃণভূমির একটি খাদ্যজালক

এই ম্যানগ্রোভ অরণ্য বিশাল প্রজাতিবৈচিত্র্যের আবসস্থল। অরণ্য ধ্বংস হবার ফলে সুন্দরবনের প্রজাতিবৈচিত্র্য হ্রাস পাচ্ছে। ফলে ঐ অরণ্যের বাস্তুতন্ত্র বিঘ্নিত হচ্ছে। ম্যানগ্রোভ অরণ্য কমে যাওয়ায় প্রাকৃতিক আবহাওয়ারও বিশেষ পরিবর্তন ঘটছে। বিষয়টা এখনও তত ভয়াবহ আকারে বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু এখনো যদি ঐ ম্যানগ্রোভ অরণ্য সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা না নেওয়া যায় তবে অদূর ভবিষ্যতে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্বও সঙ্কটের মুখে পড়বে।

আমেরিকার চেসপেক উপসাগরে একপ্রকার ঝিনুক বাস করে। তারা জলশোধন করতে সক্ষম। একসময় তাদের সংখ্যা এত বেশী ছিল যে মাত্র 3 দিনেই ঐ উপসাগরের জল শোধিত হত। বর্তমানে প্রজাতির সংখ্যা প্রায় 77 শতাংশ কমে গেছে। এখন ঐ উপসাগরের জল শোধিত হতে প্রায় বৎসরাধিক কাল সময় লাগছে।

ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানে ব্যাঙের প্রজাতি ভীষণভাবে কমে যাচ্ছে। ব্যাঙ, মশা, মাছি ইত্যাদির শূককীট খায়। মশার সংখ্যা নিয়ন্ত্রণে ব্যাঙ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বর্তমানে ক্ষেতে বিভিন্ন রকমের রাসায়নিক কীটনাশক প্রয়োগের ফলে ঐ ব্যাঙের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। ফলস্বরূপ ম্যালেরিয়ার পুনরায় মহামারীরূপে বিস্তারলাভের সুযোগ পাছে (Ryan, 1991)।

উপরোক্ত বিষয় থেকে একথা স্পষ্ট যে প্রকৃতিতে কোন প্রাণী বা উদ্ভিদের গুরুত্বই কম নয়। বাস্তুতন্ত্র সুস্থির রাখতে প্রত্যেকটি প্রাণীরই গুরুত্ব অপরিসীম।

4. **জীববৈচিত্র্য বাস্তুতন্ত্রকে অজৈব উপাদানগুলিকে অধিক ব্যবহারের উপযোগী করে তোলে**

উষ্ণ ও আর্দ্র অঞ্চলই হল জীববৈচিত্র্যের আধার। আর্দ্র পরিবেশে জৈববস্তুর পচন ত্বরান্বিত হয় এবং তার ফলে প্রচুর পরিপোষক (mutrient) উৎপাদন হয়। ছোট ও বড় উদ্ভিদরা এবং ক্ষুদ্র জীবাণু সম্প্রদায় ঐ পরিপোষকই গ্রহণ করে। ফলে মৃত্তিকাতে জৈব পচনের প্রভাব খুব

কম পড়ে। এর ফলে মৃত্তিকার গুণগত মান বৎসরের পর বৎসর ধরে সুস্থিত থাকে। যদি উদ্ভিদ ও জীবাণু সম্প্রদায় না থাকত তাহলে মৃত্তিকার মানের অবনতি ঘটে বাস্তুতন্ত্র সুস্থিরতা হারাত। 1970 সালে ব্রাজিল সরকার আমাজন অববাহিকায় জঙ্গল কেটে চাষ আবাদ করার পরিকল্পনা নিয়েছিল। বাস্তবে দেখা গেল যে ফসলের পর ফসল নষ্ট হল এবং ঐ অঞ্চলের ভূমিক্ষয় বেড়ে গেল। বাধ্য হয়ে সরকারকে আবার বনসৃজন যোজনা নিতে হয়।

5. **ধর্মীয় ও সামাজিক গুরুত্ব**

সমাজে বিভিন্ন ধরনের প্রাণী ও উদ্ভিদের স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেমন, সাঁওতাল আদিবাসীরা দেবতাজ্ঞানে সালগাছকে পূজো করে। হিন্দুরা গোমাতার পূজো করে। আবার ধর্মীয় ও সামাজিক আচরণে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদের পাতা যথা বেল, তুলসী, নিম ইত্যাদির গুরুত্ব থাকে। বট, অশ্বত্থ প্রভৃতি গাছ প্রতিষ্ঠা করার সংবাদও সংবাদপত্রে পাওয়া যায়। এছাড়া বিভিন্ন ধর্মের দেবদেবীদের বিশেষ বিশেষ বাহনরূপে পশুপাখীর অস্তিত্ব দেখা যায়। এসবই প্রাণী ও উদ্ভিদের সঙ্গে মানুষের নিবিড় সম্পর্কের কথাই ঘোষণা করে।

6. **ঔষধ হিসেবে জীববৈচিত্র্যের গুরুত্ব**

ভগবান বুদ্ধের সময় জীবক নামে একজন বিখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন। গল্পে আছে যে তিনি যখন তার বিদ্যা সমাপ্ত করেন তখন তাঁর গুরুদেব গুরুদক্ষিণা হিসেবে নিকটবর্তী অরণ্য থেকে তাঁকে এমন একটি গাছ তুলে আনতে বলেন যার কোন ঔষধুগুণ নেই, তিনি অরণ্য থেকে শূন্যহাতে ফিরে এলে তাঁর গুরুদেব অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। জীববৈচিত্র্যের কারণে সৃষ্ট প্রায় প্রত্যেকটি গাছই ঔষধিগুণে গুণী। তার কিছু আমাদের জ্ঞাত, কিছুবা অজ্ঞাত। এই সংক্রান্ত বিদ্যাকে বলা হয় এথনোবায়োলজি (Ethnobiology)।

7. **শিক্ষা ও বাণিজ্য**

অর্থনীতিতে প্রাণী ও উদ্ভিদের গুরুত্ব অপরিসীম। যে সব দেশ জীব বৈচিত্র্যে ভরপুর তারা প্রজাতির কাঠ, প্রাণীজ মাংস, মাছ ইত্যাদি অন্য দেশে রপ্তানী করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। এছাড়াও বিভিন্ন শিল্পে বিভিন্ন গাছপালা ব্যবহৃত হয় যেমন কাগজশিল্প। প্রাণীজ চামড়ার শিল্পও গড়ে উঠেছে। এগুলি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সহায়ক। ভারতবর্ষের বিভিন্ন গাছগাছড়া থেকে তৈরী ভেষজ ঔষধ আমেরিকায় বিক্রি হয় বছরে প্রায় 1500 কোটি ডলারের বেশী। শুধুমাত্র নয়তারা থেকে ক্যানসারের দুটি ঔষধ ভিনক্রিসটিন ও ভিনব্লাসটিন বিক্রি করে বছরে প্রায় 10 কোটি ডলারের আয় হয়।

7.5 মহাবৈচিত্র্যের স্থানসমূহ (Mega Diversity Zones)

উষ্ণ এবং আর্দ্র আবহাওয়া জীববৈচিত্র্যের পক্ষে অনুকূল। কর্কটক্রান্তিরেখা ও মকরক্রান্তি রেখার মধ্যবর্তী বলয়ে জীববৈচিত্র্যের আধিক্য দেখা যায়। পৃথিবীর অর্ধেকের বেশী জীববৈচিত্র্যের সন্ধান এই অঞ্চলেই পাওয়া যায়। তাই এই অঞ্চলকে মহাবৈচিত্র্যের দেশ বলা হয়। এই অঞ্চলের উষ্ণতা 25°C থেকে 35°C মধ্যে বিরাজ করে। দিন ও রাতের তাপমাত্রায়ও বিশেষ তফাৎ থাকে না। এই পরিবেশ প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবনধারণের জন্য সর্বাধিক উপযোগী। এই অঞ্চলেই বিষুবরেখা বরাবর উষ্ণমণ্ডলের গভীর অরণ্য দেখা যায়। এর নাম ট্রপিক্যাল রেইন ফরেস্ট (Tropical rain forest) পৃথিবীর বুকে এত বড় জীববৈচিত্র্যের ভরা বনাঞ্চল আর কোথাও পাওয়া যায়না। দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর অংশ, ভারত, শ্রীলঙ্কা, বোর্ণিও দ্বীপের ঘন অরণ্য, আফ্রিকার বিস্তৃত অঞ্চল এই জাতীয় অরণ্যের অন্তর্গত। বছরে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রায় 100-160 ইঞ্চি। এই অঞ্চলে বড় বড় সবুজ পাতাওয়ালা, মোটা গুড়িযুক্ত প্রচুর গাছ জন্মায়। এখানে স্বল্প অরণ্যভূমিতেই প্রচুর প্রজাতির উপস্থিতি দেখা যায়। রাশিয়া, ইউরোপের উত্তরাঞ্চল, উত্তর কানাডা ও আলাস্কায় মাত্র 12টি প্রজাতির উদ্ভিদ পাওয়া যায়। সীমিত জলবায়ু অঞ্চল যথা আমেরিকার 20 থেকে 35 প্রজাতির উদ্ভিদের সন্ধান মেলে। কিন্তু পানামার উষ্ণ আর্দ্র অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত কম আয়তনের বনভূমিতেই 110 টি প্রজাতির উদ্ভিদ পাওয়া যায়। প্রাণীবৈচিত্র্যের ক্ষেত্রেও এই ধারা অব্যাহত। কানাডায় 22 ধরনের সাপ আমেরিকায় 126 প্রজাতি ও মেক্সিকো 295 প্রজাতির সাপের সন্ধান পাওয়া গেছে। ইন্দোনেশিয়ায় 10 হেক্টর জমিতে প্রায় 700 প্রজাতির উদ্ভিদ পাওয়া গেছে। 1992-তে Ryan-Johon এর তথ্য অনুযায়ী নিম্নে মহাবৈচিত্র্যের দেশসমূহের নাম ও পৃথিবীর জমির তুলনায় জমির আনুপাতিক হার ও শুধুমাত্র সপুষ্পক উদ্ভিদের একটি তালিকা দেওয়া হল।

দেশের নাম	পৃথিবীর জমির তুলনায় জমির আনুপাতিক হার	সপুষ্পক উদ্ভিদের প্রজাতির সংখ্যা
ব্রাজিল	6.3	55,000
কলম্বিয়া	0.8	45,000
মেক্সিকো	1.4	25,000
অষ্ট্রেলিয়া	5.7	22,500
ইন্দোনেশিয়া	1.4	20,000
পেরু	1.0	20,000
মালয়েশিয়া	0.2	15,000
ইকুয়েডর	0.2	15,000
ভারত	2.2	15,000
জাইরে	1.7	10,000
মাদাগাস্কার	0.4	10,000

জীববৈচিত্র্যের প্রাচুর্যে ভরা 1,700 মিলিয়ন ট্রপিক্যাল অরণ্যই দরিদ্র দেশগুলিতে অবস্থিত। এইসব অরণ্যের মাত্র 7 শতাংশ ডাঙ্গা জমি (Land surface)। কিন্তু এই 7 শতাংশ জমিতেই পৃথিবীর প্রাণী এবং উদ্ভিদসমূহের অর্ধশতাংশই পাওয়া যায়। ব্রুনেইর জঙ্গলে প্রায় 700 অপরিচিত বৃক্ষের প্রজাতি আছে। এইসব অরণ্য নির্বিচারে ধ্বংস করার ফলে প্রায় 5000 অমেরুদন্ডী প্রাণী প্রজাতি (Animal species) লুপ্ত হয়ে গেছে এবং প্রায় 140 টি প্রজাতি প্রতিদিন অবলুপ্তির কবলে পড়েছে।

7.6 ভারতবর্ষের জীববৈচিত্র্যময় স্থানগুলির উল্লেখ

জীববৈচিত্র্যের নিরিখে ভারতবর্ষের স্থান অনেক উঁচুতে। বাস্তুতন্ত্রের মাপকাঠিতে, প্রজাতি অথবা জীনগতবৈচিত্র্যের সম্ভারে ভারতবর্ষ অত্যন্ত সমৃদ্ধ। ভারতবর্ষ তিনটি জীবভৌগোলিক অঞ্চলের (realm) এর সমন্বয়। (1) ইন্দোমালয়ান, (2) ইউরেশিয়ান এবং (3) আফ্রোট্রপিক্যাল। এই তিন অঞ্চলের (realm) এর সংযোগ ঘটায় ভারতবর্ষের জীববৈচিত্র্য অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠেছে। ভারতের উদ্ভিদ সম্পদ প্রায় 45,000 প্রজাতির, অর্থাৎ সমগ্র পৃথিবীর উদ্ভিদ সম্পদের প্রায় 12 শতাংশই ভারতে পাওয়া যায়। এর 33 শতাংশ কেবলমাত্র ভারতীয় প্রজাতি (endemic species)। এর মধ্যে 5,000 শৈবালজাতীয়, 1,600 ব্রায়োফাইটা, 600 টেরিডোফাইটা এবং 15,000 সপুষ্পক উদ্ভিদ। ভারতবর্ষের জৈববৈচিত্র্যের একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হল। তালিকাটি 1991এ পরিবেশবিদ্ S.S. Negi দ্বারা প্রকাশিত।

ভারতবর্ষের জৈববৈচিত্র্যের সংখ্যা, 1991

প্রজাতির নাম	*প্রজাতির সংখ্যা*
উদ্ভিদ	45 হাজারের ধরনের
স্তন্যপায়ী প্রাণী	340 ধরনের
সরীসৃপ	420 ধরনের
উভচর	2 হাজার ধরনের
মাছ	16.93 ধরনের
কীটপতঙ্গ	67 হাজার ধরনের
শামুক	4 হাজার ধরনের
পাখী	1200 ধরনের
অন্যান্য অমেরুদন্ডী প্রাণী	6800 ধরনের

ভারতবর্ষের যে সমস্ত অঞ্চল প্রজাতি বৈচিত্র্যে ভরপুর নিম্নে তা নিয়ে আলোচনা করা হল।

1. **থর মরুভূমি ঃ** এই অঞ্চলটি মরুস্থানের মধ্যে প্রজাতিবৈচিত্র্যে ভরা। এখানকার ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য কিছু সাহারা জাতীয় প্রাণী পাওয়া যায়। [যেমন *Holoxylon, Gazetta dorcas*]। কিছু মালয় প্রজাতির [যেমন *Ficus, Mangifea, Petrocorpus giganticus*] এবং কিছু দাক্ষিণাত্য প্রজারি [যেমন *Rathus cutchicus,Golunda illioti*]

2. **জলদাপাড়া অভয়ারণ্য ঃ** পশ্চিমবঙ্গের এই অঞ্চলটি প্রাণীবৈচিত্র্যে ভরপুর। এখানেই একমাত্র ভারতের একশৃঙ্গ গণ্ডার *(Rhinoceros unicornis)* পাওয়া যায়।

3. **সুন্দরবন ঃ** এটি একটি বিশাল অরণ্যভূমি। আয়তন প্রায় দশ হাজার বর্গ কিলোমিটারের উপর। পশ্চিমবঙ্গে সুন্দরবনের আয়তন 4264 বর্গ কিলোমিটার। নদীর মোহনায় এই ঈষৎ নোনা জলের অরণ্যে যে বিশেষ বিশেষ গাছ পাওয়া যায় তা দেশের আর অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। ভোরা *(Rhizophora apiculata* এবং *R. mucronata),* গরান *(Ceriops decandra ; C. tagah),* কেওড়া *(Sonneratia apelata; S. caseolaris),* হেঁতাল *(Phoenix Paludosa),* গোলপাতা *(Nipa fruitcans)* প্রজাতির বৃক্ষ প্রচুর জন্মোয়। প্রাণীদের মধ্যে গোসাপ, কুমীর, ঘড়িয়াল, কচ্ছপ, গোলিয়াথ হেরন (বক জাতীয়), ফিডলার ক্র্যাব, হারমিট ক্র্যাব বা সন্ন্যাসী কাঁকড়া, অশ্বক্ষুর-কাঁকড়া বা লিমুনাস ইত্যাদি, এই লিমুনাস হল জীবন্ত জীবাশ্ম *(Carcinoscorpius sp ; Tachypleaus gigus)*। এছাড়াও মাডস্কিপার নামক এক ধরনের মাছ পাওয়া যায় যাদের জৈবঘড়ি বলা হয়। এরা জোয়ারের সময় জলে নামে ও ভাঁটার সময় ডাঙ্গায় উঠে আসে। এদের পুকুরের জলে ছেড়ে দিলেও দেখা যায় যে গঙ্গার জোয়ার আসার সময়েই এরা নামে।

4. **বন্দীপুর সংরক্ষিত অরণ্য ঃ** মহীশূরের জিকা অবস্থিত এখানে ভারতীয় বাইসন বা গাউর বিখ্যাত।

5. **গির সংরক্ষিত অরণ্য ঃ** এই অরণ্য সিংহ প্রজাতির জন্য বিখ্যাত।

6. **কাজিরাঙা সংরক্ষিত অরণ্য ঃ** এটিও হাতী ও একশৃঙ্গ গণ্ডারের জন্য বিখ্যাত।

7. **হিমালয় অরণ্য ঃ** এই অরণ্যের দৈর্ঘ্য প্রায় 2400 কিলোমিটার, প্রস্থ প্রায় 160-450 কিলোমিটার। এই অরণ্যের বয়স দুই থেকে আড়াই কোটি বৎসর। এই অরণ্যে উদ্ভিদসম্পদ ও প্রাণীসম্পদ অতুলনীয়। বহু দুর্লভ প্রজাতির পাখি, সরীসৃপ, কীটপতঙ্গ ও স্তন্যপায়ী প্রাণীর অবস্থান এই অঞ্চলেই। হিমালয়ের পাদদেশের অরণ্যে বাঘ, হাতি, বন্য বরাহ ইত্যাদি পাওয়া যায়। চিতল হরিণ, কৃষ্ণসার, কস্তুরী মৃগ, হায়না, বনবিড়াল এই অরণ্যেই পাওয়া যায়। করবেট পার্ক অঞ্চলে বাঘ সংরক্ষণ করা হয়।

   হিমালয়ের উচ্চ অঞ্চলে হিমালয় ভল্লুক, লোমে ঢাকা চমরী গাই বিখ্যাত। এই হিমালয় অরণ্যেই তিন হাজারের ওপর এমন সব প্রজাতি পাওয়া যায় যা পৃথিবীর অন্য কোথাও পাওয়া যায়

না। এগুলিকে এণ্ডেমিক প্রজাতি বলে। এব মধ্যে রডোডেন্ড্রন, প্রাইমুলা, জেনসিয়ানা, নানা জাতের অর্কিড, মস্, লাইকেন, ফার্ন ইত্যাদি বিখ্যাত। বিরাট আকৃতির ফার্নগাছ (Ginko biloba জিনগো বাইলোবা) হল জীবন্ত জীবাশ্ম। হিমালয়ের বুকে ভ্যালী অব ফ্লাওয়ার্স নামে একটি উপত্যকা আছে। সেখানেও প্রচুর এন্ডেমিক প্রজাতি পাওয়া যায়। এখানেই হিমালয়ের আশ্চর্য ফুল ব্রহ্মকমল (*Suassurca obvallata*) পাওয়া যায়।

হিমালয়ের শিবালিক পর্বতমালায় বিপুল সংখ্যক প্রাণীর ফসিল (জীবাশ্ম) আবিষ্কৃত হয়েছে। পৃথিবীর আর কোথাও এত বিপুলসংখ্যক স্তন্যপায়ী প্রাণীর জীবাশ্ম পাওয়া যায়নি। এখানেই 1932 খ্রীষ্টাব্দে 'রামপিথোকস' নামক মনুষ্যজাতীয় প্রাণীর জীবাশ্ম আবিষ্কৃত হয়। এই রামপিথেকাসকেই পৃথিবীর প্রাচীনতম মানুষ অষ্ট্রলোপিথেকাসের পূর্বপুরুষ মনে করা হয়। প্রায় আনুমানিক 40 লক্ষ বৎসর পূর্বে এরা এই অঞ্চলে বসবাস করত বলে মনে করা হয়।

8. **সাইলেন্ট ভ্যালী ঃ** কেরলে অবস্থিত পশ্চিমঘাট পর্বতমালার এই অংশ প্রাচীন ফনার (Fauna) জন্য বিখ্যাত। এই অঞ্চলও জীববৈচিত্র্যের আধার এখানে প্রচুর এন্ডেমিক ফ্লোরা (flora) এবং ফনা (Fauna) পাওয়া যায়।

9. **নীলগিরি পর্বতমালার বৃষ্টি অরণ্য ঃ** পশ্চিমঘাট পর্বতমালার এই বৃষ্টি অরণ্য (Rain forest) জৈববৈচিত্র্য ভরা একটি স্থান। মস, ফার্ন, অর্কিড জাতীয় উদ্ভিদ এবং দারুচিনির জঙ্গল বিখ্যাত। হাতী, গাউর জাতীয় প্রাণীও এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য। উল্লুক, গিবন একমাত্র এপ (Ape), সোনালী লেঙুর লরিস (loris) বৃহদাকার কাঠবেড়ালী প্রভৃতি এখানকার উল্লেখযোগ্য ফনা (fauna)।

10. **আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ঃ** এই অঞ্চল অরণ্য ও প্রাণীজ সম্পদে ভরপুর, বিভিন্ন ধরনের হরিণ, সামুদ্রিক প্রাণীদের মধ্যে ডুগং (dugong), তিমি, ডলফিন, কাঁকড়াখেকো বানর ইত্যাদি বিখ্যাত। এখানে এক রকমের কাঁকড়া পাওয়া যায় যা নারকোল গাছে উঠে নারকোল ফাটিয়ে খেতে পারে।

সুতরাং একথা নিশ্চিত যে ভারতবর্ষ জৈববৈচিত্র্যের ক্ষেত্রে এক বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই জৈববৈচিত্র্যের বহু প্রজাতিই আজ বিলুপ্তির কবলে। নির্বিচারে অরণ্যধ্বংস, প্রাণীহত্যা এই বিশিষ্ট প্রজাতির বহু অংশীদারকে অবলুপ্তির পথে ঠেলে দিয়েছে। মানুষের লোভ এবং হিংসা ও বিবেচনাহীনতা এই সব প্রজাতির অবলুপ্তির বিশেষ কারণ। এইসব অবলুপ্তির কবলে পড়া প্রজাতি বাঁচাবার জন্য সরকারকে আইৰ প্রণয়ন করতে হয়েছে। বর্তমানে বিভিন্ন সংস্থা এই প্রজাতির সংরক্ষণে এগিয়ে এসেছে। এইসব প্রজাতির সংরক্ষণের দায় মনুষ্যসমাজের। মনুষ্যজাতি নিজেদের সুরক্ষার জন্যই প্রজাতিবৈচিত্র্যকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

7.7 সারাংশ

একটি বাস্তুতন্ত্রে সজীব বস্তুর (প্রাণী, উদ্ভিদ ও জীবাণু) উপস্থিতিকেই ঐ বাস্তুতন্ত্রের জৈববৈচিত্র্য বলে। এই জৈববৈচিত্র্য সব স্থানে একই রকমের হয় না। প্রত্যেকটি বাস্তুতন্ত্রের জৈববৈচিত্র্য তার পরিবেশ, জলবায়ু, তাপমাত্রা প্রভৃতির উপর নির্ভর করে। এই জৈববৈচিত্র্যও বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে। (1) বাস্তুতন্ত্রের বৈচিত্র্য, (2) প্রজাতির বৈচিত্র্য, (3) জীবগত বৈচিত্র্য। প্রজাতির বৈচিত্র্য ও জীনগত বৈচিত্র্য বাস্তুতন্ত্রের পরিবেশকে সুস্থ ও স্বাভাবিক রাখে। কারণ বাস্তুতন্ত্রের একটি প্রজাতি অন্য প্রজাতির সঙ্গে আদানপ্রদানের সম্পর্কের মধ্যে জড়িত থাকে। খাদ্য, বায়ু ও জলের মাধ্যমে এই প্রজাতিবৈচিত্র্য পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। খাদ্যজালিকা দ্বারা প্রজাতি বৈচিত্র্য একে অপরের সঙ্গে গভীরসূত্রে আবদ্ধ। খাদ্যজালিকা যত জটিল হয় ততই পরিবেশ সুস্থ এবং স্বাভাবিক থাকে। এই খাদ্যজালিকার একটি প্রজাতির বিলুপ্তি ঘটলেও অন্য সকল প্রজাতি বিকল্প খাদ্যের জোগান দিয়ে খাদ্যজালিকার ভারসাম্য বজায় রাখে।

আবার জীবগত বৈচিত্র্যের উপরও পরিবেশের সুস্থতা নির্ভর করে। এই জীবগত বৈচিত্র্য থাকার জন্যই সংকারায়ন ঘটিয়ে নতুন উন্নত প্রজাতির ধান, গম ইত্যাদি ফসল পাওয়া যায়, এমনকি বিভিন্ন রোগ নিরাময়েও এই জীনগত বৈচিত্র্য একটি বিশেষ স্থানের অধিকারী। বায়োটেক্‌নোলোজির (Biotechnology) সাহায্যে এই জীববৈচিত্র্যকে মানুষ রোগ নিরাময়ের কাজে লাগাচ্ছে।

এই জীববৈচিত্র্য পৃথিবীর সব জায়গায় একরকম হয় না। আর্দ্র ও উষ্ণ পরিবেশ জৈববৈচিত্র্যের সহায়ক। পৃথিবীর কর্কটক্রান্তি ও মকরক্রান্তি রেখার মধ্যে অবস্থিত অঞ্চলগুলিই মহাবৈচিত্র্যের দেশ হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। ভারতবর্ষও এই মহাবৈচিত্র্যের অঞ্চলের মধ্যেই পড়ে। জৈববৈচিত্র্যের নিরিখে পৃথিবীতে ভারতের স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখানে প্রায় 45000 প্রজাতির উদ্ভিদ, 340 টি প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী, 1200 টি প্রজাতির পাখী পাওয়া যায়।

7.8 প্রশ্নাবলী

1. জৈববৈচিত্র্য কি? জৈববৈচিত্র্য ভাগগুলি বর্ণনা করুন।
2. মহাবৈচিত্র্যের দেশ বলতে কি বোঝায়?
3. মহাবৈচিত্র্যের নিরিখে ভারতবর্ষের জৈববৈচিত্র্যের আলোচনা করুন।
4. বৃষ্টি অরণ্য (Rain forest) কি? এই অরণ্য কোন্ পরিবেশে জন্মায়?
5. জৈববৈচিত্র্যের গুরুত্বগুলি বর্ণনা করুন।
6. সুন্দরবনের জৈববৈচিত্র্যের সম্বন্ধে আলোচনা করুন।

7.9 উত্তরমালা

1. 7.2 ও 7.3 অংশ দ্রষ্টব্য।

2. 7.5 অংশ থেকে পড়ে লিখুন।

3. 7.6 অংশ দেখুন।

4. 7.6 অংশ পড়ে উত্তর লিখুন।

5. 7.4 অংশ দ্রষ্টব্য।

6. 7.6 অংশের সুন্দরবন অঞ্চল দেখুন।

একক 8 ❑ পরিবেশ সম্পর্কে ধারণা

গঠন

8.1 প্রস্তাবনা

উদ্দেশ্য

8.2 পরিবেশ সম্পর্কে ধারণা

8.3 ভূতাত্ত্বিক অতীত এবং বর্তমান পরিবেশের বিবর্তন

8.3.1 পৃথিবীর উদ্ভব সম্পর্কিত বিভিন্ন মতামত

8.3.2 পৃথিবীর উৎপত্তি সংক্রান্ত বিভিন্ন ঘটনাবলী

8.3.3 পৃথিবীর গঠন সম্পর্কিত তথ্য

8.3.4 পৃথিবীর উপাদান

8.3.5 সমুদ্রে জীবনের উদ্ভবের সপক্ষে যুক্তি

8.3.6 পরিবেশ পরিবর্তনের ধারা

8.3.7 আজকের বায়ুমণ্ডলের সৃষ্টি

8.3.8 জীবের জন্ম ও বিবর্তন

8.3.9 ভূতাত্ত্বিক সময়-সারণী

8.4 উদ্ভিদ ও প্রাণীর মধ্যে সম্পর্ক

8.4.1 বাস্তব্যবিদ্যা ও বাস্তুতন্ত্র সম্পর্কে ধারণা

8.4.2 বাস্তুতন্ত্রের উপাদান

8.4.3 খাদ্যশৃঙ্খল, খাদ্য জালক, খাদ্য পিরামিড

8.4.4 বাস্তুতন্ত্রে শক্তিপ্রবাহ

8.4.5 বায়োম সম্পর্কে ধারণা

8.4.6 উদ্ভিদ ও প্রাণীর মিথোক্রিয়া বা আন্তর ক্রিয়া

8.5 মানুষের সমাজ ও পরিবেশ

8.5.1 মানুষের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক পরিবেশ

8.5.2 পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান ও মনুষ্য সমাজের দ্বারা তার ব্যবহার

8.5.3 পরিবেশ সম্পর্কে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি

8.6 সারাংশ

8.7 প্রশ্নাবলী

8.8 উত্তরমালা

8.1 প্রস্তাবনা ও উদ্দেশ্য

প্রস্তাবনা

সৃষ্টির আদিকাল থেকে পরিবেশের বিবর্তনের ধারা, তার উপাদান, মানব সভ্যতার ওপর তার প্রভাব এবং আগামী দিনের পরিবেশ ও জীবকূলের অস্তিত্ব আজ একটি অতি পরিচিত ও আলোচিত বিষয়। এ সম্পর্কে আমাদের কৌতূহল ও উৎসাহ অপরিসীম। পরিবেশ সম্পর্কে যেকোন ধারণার বিস্তার ন্যান্য অনেক বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত। যেমন, জীববিজ্ঞান, ভূতত্ত্ব, ভূবিদ্যা, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, সমাজ বিজ্ঞান ও অর্থনীতি। সেজন্য পরিবেশ বিদ্যাকে একটি আন্তঃ সম্পর্কের বিষয় বলা চলে। পরিবেশের মূল ধারণাকে বুঝতে হলে তার সৃষ্টি, বিবর্তনের ধারা, প্রাণি-উদ্ভিদের সম্পর্ক এবং সমাজ ও পরিবেশের পারস্পরিক বিন্যাসকে অনুধাবন করা গুরুত্বপূর্ণ।

উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি—

- পরিবেশ সম্পর্কে একটি প্রাথমিক ধারণা পাবেন।
- ভূতাত্ত্বিক সময়-সারণী অনুসারে প্রাণী-উদ্ভিদের উদ্ভব ও বিস্তার সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- বর্তমানের পরিবেশ এবং তার অতীত সম্পর্কে একটি ধারণা পাবেন।
- উদ্ভিদ ও প্রাণীর পারস্পরিক সম্পর্ক ও তাদের গুরুত্ব সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- পরিবেশ ও সমাজের সম্পর্ক সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট ধারণা পাবেন।

8.2 পরিবেশ সম্পর্কে ধারণা

পরিবেশ হলো বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ অবস্থা সমূহের সমষ্টি, যা জীবকূলের অস্তিত্ব বৃদ্ধি ও কল্যাণকে প্রভাবিত করে। S.C. Kendeigh (1974) এর মতে, পরিবেশ হল জীবের পারিপার্শ্বিক সজীব, জৈব, ভৌত ও রাসায়নিক উপাদান যা জীবের উপর প্রভাব বিস্তার করে। এক কথায়, নির্দিষ্ট স্থানে ও কালে মানুষের চারপাশের অবস্থা সমূহের সামগ্রিকতাকে পরিবেশ বলে। অক্সফোর্ড অভিধানের বলা হয়েছে, পরিবেশ হল উদ্ভিদ ও প্রাণিজগতের ওপর প্রভাব বিস্তারকারী বাহ্যিক অবস্থা সমূহের সমষ্টি। পরিবেশ সুরক্ষা আইনের (১৯৮৬) ২ (ক) ধারায় বলা হয়েছে, পরিবেশ হল জল, বায়ু, ভূমিতে বসবাসকারী বিভিন্ন প্রাণি, উদ্ভিদ ও অণুজীবের মধস্থিত আন্তঃসম্পর্ক।

সাম্প্রতিককালে পরিবেশ সম্পর্কে সাধারণভাবে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় স্তরে বহু বিষয়ে আলোচনা, বিতর্ক চলছে এবং একই সঙ্গে বিভিন্ন আশঙ্কাও জন্ম নিচ্ছে। পরিবেশ নির্দিষ্টভাবে কোনো একটি বিশেষ বিষয়ের ভাবনা নয়, বরং বহু সম্পর্কিত বিষয়—যেমন, জৈবিক, রাসায়নিক, সামাজিক, ভূতাত্ত্বিক ও নানা প্রাকৃতিক উপাদানই এই বিষয়ের মূল কেন্দ্রবিন্দু। পরিবেশ সম্পর্কিত আলোচনা ইদানিংকালে বৃদ্ধি পাওয়ার মূল কারণ এই যে, পরিবেসের উপাদানসমূহ আশঙ্কাজনকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে এবং তার ফলে মানব সভ্যতার অস্তিত্বই আজ বিপন্ন। পরিবেশের মূলতত্ত্বগত দিকগুলি সৃষ্টির সেই আদি থেকে তার নিজস্ব নিয়মে চালিত হয়েছে। জৈবিক বিবর্তনের হাত ধরে সৃষ্টি হয়েছে মানুষ। মানুষের বৃদ্ধির উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে এসেছে কৃষি ও শিল্প বিপ্লব। ঠিক এই সময় থেকেই পরিবেশের গুণগত অবনমন সংগঠিত হয়েছে ক্রমাগত। যার ফলে বিপন্ন হয়েছে জৈব-বৈচিত্র্য, বাতাস, জল, মাটি ও মানুষের অস্তিত্ব। সাধারণভাবে পরিবেশ সম্পর্কে যে কোনো পাঠের পূর্বে জেনে নেওয়া দরকার তার উপাদানের বিভিন্ন ধারার অভিমুখের কথা। ধারাগুলি হল—

(১) **প্রাকৃতিক বা ভৌগোলিক পরিবেশ ঃ** জল, মাটি, বায়ু, প্রাকৃতিক বাসভূমি বা বসতি প্রভৃতি প্রাকৃতিক বা ভৌগোলিক পরিবেশের অন্তর্গত।

(২) **জৈব পরিবেশ ঃ** এই পরিবেশ সজীব ও জড় এই দুই প্রকারের হয়।

সজীব পরিবেশের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের প্রাণী, উদ্ভিদ ও অণুজীব (Microbes) প্রভৃতি।

জড় পরিবেশের অন্তর্গত হল বায়ুপ্রবাহ, তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, জলস্রোত, অক্সিজেন (O_2), কার্বনডাই অক্সাইড (CO_2) প্রভৃতি বিভিন্ন গ্যাস, জল, মাটি এবং ফেরাস (Fe), ক্যালসিয়াম (Ca), পটাশিয়াম (K), সালফার (S) প্রভৃতি বিভিন্ন ধাতু।

(৩) **অপ্রাকৃতিক পরিবেশ ঃ** ভূচৌম্বকশক্তি, সৌরকিরণ, বায়ুচাপ প্রভৃতি এর অন্তর্গত।

(৪) **কৃত্রিম পরিবেশ ঃ** মানুষ নিজের প্রয়োজনে প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগিয়ে যে পরিবেশ সৃষ্টি করে তাকে কৃত্রিম পরিবেশ বলে। কৃত্রিম পরিবেশকে আবার নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা যায়।

(৫) **সামাজিক পরিবেশ ঃ** পরিবার, সামাজিক যোগাযোগ, সংস্কৃতি, কৃষ্টি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অর্থনৈতিক কাঠামো, রাজনৈতিক অধিকার বা ক্ষমতা, সামাজিক রীতিনীতি, আন্দোলনের পরিবেশ, আর্থসামাজিক পরিবেশ-এর অন্তর্গত।

(খ) **অর্থনৈতিক পরিবেশ ঃ** এটি উন্নত, অর্ধোন্নত ও অনুন্নত বা উন্নয়নশীল হতে পারে।

(গ) **রাজনৈতিক পরিবেশ ঃ** ধনতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক ও মিশ্র অর্থনীতি প্রভৃতি।

(ঘ) **কারিগরি পরিবেশ ঃ** কারিগরি পরিবেশের স্থিতিকরণ।

(ঙ) **আইনগত পরিবেশ ঃ** আইন প্রণয়নের মাধ্যমে পরিবেশের সুরক্ষা।

8.3 ভূতাত্ত্বিক অতীত এবং বর্তমান পরিবেশের বিবর্তন

8.3.1 পৃথিবীর উদ্ভব সম্পর্কিত বিভিন্ন মতামত

আমেরিকার পন্ডিত চেম্বারলিন, মেলিটল এবং অন্যান্য বিজ্ঞানীদের মতে নীহারিকা বা নেবুলা (মেঘ) থেকে পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে। সৃষ্টির আদিতে একটি বিশাল নক্ষত্র সূর্যের চারিদিকে ঘুরতে ঘুরতে প্রচন্ড বিস্ফোরণের ফলে টুকরো হয়ে মহাকাশের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এগুলির মধ্যে কয়েকটি সূর্যের আকর্ষণে তার চারিদিকে ঘুরতে শুরু করে এবং তাপ বিকিরণের ফলে ঐ জ্বলন্ত পিন্ডগুলি ক্রমশ ঠান্ডা হয়ে পৃথিবীর সৃষ্টি করেছে।

বিজ্ঞানী জীম্‌স এর মতে, প্রকান্ড নক্ষত্রের টানে সূর্য থেকে কিছুটা অংশ টর্পেডোর আকারে বেরিয়ে এসে নানা বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে পৃথিবীর সৃষ্টি করেছে। আবার ডেক্সিনের মতে, সূর্যের দেহ থেকেই পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া বহু বিজ্ঞানী বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীর উৎপত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন।

8.3.2 পৃথিবীর উৎপত্তি সংক্রান্ত বিভিন্ন ঘটনাবলী

পৃথিবীর উৎপত্তির শুরু থেকে বিভিন্ন ঘটনাবলী পর্যায়ক্রমে লিপিবদ্ধ করা হল—

- প্রায় ১০ বিলিয়ন বছর আগে প্রথম নক্ষত্র ও ছায়াপথ তৈরী হয়।

● পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছিল ৪½ থেকে ৫ বিলিয়ন বছর আগে।

● পাহাড়-পর্বত সৃষ্টি হয় ৩-৪ বিলিয়ন বছর আগে।

● সমুদ্র প্রায় ৩ বিলিয়ন বছর আগে উদ্ভুত হয়েছিল।

● প্রায় ২ বিলিয়ন বছর আগে সমুদ্রে ভৌত পরিবেশ ও প্রথম উদ্ভিদের আবির্ভাব ঘটেছিল।

● প্রায় ১ বিলিয়ন বছর আগে পৃথিবীতে বায়ুমন্ডলের সৃষ্টি ও জীবজগতের আবির্ভাব লক্ষ্য করা গেছে। এখনও পর্যন্ত পৃথিবীই যে জীব ও উদ্ভিদকূলের একমাত্র উপযোগী বাসস্থান হিসাবে পরিগণিত হয়েছে তার কারণগুলি নিম্নরূপ—

● সূর্য থেকে পৃথিবী নিরাপদ দূরত্বে থাকার জন্য পৃথিবীর তাপমাত্রা জীবজগতের অত্যন্ত উপযোগী।

● পৃথিবীর জীবকূলের উপযোগী অভিকর্ষজ বল, বিভিন্ন জীবনদায়ী গ্যাস সমূহ যেমন, অক্সিজেন (O_2), কার্বন-ডাই-অক্সাইড (CO_2) প্রভৃতিকে সঠিক মাত্রায় বায়ুমন্ডলে ধরে রাখতে সাহায্য করছে।

● জীব সৃষ্টির মৌলিক উপাদানগুলি যেমন—হাইড্রোজেন (H_2) অক্সিজেন (O_2), নাইট্রোজেন (N_2), কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) প্রভৃতি গ্যাস, উষ্ণতা ও নানা ভৌত উপাদানগুলি একমাত্র পৃথিবীর পরিবেশেই বর্তমান।

● পৃথিবী পৃষ্ঠে অক্সিজেন ও জলের পরিমাণ প্রাণের বিকাশকে সম্ভব করে তুলেছে।

● জলীয় বাষ্পের প্রভাবে অবিরত পৃথিবীতে বৃষ্টিপাত, তুষারপাত ঘটে চলেছে। মেঘ, শিশির ও কুয়াশার সৃষ্টি হচ্ছে প্রতিনিয়ত।

● পৃথিবীর মাটি থেকে উদ্ভিদ খাদ্যরস সংগ্রহ করে সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় অক্সিজেন ও শর্করা জাতীয় খাদ্য তৈরী করে। মাটিতে বসবাসকারী অনুজীব বা বিয়োজক প্রাণীগুলি উদ্ভিদ ও প্রাণীর মৃতদেহ থেকে খাদ্যরস সংগ্রহ করে উদ্ভিদের পুষ্টির যোগান দেয়।

● পৃথিবীতেই একমাত্র বায়ুমন্ডল ও বারিমন্ডলের সৃষ্টি হয়েছে।

● জীব-ভূ-রাসায়নিক চক্রগুলি যেমন, কার্বন চক্র, অক্সিজেন চক্র, নাইট্রোজেন চক্র প্রভৃতি অবিরাম ভাবে পৃথিবী পৃষ্ঠে তাদের নিজস্ব কাজ করে চলেছে।

8.3.3 পৃথিবীর গঠন সম্পর্কিত তথ্য

পৃথিবীর কেন্দ্রের গভীরে রয়েছে ধাতব বস্তু দিয়ে তৈরী ইনার কোর। বাইরের অংশটিকে আউটার কোর বলে। এটি 90 শতাংশ লৌহ (Fe) ও 10 শতাংশ নিকেল (Ni) নিয়ে গঠিত। এতে লোহা ও সিলিকনের (Si) অনুপাত 3:2। এর বাইরে রয়েছে ম্যানট্‌ল নামক কঠিন পদার্থের আবরণ।

ম্যান্‌টেলের তিনটি উপস্তর, একেবারে ভিতরে রয়েছে নিকেল ও লৌহ দিয়ে গঠিত একটি স্তর, মধ্যবর্ত্তী স্তরটি লৌহ ও সিলিকনের। এর ওপরে রয়েছে ম্যাগনেশিয়াম, অন্যান্য ধাতু ও সিলিকনের তৈরি 250 কিলোমিটার পুরু অ্যাস্থেনোস্ফিয়ার স্তর।

পৃথিবীর উপরের স্তরে রয়েছে কঠিন ভূত্বক। এটি স্থলভাগে 35 কি.মি পুরু ও সমুদ্রের নীচে 10 কি.মি পর্যন্ত বিস্তৃত। ভূত্বকের ওপরের উপাদান অ্যালুমিনিয়াম ও সিলিকন দিয়ে এবং ভিতরের স্তর সিলিকন ও ম্যাগনেশিয়াম দিয়ে গঠিত।

কোর থেকে ম্যান্‌টেল পর্যন্ত অঞ্চলের তাপমাত্রা 3000°C থেকে 4000°C। এটি ইউরেনিয়াম (U) এবং থোরিয়াম (Th) সমস্থানিকের ভাঙনের ফলে উৎপন্ন হয়। এই দুটি তেজস্ক্রিয় পদার্থ ভেঙে সীসায় (Pb) পরিণত হয়।

8.3.4 পৃথিবীর উপাদান

পৃথিবী চারটি মন্ডল বা স্ফিয়ারে বিভক্ত। এরা যথাক্রমে, লিথোস্ফিয়ার, হাইড্রোস্ফিয়ার, অ্যাটমোস্ফিয়ার এবং বায়োস্ফিয়ার। এই চারটি স্ফিয়ারের মধ্যে প্রথমটি হল অশ্বমন্ডল বা শিলামন্ডল বা ভূমন্ডল বা লিথোস্ফিয়ার। লিথোস্ফিয়ার পৃথিবীর উপরিত্বক। এখানে বিভিন্ন রকম খনিজ পদার্থ, যেমন—সিলিকা (Si), অ্যালুমিনিয়াম (Al), লৌহ (Fe), ম্যাগনেশিয়াম (Mg), সোডিয়াম (Na) এবং নানারকম গ্যাসীয় পদার্থ, যেমন—হাইড্রোজেন (H_2), কার্বন (C), অক্সিজেন (O_2), নাইট্রোজেন (N_2)-এর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

লিথোস্ফিয়ারের পরবর্তী স্তরটি হল বারিমন্ডল বা জলমন্ডল বা হাইড্রোস্ফিয়ার। এটি ভূমন্ডলের ওপরে অবস্থিত। পৃথিবীর শতকরা 72 শতাংশই জলমন্ডলের অধীনে। এটি সাগর, নদী, হ্রদ ও জলাশয় প্রভৃতি নিয়ে গঠিত।

ভূপৃষ্ঠ থেকে 600 কি.মি. উচ্চতা পর্যন্ত বিস্তৃত পরের স্তরটি বায়ুমন্ডল বা অ্যাটমস্ফিয়ার নামে পরিচিত। এটি ট্রোপেস্ফিয়ার, ট্রোপোপজ, স্ট্রাটোস্ফিয়ার, থার্মোস্ফিয়ার, ওজোনোস্ফিয়ার, আয়োনোস্ফিয়ার, এক্সোস্ফিয়ার ও ম্যাগনেটো স্ফিয়ার নিয়ে গঠিত।

ম্যাগনেটোস্ফিয়ারের পরবর্তী স্তরটি হল জীবমন্ডল বা বায়োস্ফিয়ার। এটি বারি জীবমন্ডল, অশ্ব জীবমন্ডল ও বায়ু জীবমন্ডল নিয়ে গঠিত। জীবমন্ডল হল বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণিকূলের বাসস্থান।

8.3.5 সমুদ্রে জীবনের উদ্ভবের সপক্ষে যুক্তি

পৃথিবীতে জীবনের উদ্ভব সম্পর্কিত বিভিন্ন যুক্তি সমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হল—

● সমুদ্রের জলে ও জলে দ্রবীভূত খনিজ লবণের সঙ্গে সব জীবের সাংগঠনিক মৌলিক উপাদানগুলির সাদৃশ্য পাওয়া যায়।

● এখনও সমুদ্রের জলে অনেক এককোষী জীব বাস করে।

● সমুদ্রের জলে প্রাপ্ত মিথেন (CH_4) ও অ্যামোনিয়া (NH_3) জীবের উৎপত্তির সহায়ক।

● হাইড্রোকার্বনের সঙ্গে হাইড্রোজেন আয়ন (H^+) এবং হাইড্রক্সিল আয়ন (OH^-) বিক্রিয়া করে জৈব অ্যাসিড (Organic acid) তৈরী করে। এই জৈব অ্যাসিড সৌরশক্তির উপস্থিতিতে অ্যামোনিয়ার (NH_3) সঙ্গে বিক্রিয়া করে অ্যামাইনো অ্যাসিড (amino acid) তৈরী করে। এই অ্যামাইনো অ্যাসিডই সকল জীব গঠনের মৌলিক উপাদান। এর থেকে বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে নিওক্লিওপ্রোটিন অণু তৈরী হয়েছে। নিউক্লিওপ্রোটিন থেকে প্রথমে প্রোভাইরাস ও পরে ভাইরাসের উৎপত্তি হয়েছে। এর থেকে ব্যাক্টেরিয়া ও শেষ পর্যায়ে এককোষী আদ্যপ্রাণী ও প্রোটোজোয়ার উদ্ভব হয়েছে। সর্বোপরি এই এককোষী জীব থেকে বহু ধাপের মাধ্যমে বহুকোষী প্রাণীর উদ্ভব ঘটেছে।

8.3.6 পরিবেশের পরিবর্তনের ধারা

পরিবেশ দুই প্রকারের হতে পারে—প্রাকৃতিক ও মানুষ সৃষ্টিকারী পরিবেশ।

প্রাকৃতিক পরিবেশ পরিবর্তনের পদক্ষেপ

● জীবমন্ডলে যখন প্রথম জীবনের স্পন্দন অনুভূত হয়েছিল তখন পরিবেশে অক্সিজেনের পরিমাণ অনেক কম ছিল।

● প্রাথমিকভাবে আবহাওয়া ছিল আর্দ্র ও উষ্ণ। এছাড়াও পরিবেশে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের আধিক্য ছিল বেশি।

● ওজোন (O_3) স্তরের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। জলাভূমি নাইট্রোজেন মুক্ত ছিল। জীবন জলের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল।

● সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া শুরুর সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশের বিপুল পরিবর্তন সাধন হয়। এই প্রক্রিয়ায় প্রকৃতি থেকে উদ্ভিদ কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে এবং অক্সিজেন ও শর্করা জাতীয় জৈব খাদ্য তৈরি করে।

● বিধ্বংসী প্রাকৃতিক বিপর্যয়গুলি যেমন, ভূমিকম্প, ধ্বস, ঝড়-ঝঞ্ঝা, বন্যা, সাইক্লোন, টর্নেডো প্রভৃতি পৃথিবীর আকৃতি, গঠন ও প্রকৃতির বহু পরিবর্তন সাধন করে। যেমন, অগ্নুৎপাতের ফলে সৃষ্টি হয়েছে উঁচু পাহাড়। পাহাড় উষ্ণতার পরিবর্তন, বায়ুপ্রবাহ ও ভূমিকম্পের ফলে ভেঙে গিয়ে সৃষ্টি করেছে উপত্যকা।

● সমগ্র পৃথিবী আগে ছিলো একটিই ভূখন্ড। তাকে ঘিরে ছিল জলরাশি। কন্টিনেন্টাল ড্রিফ্ট তত্ত্ব অনুযায়ী স্থলভাগ ভেঙে শুরু হয়েছিল মহাদেশ গঠনের প্রক্রিয়া।

মনুষ্যসৃষ্ট পরিবেশের পরিবর্তন

পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবের পর পরিবেশের বহুল পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে। মানুষের জনসংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে ভূমির ব্যবহার, কৃষিকার্য, বাসস্থান ও শহর নির্মাণ, অর্থনৈতিক উন্নয়নও বেড়ে চলেছে। মানুষ নিজেই তার চাহিদা মেটাতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে জীবমন্ডলের সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন আজ বিপন্ন করে তুলেছে।

8.3.7 আজকের বায়ুমন্ডল সৃষ্টি

আজকের বায়ুমন্ডল সৃষ্টির পর্যায়ক্রমিক ধাপগুলি নিম্নরূপ ঃ-

● আজকের বায়ুমন্ডল মোটামুটি স্থিতিশীল। বিভিন্ন পর্যায়ে পরিবর্তনের সাথে সাথে এটি সৃষ্টি হয়েছে । এই পরিবর্তনটি হয়েছে 580 মিলিয়ন বছর আগে ক্যামব্রিয়ান যুগ থেকে।

● বায়ুমন্ডলে উপস্থিত গ্যাসগুলির শতকরা পরিমাণ নিম্নে দেখানো হল—

গ্যাস	শতকরা পরিমাণ
নাইট্রোজেন (N_2) —	78.08%
অক্সিজেন (O_2) —	20.95%
জলীয় বাষ্প, আর্গন (Ar), নিয়ন (Ne), হিলিয়াম (He) প্রভৃতি	0.935%
কার্বন-ডাই-অক্সাইড (CO_2) —	0.035%

● হাইড্রোজেন (H_2) ও হিলিয়াম (He) -এর ন্যায় হাল্কা গ্যাস দুটি বায়ুমন্ডলের একেবারে ওপরের দিকে থাকে। এগুলিই পরিবর্তিত হয়ে অশ্বমন্ডল ও বারিমন্ডল সৃষ্টি করেছে। এই গ্যাসগুলি অগ্নুৎপাত, উষ্ণ প্রস্রবন ক্রিয়া, পদার্থের ভাঙন, অবশেষে উদ্ভিদের জীবক্রিয়ার ফলে সৃষ্টি হয়েছে।

● পৃথিবী সৃষ্টির প্রথমদিকে পরিবেশে বেশী পরিমাণে জলীয় বাষ্প (60-70 শতাংশ), কার্বন ডাই অক্সাইড (10-15 শতাংশ) ও নাইট্রোজেন (8-10 শতাংশ) উপস্থিত থাকলেও অক্সিজেনের কোনো অস্তিত্ব ছিল না।

● পৃথিবীর পরিবেশ ছিল খুবই উত্তপ্ত। প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে পৃথিবী শীতল হয়। পৃথিবী পৃষ্ঠের গর্তগুলি বৃষ্টির জল পূর্ণ হয়ে তৈরি করল সমুদ্র, নদী, হ্রদ; সেখানেই জন্ম নিল প্রথম উদ্ভিদ।

8.3.8 জীবের জন্ম ও বিবর্তন—জীব বৈচিত্র্য ও পরিবেশ

সৃষ্টির ঊষালগ্ন থেকে মানুষ এই পৃথিবীতে উপস্থিত বিভিন্ন রকম জীব সম্পর্কে তাদের চিন্তাভাবনার প্রসার ঘটায় নি। মানুষ তাদের স্বার্থের দিকে তাকিয়ে বহু জীব নির্দ্বিধায় ধ্বংস করেছে। তাই এই সমস্ত জীবকূলের কোনোটা আজ অবলুপ্ত, কোনোটা আবার অবলুপ্তির পথে।

কিন্তু মানুষ আজ তাদের অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখার তাগিদে নানা উদ্ভিদ ও প্রাণীকূলের প্রতিও যত্নশীল হয়েছে। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন বিজ্ঞানী, সমাজসেবী, রাজনীতিবিদ্ ও সমস্ত দেশের প্রতিনিধিগণ আমাদের এই বসুন্ধরার জীবমণ্ডল ও বাস্তুরীতি রক্ষার বিভিন্ন দিকে দৃষ্টিপাত করছেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে সুইডেনের স্কটহোমে 1792 সালে এবং ব্রাজিলের রিও-ডি-জেনোরিয়োতে 1992 সালে অনুষ্ঠিত দুটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক পরিবেশ মহাসম্মেলনের নাম মনে রাখা একান্ত জরুরী। এর আলোচিত বিষয়গুলির মধ্যে অন্যতম ছিল পরিবেশ রক্ষা, জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ প্রভৃতি।

8.3.9 ভূতাত্ত্বিক সময় সারণী (Geological time scale)

জীববৈচিত্র্য এবং একটি প্রজাতি থেকে অন্য প্রজাতির তফাত আমরা দেখতে পাই ভূতাত্ত্বিক সময় সারণী থেকে। পৃথিবীর বিবর্তন সম্পর্কিত সময় সারণীর একটি ভিত্তি আছে। এই সময় সারণী তৈরি করার পদ্ধতিগুলির মধ্যে রয়েছে তেজস্ক্রিয় কার্বনের সাহায্যে বিভিন্ন বস্তুর বয়স নির্ধারণ, পৃথিবীর অভ্যন্তরের তেজস্ক্রিয়ার পরিমাপ ও বিভিন্ন ভূপ্রাকৃতিক ঘটনার সময় সম্পর্কে ধারণা। ভূতাত্ত্বিক সময় সারণীতে সময়কালকে যুগ (Era), পর্যায় (Period) বা নবযুগে (Epoch) ভাগ করা হয়েছে।

নিম্নে স্ট্রিকবারগার (Evolution ; 1994) প্রণীত সময় সারণীটি উল্লেখ করা হল।

অপরিমেয় কাল (eon)	মহাযুগ (Era)	যুগ (Period)	নবযুগ (Epoch)	বর্তমান থেকে কত মিলিয়ন বছর আগে	স্থায়ীত্ব (মিলিয়ন বছর)	জীবের উদ্ভব ও বিবর্তনের রূপরেখা
		কুয়াটার্নারী	বর্তমান প্লেইসটোসিন	2	2	মানুষের আবির্ভাব
ফেনেরোজোয়িক	সিনোজোয়িক	টারশিয়ারী	প্লায়োসিন	5	3	স্তন্যপায়ী ও পক্ষীর প্রকাশ
			মায়োসিন	24	11	টিলিয়স্টের বৃদ্ধি
			আলগোসিন	37	13	আধুনিক স্তন্যপায়ী ও অমেরুদন্ডী প্রাণীর উদ্ভব
			ইওসিন	54	17	সপুষ্পক উদ্ভিদের প্রকটতা
			পেলিওসিন্	65	11	আদিতম স্তন্যপায়ীদের বিস্তার
	মেসোজোয়িক	ক্রিটেসিয়াস		144	79	প্রথম সপুষ্পক উদ্ভিদের উদ্ভব, ডাইনোসোরের বিলুপ্তি
		জুরাসিক		213	69	বিশাল ডাইনোসারের ও প্রথম পক্ষীর আবির্ভাব
		ট্রায়াসিক		248	35	কনিফার উদ্ভিদের বৃদ্ধি

অপরিমেয় কাল (eon)	মহাযুগ (Era)	যুগ (Period)	নবযুগ (Epoch)	বর্তমান থেকে কত মিলিয়ন বছর আগে	স্থায়ীত্ব (মিলিয়ন বছর)	জীবের উদ্ভব ও বিবর্তনের রূপরেখা
ফেনেরোজোয়িক	পেলিওজোয়িক	পার্মিয়ান		246	38	সরীসৃপের বৃদ্ধি
		কার্বনিফেরাস্	পেনসিলভেনিয়ান	320	34	প্রথম সরীসৃপের উদ্ভব
			মিসিসিপিয়ান	360	40	উভচর ও পতঙ্গ শ্রেণীর প্রাণীর বৃদ্ধি
		ডিভোনিয়ান		408	48	মৎস শ্রেণীর প্রাণী ও প্রথম স্থল মেরুদন্ডী প্রাণীর সৃষ্টি
		সিলুরিয়ান		438	30	প্রথম স্থলজ উদ্ভিদ ও অমেরুদন্ডী প্রাণীর উদ্ভব
		অর্ডোভিসিয়ান		505	67	অমেরুদন্ডী প্রাণী ও প্রথম মেরুদন্ডী প্রাণীর প্রকটতা
		ক্যাম্ব্রিয়ান		590	85	অমেরুদন্ডী পর্বের প্রাণিদের জীবাশ্মের অতিবৃদ্ধি
প্রিক্যামব্রিয়ান	প্রোটেরোজোয়িক	উচ্চ		900	310	বহুকোষী প্রাণীর আবির্ভাব
		মধ্য		1600	700	সুকেন্দ্রিক, ইউক্যারিওটিক জীবের উদ্ভব
		নিম্ন		2500	900	প্লাস্টনিক আদিকেন্দ্রিক প্রোক্যারিওটিক জীবের বৃদ্ধি
	আর্কিয়ান			3900	1400	স্ট্রোম্যাটোসাইট ও বেষ্টিক প্রোক্যারিওটিক জীবের আবির্ভাব
	হ্যাডিয়ান			4500	600	জীবনের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয় না

8.4 উদ্ভিদ ও প্রাণীর মধ্যে সম্পর্ক

উদ্ভিদ ও প্রাণীর পারস্পরিক সম্পর্ক জানতে হলে জার্মান প্রাণি বিজ্ঞানী আর্নেষ্ট হেকেল প্রণোদিত ইকোলজি (Ecology) বা বাস্তববিদ্যা শব্দটির সঙ্গে আমাদের পরিচিত হওয়া জরুরি।

8.4.1 বাস্তব্যবিদ্যা ও বাস্তুতন্ত্র সম্পর্কে ধারণা

ইকোলজি শব্দটি ওইকোস (Oikos) ও লোগোস (Logos) শব্দ দুটি থেকে এসেছে। ওইকোস্ শব্দটির অর্থ বাসস্থান ও লোগোসের অর্থ জ্ঞান।

বাস্তব্য বিদ্যার সংজ্ঞা ঃ বিজ্ঞানের যে শাখায় জীব (উদ্ভিদ ও প্রাণী) ও তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং পরিবেশের সাথে তাদের আন্তঃসম্পর্ক সম্বন্ধে জানা যায় তাকে বাস্তব্যবিদ্যা বলে। এটি দুইভাগে বিভক্ত— জীবগোষ্ঠী (উদ্ভিদ ও প্রাণি বাস্তব্যবিদ্যা) ও প্রজাতির সংখ্যা (আটোইকোলজি ও সিনইকোলজি)। অটোইকোলজি হল একটি নির্দিষ্ট উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতি সম্বন্ধে নির্দিষ্ট পরিবেশ সংক্রান্ত অধ্যয়ন আর সিন্ইকোলজি হল একটি নির্দিষ্ট পরিবেশে জীবগোষ্ঠীর পারস্পরিক সম্পর্ক অধ্যয়ন।

জীবের বাসস্থানের তারতম্য অনুসারে বাস্তব্যবিদ্যাকে আবার লিম্নোলজি (স্বাদু জল ও জীবের বাস্তব্যবিদ্যা অধ্যয়ন), টেরিস্ট্রেয়াল ইকোলজি (স্থলজ পরিবেশ ও জীবের অধ্যয়ন), ওস্যানোগ্রাফী (সামুদ্রিক পরিবেশ ও জীবের অধ্যয়ন) ইত্যাদিতে ভাগ করা যায়।

আবার ট্যাক্সোনমিক বাস্তব্যবিদ্যা হল পরিবেশে বিভিন্ন জীব গোষ্ঠীর প্রকারভেদ ও বৈচিত্র্য এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক অধ্যয়ন। এটি মানব বাস্তব্যবিদ্যা, পতঙ্গ বাস্তব্যবিদ্যা, পক্ষীসংক্রান্ত বাস্তব্যবিদ্যা প্রভৃতিতে বিভক্ত।

বাস্তুতন্ত্র বা ইকোসিস্টেম হল জীবজগৎ ও তার চারপাশের ভৌত পরিবেশ নিয়ে গঠিত একটি মূল কার্যকরী একক। এতে প্রাণীজগৎ এবং উদ্ভিদ জগৎ পরস্পরের সঙ্গে এবং তার ভৌত পরিবেশের সঙ্গে নিবিড় ভাবে আবদ্ধ থাকে (E.P. Odum ; 1971)।

8.4.2 বাস্তুতন্ত্রের মূল উপাদান

বাস্তুতন্ত্রের মূল উপাদানগুলি হল—

(ক) অজৈব বা জড় উপাদান ও (খ) সজীব উপাদান।

ক) অজৈব উপদান ঃ

অজৈব উপাদান আবার তিনভাগে বিভক্ত।

(১) অজৈব পদার্থ— বিভিন্ন প্রকার খনিজলবণ, ক্যালসিয়াম (Ca), পটাশিয়াম (K), সালফার (S), ফসফরাস (P), অক্সিজেন (O), নাইট্রোজেন (N), কার্বন-ডাই-অক্সাইড (CO_2) প্রভৃতি।

(২) জৈব পদার্থ— মৃত ও গলিত উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহাবশেষ প্রভৃতি।

(৩) ভৌত উপাদান— সূর্যালোক, উষ্ণতা, বায়ু, জল, মাটি প্রভৃতি।

খ) সজীব উপাদান ঃ

সজীব উপাদানের মধ্যে আছে উৎপাদক, খাদক, ও বিয়োজক এবং পরিবর্তক সমূহ।

উৎপাদক ঃ ক্লোরোফিল যুক্ত সবুজ উদ্ভিদ, যারা সূর্যালোকের শক্তির উপস্থিতিতে পরিবেশ থেকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও মূলের সাহায্যে জল গ্রহণ করে সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় শর্করা জাতীয় খাদ্য প্রস্তুত করে তাদের উৎপাদক বলে। এই প্রক্রিয়ায় আলোকশক্তি রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয় ও খাদ্যের মধ্যে আবদ্ধ থাকে। যে সকল জীব নিজেদের খাদ্য নিজেরা তৈরি করে তাদের স্বভোজী বলে। সবুজ উদ্ভিদ ছাড়া বিভিন্ন সালোকসংশ্লেষকারী ব্যাক্টেরিয়া ও কেমোসিন্থেটিক জীবাণু ইত্যাদিও উৎপাদক।

খাদক ঃ বাস্তুতন্ত্রে উৎপাদক যেসব খাদ্য তৈরি করে সেই খাদ্য গ্রহণ করে যারা বেঁচে থাকে তারা খাদক শ্রেণীর অন্তর্গত। সকল প্রাণীই খাদক শ্রেণীর অন্তর্গত। খাদক আবার তিনভাগে বিভক্ত। যথা— প্রথম শ্রেণীর খাদক, দ্বিতীয় শ্রেণীর খাদক ও তৃতীয় শ্রেণীর খাদক।

প্রথম শ্রেণীর খাদক ঃ বিভিন্ন শ্রেণীর তৃণভোজী এবং শাকাশী প্রাণী, যারা সরাসরি উদ্ভিদ ও তাদের

অংশ বিশেষ খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে তারা প্রথমে শ্রেণীর খাদক। গরু, ছাগল, ভেড়া, হরিণ প্রভৃতি আরো অনেক শাকাহারী প্রাণী খাদক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিতীয় শ্রেণীর খাদক ঃ প্রথম শ্রেণীর খাদককে যারা খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে তাদের দ্বিতীয় শ্রেণীর খাদক বলে। বাঘ, সিংহ, সাপ, ব্যাঙ প্রভৃতি এই শ্রেণীর খাদকের উদাহরণ।

তৃতীয় শ্রেণীর খাদক ঃ যে সমস্ত প্রাণী দ্বিতীয় শ্রেণীর খাদকদের খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে তাদের তৃতীয় শ্রেণীর খাদক বলে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, বাজপাখী, শকুন প্রভৃতি। এদের শীর্ষস্থানীয় খাদকও বলে।

বিয়োজক ঃ কয়েক শ্রেণীর ছত্রাক ও ব্যাক্টেরিয়া উৎপাদক ও খাদকের মৃতদেহ থেকে পুষ্টিলাভ করে। এই সমস্ত প্রাণীর মৃতদেহের বিসরণ ঘটিয়ে জটিল জৈব যৌগকে সরল জৈবযৌগে পরিণত করে। এদের বিয়োজক বলে।

পরিবর্তক বা রূপান্তরক ঃ কয়েক শ্রেণীর ব্যাক্টেরিয়া বিয়োজক দারা পরিবর্তিত সরল খাদ্যকে আরো বিসরণ ঘটিয়ে অজৈব যৌগে ও আরও সরল মৌলে পরিণত করে পরিবেশে ফিরিয়ে দেয় এবং এগুলির থেকেই উদ্ভিদ খাদ্য গ্রহণ করে।

খাদক, বিয়োজক ও পরিবর্তক সকলেই পরভোজী জীব। এরা সকলেই উৎপাদকের ওপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল।

ইকোসিস্টেমের বিভিন্ন উপাদানগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নীচে দেখানো হল—

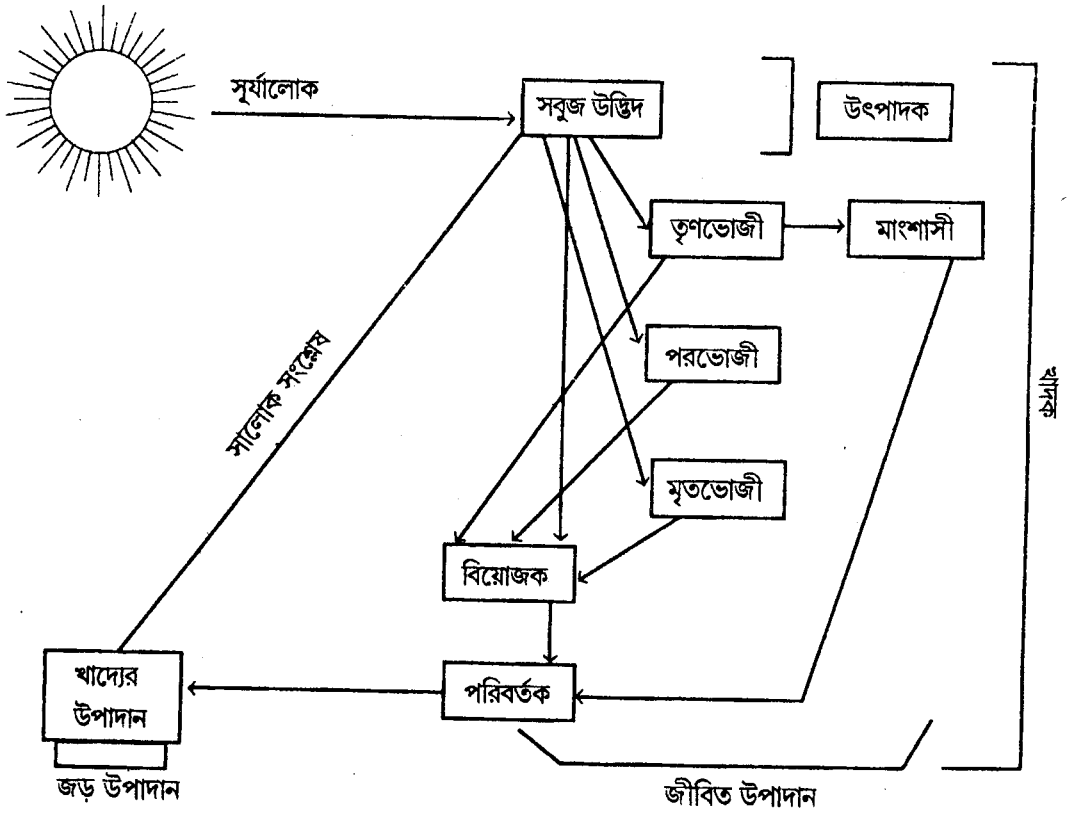

8.4.3 খাদ্য শৃঙ্খল, খাদ্য জালক ও খাদ্য পিরামিড

উদ্ভিদ ও প্রাণীর পারস্পরিক সম্পর্কের কথা জানতে হলে খাদ্যশৃঙ্খল, খাদ্য জালক, খাদ্য পিরামিড ও ইকোসিস্টেমের শক্তিপ্রবাহ প্রভৃতি সম্বন্ধে বিশেষভাবে জ্ঞান আহরণ করা প্রয়োজন।

খাদ্যশৃঙ্খল ঃ খাদ্য-খাদকের সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে নির্দিষ্ট প্রণালীতে খাদ্যশক্তি উৎপাদকের কাছ থেকে ক্রমপর্যায়ে আরও উন্নত জীবগোষ্ঠীর মধ্যেপ্রবাহিত হয়। শক্তি প্রবাহের এই ক্রমিক পর্যায়কে খাদ্য শৃঙ্খল বলে। বিজ্ঞানী ওডামের মতে, "উৎপাদক কর্তৃক আবদ্ধ শক্তি পরপর বিভিন্ন খাদ্য স্তরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সর্বোচ্চ খাদ্যস্তরে পৌঁছানোর শৃঙ্খলকে খাদ্য শৃঙ্খল বলে।" উদাহরণস্বরূপ, একটি মিষ্টি জলের খাদ্য শৃঙ্খলের মাধ্যমে শক্তিপ্রবাহ নীচে দেখানো হল।

(উৎপাদক) (প্রথম সারির খাদক) (দ্বিতীয় সারির খাদক) (তৃতীয় সারির খাদক) (চতুর্থ সারির খাদক)

উদ্ভিদ, শৈবাল ⟶ পতঙ্গ ⟶ ব্যাঙ ⟶ মাছ ⟶ মানুষ

ফাইটোপ্লাঙ্কটন

বাস্তুতন্ত্রে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত তিন প্রকার খাদ্যশৃঙ্খল দেখা যায়। যেমন—

(১) **শিকারী খাদ্য শৃঙ্খল** (Predator food chain) ঃ এই শৃঙ্খল উৎপাদক থেকে শুরু হয় এবং এর পরবর্তী পর্যায়গুলিতে জীবের আকার ক্রমশ বাড়তে থাকে এবং একই সঙ্গে তাদের সংখ্যাও হ্রাস পায়।

উদাহরণ ঃ

উদ্ভিদ ⟶ কীটপতঙ্গ ⟶ ব্যাঙ ⟶ বাজপাখী

(২) **পরজীবী খাদ্য শৃঙ্খল** (Parasitic food chain) ঃ এই শৃঙ্খল বৃহৎ জীব থেকে আরম্ভ হয়ে ক্রমপর্যায়ে ক্ষুদ্র পরজীবীতে শেষ হয়।

উদাহরণ ঃ

মানুষ ⟶ কৃমি ⟶ আদ্যপ্রাণী

(৩) **মৃতজীবী খাদ্য শৃঙ্খল** (Saprophytic food chain) ঃ এই শৃঙ্খল মৃতজীবী থেকে আরম্ভ হয়ে ব্যাক্টেরিয়াতে শেষ হয়।

উদাহরণ ঃ-

মৃত উদ্ভিদ ⟶ ছত্রাক ⟶ ব্যাক্টেরিয়া

খাদ্য জালক ঃ

বাস্তুতন্ত্রের শক্তি ও বস্তু অসংখ্য আন্তঃ সম্পর্কযুক্ত খাদ্য শৃঙ্খলের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়। এইভাবে সংযুক্ত খাদ্য শৃঙ্খলগুলিকে খাদ্য জালক বলে। নিম্নে একটি খাদ্য জালক চিত্রসহ দেখানো হল।

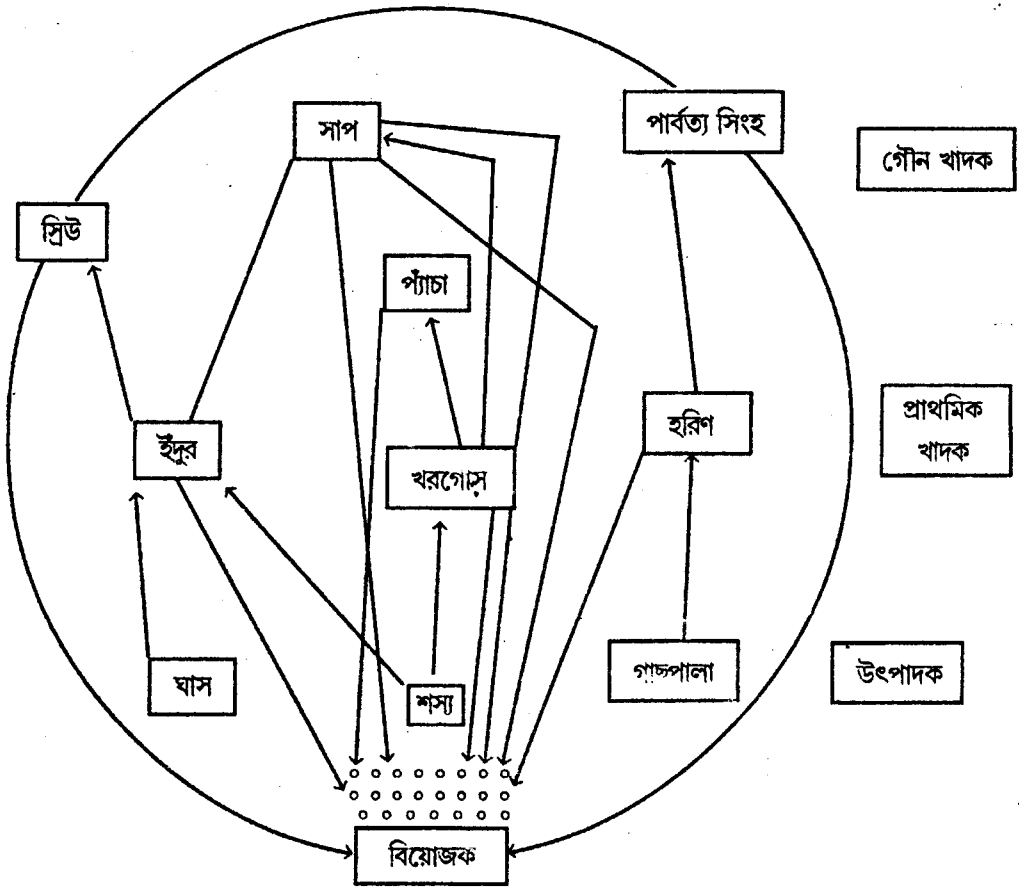

একটি খাদ্য জালকের চিত্র

খাদ্য পিরামিড— একটি নির্দিষ্ট বাস্তুতন্ত্রের বিভিন্ন পুষ্টিতন্ত্রের সামগ্রিক গঠনকে অনুক্রমিকভাবে সাজালে যে পিরামিড বা শিখর গঠিত হয় তাকে খাদ্য পিরামিড বলে। একটি বাস্তুতন্ত্রে নিম্নলিখিত খাদ্য পিরামিড পরিলক্ষিত হয়।

(১) সংখ্যা পিরামিড

(২) শক্তির পিরামিড

(৩) জীবডর পিরামিড

(১) সংখ্যা পিরামিড ঃ

উৎপাদক থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ পর্যায়ের খাদক পর্যন্ত জীবের সংখ্যা ক্রমশঃ কমতে থাকে। এইরূপে সৃষ্ট পিরামিডকে সংখ্যা পিরামিড বলে।

নীচে একটি সংখ্যার পিরামিড দেখানো হল

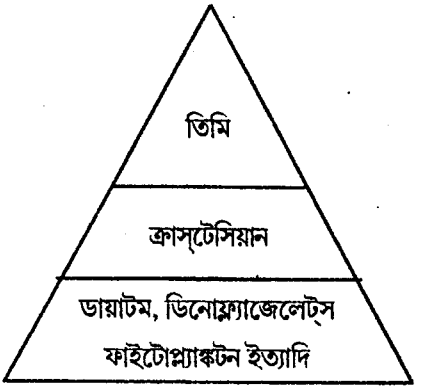

এখানে ডায়াটম, ডিনোফ্ল্যাজেলেটস ও ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটনের সংখ্যা অনেক বেশি (উৎপাদক)। প্রথম শ্রেণীর খাদক যেমন, ক্রাস্‌টেসিয়ান এর সংখ্যা উৎপাদকের সংখ্যা থেকে কম। আবার দ্বিতীয় সারির খাদক (তিমি) সংখ্যা সবথেকে কম।

(২) শক্তির পিরামিড ঃ

একটি খাদ্য শৃঙ্খলের প্রতিটি খাদ্যস্তরে (উৎপাদক থেকে সর্বোচ্চ শ্রেণীর খাদক পর্য্যন্ত) সঞ্চিত শক্তির পরিমাণ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়ে যে পিরামিড সৃষ্টি করে তাকে শক্তির পিরামিড বলে।

নিম্নে একটি শক্তির পিরামিডের চিত্র দেখানো হল—

(৩) জীবভর পিরামিড ঃ

একটি খাদ্য শৃঙ্খলের প্রত্যেক স্তরের সজীব বস্তুর শুষ্ক ওজনকে জীবভর বলে। দেখা যায় উৎপাদকের

জীবভর থেকে প্রাথমিক স্তরের খাদকের জীবভর কম হয়, আবার প্রাথমিক থেকে দ্বিতীয় স্তর, দ্বিতীয় স্তর থেকে তৃতীয় স্তরে জীবভর ক্রমান্বয়ে কমতে থাকে। এইভাবে সৃষ্ট পিরামিডকে জীবভরের পিরামিড বলে। নিম্নে একটি জীবভরের পিরামিড দেখানো হল।

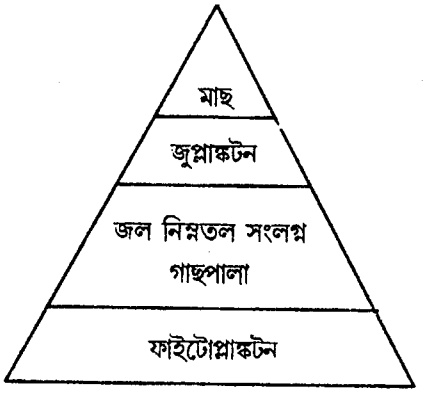

8.4.4 বাস্তুতন্ত্রে শক্তি প্রবাহ

শক্তির অবস্থান্তর ও খাদ্য শৃঙ্খলের বিভিন্ন ট্রপিক স্তরের জীবের মধ্যে দিয়ে এর ধারাবাহিক পরিচালনকে শক্তিপ্রবাহ বলে।

বাস্তুতন্ত্রে শক্তি প্রবাহের তিনটি পর্যায় আছে।

(১) শক্তি অর্জন ঃ এই পর্যায়ে সবুজ উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় সৌরশক্তি শোষণ করে তা রাসায়নিক শক্তিতে পরিণত করে এবং এই শক্তি খাদ্যের স্থৈতিক শক্তি রূপে আবদ্ধ হয়।

(২) শক্তির ব্যবহার ঃ উৎপাদকের সংশ্লেষিত খাদ্যে যে পরিমাণ শক্তি আবদ্ধ হয় তার কিছু অংশ উদ্ভিদ নিজের শারীর বৃত্তিয় কাজে ব্যবহার করে এবং কিছু অংশ অপাচ্য ও রেচনপদার্থ রূপে পরিবেশে পরিত্যক্ত হয়। অবশিষ্টাংশ প্রাণীরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে খাদ্যরূপে গ্রহণ করে। সার্বিকভাবে প্রাণী খাদ্যস্থ স্থৈতিক শক্তিকে শ্বসন প্রক্রিয়ার সাহায্যে গতিশক্তিতে রূপান্তরিত করে এবং জৈবনিক কাজগুলি নিয়ন্ত্রণ করে।

(৩) শক্তির স্থানান্তকরণ ঃ উৎপাদক থেকে শক্তি প্রথম সারির খাদকে, প্রথম সারির খাদক থেকে পর্যায়ক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর খাদকে প্রবেশ করে।

8.4.5 বায়োম সম্পর্কে ধারণা

একটি নির্দিষ্ট প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের উদ্ভিদ ও প্রাণীগোষ্ঠীকে বায়োম বলে।

এই সব অঞ্চলের জলবায়ুর বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভর করে প্রাণী ও উদ্ভিদ বিভিন্ন রকম হয়। নীচে বিভিন্ন ধরণের বায়োম ও নির্দিষ্ট বায়োমে বসবাসকারী উদ্ভিদ ও প্রাণীকূল সম্বন্ধে ধারণা দেওয়া হয়।

জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য	উদ্ভিদ	প্রাণী
(ক) **মরুভূমি বায়োম** বৃষ্টিপাত 25 সে.মি-এর কম	একবর্ষজীবী বহুবর্ষজীবী ফণীমনসা, বাবলা প্রভৃতি।	ইঁদুর, গিরগিটি, উট, অ্যান্টিলোপ, হরিণ, ক্যাঙারু ইত্যাদি।
(খ) **তৃণভূমি বায়োম** 25-75 সে.মি বার্ষিক বৃষ্টিপাত	নানা প্রজাতির ঘাস, সাভার্না।	সিংহ, মহিষ, ভেড়া, অ্যান্টিলোপ, সাপ, মাকড়সা ইত্যাদি।
(গ) **তুন্দ্রা বায়োম** শীতকালীন দীর্ঘস্থায়ী বৃষ্টিপাত 38 সে.মি	শৈবাল, মস, লাইকেন, চার্চ ও উইলো জাতীয় উদ্ভিদ।	বল্গাহরিণ, কুকুর, ক্যারিবু, খরগোস, শীল, তিমি, সিন্ধুঘোটক প্রভৃতি।
(ঘ) **অরণ্য বায়োম**		হাতি, বাঘ, শেয়াল, হরিণ, বাইসন, বনবিড়াল প্রভৃতি।
(i) ক্রান্তীয় অরণ্য বৃষ্টিপাত 200 সে.মি এর বেশি এবং গড় উষ্ণতা 27°C	চিরহরিৎ, আবলুস, মেহগিনি জাতীয় উদ্ভিদ।	
(ii) সরল বর্গীয় অরণ্য দীর্ঘস্থায়ী শীত তাপমাত্রা –30°C + 10°C	পাইন, ফার, বার্চ ইত্যাদি।	নেকড়ে, ভাল্লুক প্রভৃতি।
(ঙ) **জলজ বায়োম** মহীসোপান মহীঢাল গভীর সমুদ্রের সমভূমি গভীর সমুদ্রঘাত সামুদ্রিক সৌমশিরা	ডায়াটম, লোহিত শৈবাল, সামান্য সবুজ শৈবাল, বাদামী শৈবাল।	বিভিন্ন ধরণের মাছ, তিমি, হাঙ্গর, শামুক, ঝিনুক, অক্টোপাস, তারামাছ প্রভৃতি।

8.4.6 উদ্ভিদ (ফ্লোরা) ও প্রাণীর (ফনা) মিথোক্রিয়া বা আন্তঃক্রিয়া।

একই পরিবেশে যেসব উদ্ভিদ ও প্রাণী থাকে তারা পরস্পর পরস্পরের জীবনকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে প্রভাবিত বা নিয়ন্ত্রিত করে এবং এক সঙ্গে বসবাস করে।

জীবের শারীবৃত্তিয় প্রক্রিয়াগুলি অর্থাৎ বৃদ্ধি, পুষ্টি, জনন ইত্যাদি দুটি একই প্রজাতির পারস্পরিক ক্রিয়া ও দুটি বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যেকার ক্রিয়ার উপর নির্ভর করে। নিম্নে বিভিন্ন প্রকার আন্তঃক্রিয়া উল্লেখ করা হল।

মিথোস্ক্রিয়ার নাম	সংজ্ঞা	উদাহরণ
নিউট্রালিজম্	প্রাকৃতিক পরিবেশে দুটি ভিন্ন প্রজাতির জীবের মধ্যে মিথোক্রিয়ার প্রত্যক্ষভাবে কেউ কারোর ক্ষতি করেনা।	কাঠবিড়ালী ও রবীন পাখী একই বৃক্ষে বসবাস করলেও শুধুমাত্র উভয় প্রাকৃতিক পরিবেশ ব্যবহার করে।
মিউচুয়ালিজম্	প্রাকৃতিক পরিবেশে দুটি ভিন্ন প্রজাতির জীব উপকৃত হয়।	লাইকেন একটি ছত্রাক ও একটি শৈবাল পরস্পর যুক্ত হয়ে বাস করে। সুবজ শৈবাল খাদ্য সরবরাহ করে, ছত্রাক আশ্রয়, আর্দ্রতা ও জল সরবরাহ করে।
কমেনসালিজম্	প্রাকৃতিক পরিবেশে বসবাসকারী দুটি ভিন্ন প্রজাতির মধ্যে একটি উপকৃত হয় অপরটির কোনো ক্ষতি হতেও পারে বা নাও পারে।	অনেকগুলি পরাশ্রয়ী উদ্ভিদ অন্য বৃক্ষের শাখা প্রশাখায় আশ্রয় নিয়ে বড় হয়। পরাশ্রয়ী উদ্ভিদগুলি আশ্রয়দাতা থেকে খাদ্য নেয় না। এরা নিজেদের খাদ্য নিজেরা তৈরি করে। রাস্না একটি পরাশ্রয়ী উদ্ভিদ। এরা সাধারণত আম, বট প্রভৃতি উদ্ভিদের শাখায় আশ্রয় নিয়ে বড় হয়ে থাকে।
কলোনাইজেশন	একই প্রজাতির বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণী গোষ্ঠীর জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়। এরা দলবদ্ধ বা কলোনী গঠন করে বাস করে।	বহু উভচর, সরীসৃপ, পাখী ও স্তন্যপায়ীদের মধ্যে শিশুদের অপত্য স্নেহে লালনের উদাহরণ আছে।
এগ্রিগেশন	কোনো কোনো প্রাণী বাঁচার তাগিদে বেশি সংখ্যায় দল গড়ে বা একত্রিত হয়ে অস্থায়ীভাবে বা স্থায়ীভাবে বসবাস করে।	পিঁপড়ে, উইপোকা।
সোসাল এগ্রিগেশন	কিছু উন্নততর পতঙ্গ গোষ্ঠীর মধ্যে কর্ম বিভাগ লক্ষ্য করা যায়।	মৌমাছি, বোলতা।
আন্তঃপ্রজাতি	বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে প্রতিযোগিতা	একটি বনভূমিতে দুটি তৃণভোজী প্রাণীর মধ্যস্থিত সংগ্রাম।

মিথোস্ক্রিয়ার নাম	সংজ্ঞা	উদাহরণ
আন্তঃপ্রজাতি প্রিভেশন বা খাদক	দুটি একই প্রজাতির মধ্যে প্রতিযোগিতা। এই আন্তঃক্রিয়ায় এক প্রজাতি অপরকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে এদের মধ্যে খাদ্য, খাদক সম্পর্ক দেখা যায়।	উদ্ভিদের সংশ্লেষিত খাদ্য তৃণভোজী শস্যভোজী এবং শাকাহারী প্রাণীরা (গরু, ছাগল, হরিণ) খায়। আবার মাংসাশী প্রাণীরা (বাঘ, সিংহ) শাকাহারী প্রাণীদের খায়।
পরজীবীতা বা প্যারাসিটিস্‌ম	যে আন্তঃক্রিয়ায় দুটি জীব একসঙ্গে থাকে এবং একটি অন্যটির তৈরি খাদ্যরস গ্রহণ করে তাকে পরজীবীতা বলে। আশ্রয়দাতাকে পোষক বলে। যে আশ্রয় ও পুষ্টি পেয়ে বড় হয়ে ওঠে তাকে পরজীবী বলে।	গোলকৃমি মানুষের অন্ত্রে অবস্থান করে সেখানে থেকে পুষ্টি সংগ্রহ করে ও পোষকের দেহে বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি করে।
আংশিক পরজীবী	যে সব পরজীবী তাদের জীবনের কিছু সময় পরজীবী হিসাবে এবং বাকী সময় স্বাধীনভাবে বাস করে।	মশা ও ছারপোকা পোষকের উপর শুধু খাদ্যের জন্য নির্ভরশীল কিন্তু বাসস্থানের জন্য নয়।
সম্পূর্ণ পরজীবী	যে সব জীব তাদের সম্পূর্ণ জীবন আশ্রয় দাতার উপর পরজীবী হিসাবে বাস করে।	স্বর্ণলতা ক্লোরফিল বিহীন হওয়ায় খাদ্য তৈরি করতে পারে না। ফলে এরা উদ্ভিদের ওপর সম্পূর্ণ পরজীবী হিসাবে বাস করে।
অ্যান্টিবাইওসিস	কতকগুলি ছত্রাক পরিবেশে অ্যান্টিবায়োটিক বস্তু তৈরি করে যা অন্য জীবের পক্ষে ক্ষতিকারক। এই অ্যান্টিবায়োটিক বহু রোগ সৃষ্টিকারী ব্যাক্টেরিয়াকে ধ্বংস করে।	পেনিসিলিয়াম নোটেটাম, পেনিসিলিন নামক অ্যান্টিবায়োটিক তৈরি করে।
ক্যানিবলিস্‌ম	এই আন্তরক্রিয়ায় পরিবেশে একই প্রজাতির বিভিন্ন সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক দেখা যায়।	পিঁপড়ে, উঁই, আরশোলা, মাছ জাতীয় সরীসৃপে দেখা যায়।

8.5 মানুষের সমাজ এবং পরিবেশ

সমাজ কথাটির ইংরেজী প্রতিশব্দ 'সোসাইটি'। এই সোসাইটি কথাটি এসেছে (একক) বা সোসাইটাস (দল) থেকে। সমাজ বলতে একটি নির্দিষ্ট পরিবেশের কোনো সদস্যের সমষ্টি বা গোষ্ঠীকে বোঝায়। একটি সমাজ অন্য একটি সমাজের থেকে অনেকাংশেই আলাদা হয়। তার কারণ, যে বিভিন্ন পরিবেশের বা প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষ লালিত পালিত হয় তার জৈব ও অজৈব উপাদানগুলো একে অপরের থেকে আলাদা।

মানুষের সমাজে উপজাতি অধ্যুষিত, গ্রাম্য, নাগরিক ও শিল্প প্রভাবিত নানা ধরনের জীবন প্রবাহ দেখা যায়। মানুষ বিভিন্ন পরিবেশে স্বাভাবিক জীবন প্রক্রিয়ার নিয়মে শ্বাস প্রশ্বাস নেয়। আহার, নিদ্রা ও অন্যান্য কাজ করে। তাদের বংশ বিস্তার ঘটে এবং অবশেষে মৃত্যু ঘটে। এইভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন পরিবেশে বংশ পরম্পরায় মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ও সমাজের আকার বড় হয়।

8.5.1 মানুষের আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক পরিবেশ

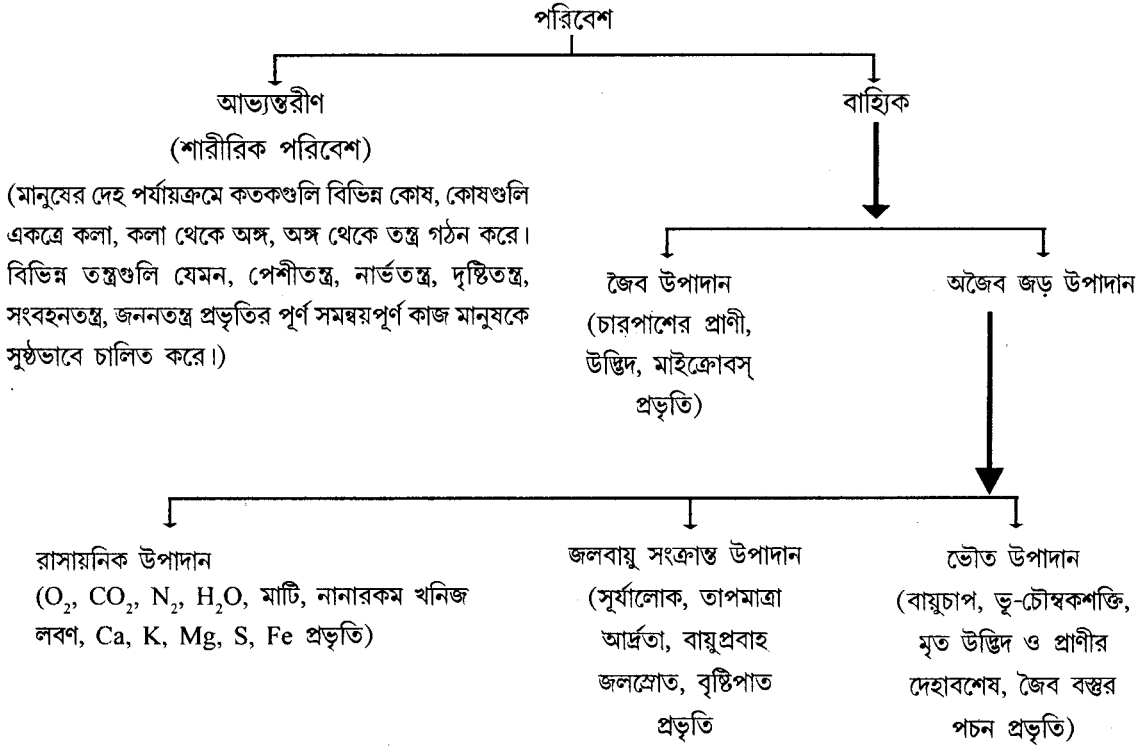

8.5.2 পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান ও মনুষ্য সমাজের দ্বারা তার ব্যবহার

ক) অজৈব পরিবেশ

পরিবেশের উপাদানের নাম	ব্যবহার
(১) পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল পৃথিবীপৃষ্ঠে 60 কি.মি. উচ্চতা পর্যন্ত বিস্তৃত একটি আবরণ পৃথিবীকে ঘিরে একটি বায়ুমণ্ডলের আবরণ সৃষ্টি করে। বায়ুমণ্ডলের উপাদানগুলি নিম্নরূপ ঃ N_2 = 78% O_2 = 21% CO_2 = 0.03% অন্যান্য গ্যাস = 0.07% (H_2, He, Ar, Ne, Cr) জলীয় বাষ্প = সামান্য পরিমাণ	**(ক)** শ্বসনে গ্যাসের আদান প্রদান এবং শারীরিক উষ্ণতার মাত্রা ঠিক রাখা। (খ) বায়ুর মাধ্যমে আকাশযান বা উড়োজাহাজ যেমন যেতে পারে, একইভাবে বায়ুর মাধ্যমেই দূরের মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা সম্ভব। (গ) বায়ুমণ্ডলের ওপরের দিকে ওজোন স্তর বর্তমান। এটি সৌরকিরণের অতি বেগুনী রশ্মি শোষণ করে। (ঘ) এর উপরে আয়নোস্ফিয়ার প্রায় 125 কিমি উচ্চতায় আছে থার্মোস্ফিয়ার, যার প্রধান উপকরণ হলো আয়ন ও মুক্ত ইলেকট্রন। এই স্তরেই বেতার তরঙ্গ হয়ে পৃথিবীতে আসে।

পরিবেশের উপাদানের নাম	ব্যবহার
(২) উষ্ণতা পরিবেশের উষ্ণতা নানা বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল। ঋতু, সময়, অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশ, দিক, মাটির গঠন, উদ্ভিদের স্তর এবং নাগরিক সভ্যতা ও শিল্পের বিস্তৃতি ইত্যাদি।	বিভিন্ন উষ্ণতার জন্য পৃথিবীর পরিবেশও বিভিন্ন হয়।
(৩) জল হাইড্রোস্ফিয়ারের প্রধান উপাদানই হলো জল, আয়তন = 14 কোটি ঘন কি.মি.। তার মধ্যে 97% নোনাজল এবং 3% মিষ্টিজল।	(ক) সাগর জলের প্রধান বাণিজ্যিক ব্যবহার হচ্ছে নৌবাহিনী ও জাহাজ চলাচল। (খ) সমুদ্রতলের প্রচুর জ্বালানী, পেট্রোলিয়াম, গ্যাস এবং ধাতব খনিজ পদার্থ, যেমন—Mn, Co ইত্যাদির সন্ধান পাওয়া গেছে। (গ) বিভিন্ন সামুদ্রিক প্রাণী ও মাছ সমুদ্রগর্ভ থেকে মানুষ খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। (ঘ) অনেক জলজ উদ্ভিদ সমুদ্রে জন্মায়। যেমন, টশবাল, পরফাইরা, ল্যামিনারিয়া উজোরিয়া, নষ্ঠক প্রভৃতি খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। (ঙ) অনেক বাদামী শৈবাল গরু-মোষের খাদ্যে, সার প্রস্তুতিতে, আয়োডিনের উৎস হিসাবে ব্যবহৃত হয়। (চ) ল্যামিনারিয়া থেকে অ্যালজিন পাওয়া যায়। অ্যালজিন আইসক্রিম, ক্যান্ডি, দাঁতের মাজন এবং সজ্জা সামগ্রিতে কাজে লাগে। (ছ) ডায়াটম মৃত্তিকা দাতের মাজন, শিল্প পরিস্রুতিকরণে, শব্দমুক্ত বাড়ি তৈরির জন্য অপরিবাহী হিসাবে, ধাতুর পালিশে ও চিনির শোধনের কাজে ব্যবহৃত হয়। (জ) সবুজ শৈবাল ক্লোরেলা থেকে পাওয়া যায় অ্যান্টিবায়োটিক "ক্লোরেলিন", রোডোমেলা (লোহিত শৈবাল) এবং সাইসোফাইলাম (বাদামী) থেকে অ্যান্টিবায়োটিকের সন্ধান পাওয়া গেছে। (ঝ) সমুদ্রে থিতিয়ে পড়ে দূষিত পদার্থ, কৃষির রাসায়নিক দ্রব্য, কৃত্রিম জৈব রাসায়নিক দ্রব্য, তেজস্ক্রিয় বিকিরণের পদার্থ, তৈল, ভারী ধাতু এবং অন্য কঠিন পদার্থ। (ঞ) মিঠাজল নানাবিধ উপকার সাধন করে। জলপান ছাড়াও স্নান, নানাবিধ পরিস্রুতকরণ, শিল্পে ও কৃষিকার্যে, সেঁচে, বন্যা উদ্ভিদ ও প্রাণীর রক্ষণাবেক্ষণ এই জলে ব্যবহৃত হয়।

পরিবেশের উপাদানের নাম	ব্যবহার
(৪) ভূমিসম্পদ ভূমি একটি প্রাথমিক সম্পদ। ইহা লিথোস্ফিয়ারের প্রধান উপাদান। ভূপৃষ্ঠে এর বিস্তার প্রায় 1,339 কোটি হেক্টর।	(ক) খনিজ সম্পদের ভান্ডার (খ) জলের উৎস (গ) মৃত্তিকার উর্বরতার সঠিক মান বজায় রাখার ক্ষমতা। (ঘ) বহু বন্য প্রাণীর বাসস্থান। (ঙ) কৃষিকার্যে ব্যবহৃত হয়। (চ) বন্য সম্পদের সুযোগ্য ব্যবহার, নাগরিক সম্পদের বিকাশে, বাড়ি, অট্টালিকা তৈরিতে, বৃহৎ রাস্তা প্রকল্পে ও রেলরাস্তা নির্মাণে ব্যবহৃত হয়।

(খ) **মানুষের জৈব পরিবেশ**

মানুষের চারপাশের জৈববস্তু মানুষের জৈব পরিবেশকে তৈরি করে। নীচের বিষয়গুলি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

(১) পুষ্টির যোগাড় ঃ পুষ্টির অভাব হলে জীবের সংখ্যা কমবে।

(২) স্থানের সুলভ সংস্থান ঃ বাসস্থান না থাকলে কোনো মানুষের পক্ষে বাঁচা সম্ভব নয়।

(৩) অন্য প্রাণীর সাথে সম্পর্ক ঃ দুটি বিভিন্ন প্রজাতি বা একই প্রজাতির মধ্যে যে সংগ্রাম চলে তার ফলে কোনো বিশেষ স্থানের জীবের সংখ্যা নিয়ন্ত্রিত হয়।

(৪) আবহাওয়া ঃ অতিরিক্ত উষ্ণতা বা শৈত্যে ঘূর্ণীঝড় ও শীলাবৃষ্টি কোনো নির্দিষ্ট স্থানের জীব সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করে।

(গ) সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ ঃ

সাংস্কৃতিক মূল্যায়ন, রীতিনীতি, অভ্যাস, বিশ্বাস, ধর্ম, শিক্ষা, চাকুরী, জীবনযাত্রার মান গোষ্ঠীজীবন এবং রাজনীতির মধ্যে পড়ে। সঙ্গীত, শিল্প, সাহিত্য, কলা, বেতার, দূরদর্শন ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে মানুষ তার সামাজিক পরিবেশের প্রভাবে প্রভাবিত হয়।

সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশের উপাদানগুলি হলো—

(১) পরিবার ও সমাজ
(২) শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান
(৩) অর্থনৈতিক গঠন
(৪) সামাজিক আদান প্রদান
(৫) শক্তি ও অধিকার
(৬) রীতিনীতি
(৭) সংস্কৃতি

মানুষ তার জ্ঞান, নীতি শিল্প, কলা, আইন, বিধান ও অন্যান্য অভ্যাসের দ্বারা জীবনে যা অর্জন করে তাই সংস্কৃতি। মানুষের সংস্কৃতি প্রভাবিত সামাজিক পরিবেশই সাংস্কৃতিক পরিবেশ। সামাজিক সাংস্কৃতিক অবস্থাই একটি সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক অবস্থাকে বুঝিয়ে দেয়। তার অর্থনৈতিক হাল থেকেই জানা যায় সে কতখানি পরিবেশের প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা করে চলেছে বা ধ্বংস করে চলেছে। ভারতবর্ষে দেখা গেছে যে কোনো বিশেষ সমাজ বা গোষ্ঠীর ক্ষয়িষ্ণু পরিবেশের জন্য আর্থ-সামাজিক বা সামাজিক সংস্কৃতিক পরিবেশও পরিবর্তিত হয়। মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধভাবে মানুষ কোনো বিশেষ পরিবেশে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করে। পরিবেশ মানুষকে লালন পালন করে। মানুষ পরিবেশকে বিভিন্ন ভাবে ব্যবহার করে। সেজন্য মানুষ ও পরিবেশ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

8.5.3 পরিবেশ সম্পর্কে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি

আদিমকালে মানুষ যাযাবর ছিলো। তারা ছিলো অরণ্যাচারী। এছাড়াও তারা জীবিকা নির্বাহের জন্য হিংস্র প্রাণীর সঙ্গে লড়াই করত, শিকার ধরত এবং একইভাবে খাদ্য সংগ্রহ করত। এবং সব সময়েই তাদের পরিবেশের সঙ্গে লড়াই করে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হয়েছে। অনেক সময়ে পরিবেশকে সে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য কাজে লাগিয়েছে। যাযাবরের জীবন সুখকর নয় এই দৃষ্টিভঙ্গির বশবর্তী হয়ে মানুষ স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। পশুপালনকে নতুন জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করে। জমির চাষবাস শুরু করে। এর মাধ্যমে মানুষ খাদ্য উৎপাদন আরম্ভ করল।

সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ পরিবেশকে বন্ধু হিসাবে মেনে নিতে শুরু করল। পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণে এনে এবং পরিবেশের অনুকূল প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে গতিশীলতা নিয়ে এলো। যখনই মানুষ বুঝতে পারল পরিবেশ থেকে মানুষের অনেক কিছু পাওয়ার আছে তখন সে পরিবেশকে ধ্বংস না করে নানারকম দূষণরোধ কর্মসূচি গ্রহণ করল।

পরিবেশের ওপর মানুষের কাজকর্মের প্রভাব

মানুষের বিভিন্ন কার্যকলাপ পরিবেশকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে। প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নয়ন ও ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে পরিবেশ বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

১। **দূষণ সংক্রান্ত সমস্যা ঃ** মানুষ তার চাহিদা পরিতৃপ্ত করার জন্য প্রাকৃতিক সম্পদকে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করে এবং এরই ফলশ্রুতি বিভিন্ন দূষণ। যেমন—(১) বায়ুদূষণ, (২) জলদূষণ, (৩) মৃত্তিকাদূষণ।

২। **প্রত্যক্ষ প্রভাব ঃ** মানুষের কাজকর্ম পরিবেশের ওপর কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করে। যেমন—ভূমিক্ষয়ের ফলে উদ্ভিদ আচ্ছাদন নষ্ট হয়ে যায় ও খাদ্য দ্রব্যের যোগান কমে যায়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বাসস্থান, বিদ্যালয়, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, পয়ঃপ্রণালী জলসরবরাহ প্রভৃতির জন্য জমির প্রয়োজন দেখা যায়। পরিবেশের স্থিতিশীলতার অভাবে সামাজিক আন্তঃ পরিকাঠামো বিঘ্নিত হয়।

৩। **পরোক্ষ প্রভাব ঃ** পরিবেশ দূষণের ফলে জল, স্থল ও বায়ুমণ্ডলের বসবাসকারী বিভিন্ন প্রকারের জীবজন্তু, পশুপাখী, কীটপতঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং পরিবেশের ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়।

কারখানা থেকে অবিরত সালফার-ডাই-অক্সাইড (SO_2) নির্গমণের ফলে বাতাসে সালফিউরিক অ্যাসিডের (H_2SO_4) সৃষ্টি হয়, যা বায়ুমণ্ডলকে দূষিত করে। কখন কখনও অ্যাসিড বৃষ্টি ও তুষারপাত হওয়ার সম্বাবনা থাকে। প্রচুর শস্য ও প্রাণহানিও হতে পারে।

পরিবেশ দূষণের ফলে মানুষের মন, স্বাস্থ্য, চারুকলা, সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়।

8.6 সারাংশ

ভূতাত্ত্বিক সময়সারণী অনুযায়ী আমরা উদ্ভিদ ও প্রাণীদের উদ্ভব, বিস্তার এবং ক্ষেত্রবিশেষে অবলুপ্তির একটি বৈজ্ঞানিক চিত্র পাই। শুধু তাই নয়, এর সঙ্গে পরিবেশের পরিবর্তনের দারা সম্পর্কেও একটি চিত্র দেখতে পাই। পরিবেশের জৈবিক উপাদান সম্পর্কে প্রাণী ও উদ্ভিদের ভূমিকা অসীম। বিবিধ বাস্তুতন্ত্রে খাদ্যজালের মাধ্যমে প্রতিটি জীব যুক্ত এবং এই সম্পর্ক পরিবেশের শৃঙ্খলাকে বজায় রাখতে সাহায্য করে। পরিবেশ সম্পর্কে যে কোনো আলোচনার গোড়াতেই আসে মানুষের কথা। মানব সমাজের ধারা, শিল্প বিপ্লব, বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি প্রভৃতি পরিবেশের ওপর দারুণভাবে প্রভাব ফেলেছে—পরিবেশ আন্দোলন সংগঠিত হচ্ছে আজ। পরিবেশের অস্তিত্ব, মানবসভ্যতার ভবিষ্যত আজ অনেকটাই নির্ভর করছে মানুষের সদিচ্ছা, সঠিক প্রয়োগ ও প্রকৃত পরিবেশ রক্ষার মানসিকতার ওপরে।

8.7 প্রশ্নাবলী

1. সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন ঃ

(a) পরিবেশ শব্দটির অর্থ কি?
(b) পরিবেশের বিভিন্ন ধারাগুলি কি কি?
(c) পৃথিবীর উৎপত্তির শুরু থেকে বিভিন্ন ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ কর।
(d) পৃথিবীই জীবকূলের একমাত্র বাসস্থান—তার সপক্ষে যুক্তি দাও।
(e) পৃথিবীর উপাদানগুলি কি কি?
(f) ভূতাত্ত্বিক সময় সারণীর প্যালিওজোয়িক ও ক্যাম্বিয়ান যুগে কি কি প্রাণীর উদ্ভব ঘটেছে?
(g) স্বাভাবিক অবস্থায় পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে কোন্ কোন্ গ্যাস কত পরিমাণে আছে?
(h) বাস্তুতন্ত্র কি? এর অজৈব উপাদানগুলি কি কি ?
(i) পরজীবীতা কাকে বলে?
(j) সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিবেসের উপাদানগুলি কি কি?
(k) পজিটিভ মিথোক্রিয়া কয়প্রকার ও কি কি? উদাহরণ সহযোগে লেখ।

2. শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

(a) জীবমণ্ডলকে প্রধানত তিনভাগে ভাগ করা যায়। ভাগ গুলি হলো _____ , _____ ও _____।
(b) ম্যানটেলের তিনটি উপস্তর। একেবারে ভিতরের স্তরটি _____ ও _____ ধাতু দ্বারা গঠিত।
(c) বায়ুমণ্ডল পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে _____ কি.মি. উচ্চতা পর্যন্ত বিস্তৃত।
(d) জীবনের মূল রাসায়নিক উপাদানটি হল _____।
(e) মানুষের উদ্ভব হয় _____ যুগে।
(f) বায়ুমণ্ডলের হাল্কা গ্যাস দুটি _____ ও _____।
(g) যারা নিজেদের খাদ্য নিজেরা তৈরি করতে পারে তাদের _____ বলে।
(h) লাইকেন একটি _____ উদাহরণ।

(i) বড় জীবগুলি ছোট জীবদের খায়, একে _____ বলে।

3. প্রথম স্তম্ভের শব্দ বা শব্দগুচ্ছের সাথে দ্বিতীয় স্তম্ভে শব্দ বা শব্দগুচ্ছের মিল দেখাতে হবে।

1. বিয়োজক	(a) একটি নির্দিষ্ট প্রাণি প্রজাতির সম্বন্ধে একটি নির্দিষ্ট পরিবেশ সংক্রান্ত অধ্যায়ন।
2. কার্বোনিফেরাস	(b) উৎপাদক থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ পর্যায়ের খাদক পর্যন্ত জীবের সংখ্যা ক্রমশ কমতে থাকে।
3. অটোইকোলজি	(c) প্রাকৃতিক পরিবেশে বসবাসকারী দুটি ভিন্ন প্রজাতির মধ্যে একটি উপকৃত হয় অপরটির কোনো ক্ষতি নাও হতে পারে।
4. সংখ্যা পিরামিড	(d) বিভিন্ন প্রকারের অনুজীব, ব্যাক্টেরিয়া, ভাইরাস প্রমুখ।
5. কমেনসালিজম্	(e) প্রথম সরীসৃপের উদ্ভব।

4. দীর্ঘ উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

(a) পৃথিবীর উদ্ভব ও বিবর্তন সম্পর্কে আলোচনা কর।

(b) ভূতাত্ত্বিক সময়সারণী থেকে কোন্ কোন্ প্রাণীর উদ্ভব কোন্ যুগে হয়েছিল তা বিস্তারিত আলোচনা কর।

(c) বাস্তুতন্ত্রের বিভিন্ন উপাদানগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় কর।

(d) খাদ্য শৃঙ্খল, খাদ্য জালক ও খাদ্য পিরামিড ও শক্তিপ্রবাহ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা কর।

(e) মনুষ্য সমাজ ও পরিবেশ একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত—আলোচনা করুন।

5. তুলনা করুন ঃ

(a) খাদ্য জালক ও খাদ্যশৃঙ্খল

(b) পরিবেশের ভৌত ও সজীব উপাদান

(c) লিম্নোলজি ও টেরেস্ট্রিয়াল ইকোলজি

8.8 উত্তরমালা

অনুশীলনী 1

(a) — 8.2
(b) — 8.2
(c) — 8.3.2
(d) — 8.3.2
(e) — 8.3.4
(f) — 8.3.9
(g) — 8.3.7

(h) — 8.4.1

(i) — 8.4.6

(j) — 8.5.2

(k) — 8.4.6

অনুশীলনী 2

(a) — বারি জীবমণ্ডল, অশ্ব জীবমণ্ডল, বায়ু জীবমণ্ডল

(b) — নিকেল (N) ও লৌহ (Fe)

(c) — 600 কিলোমিটার

(d) — অ্যামাইনো অ্যাসিড

(e) — কুয়াটারনারী

(f) — হাইড্রোজেন, হিলিয়াম

(g) — স্বভোজী

(h) — মিউচুয়ালিজম্

(i) — ক্যানিবলিজম্

অনুশীলনী 3

(1) — d

(2) — e

(3) — a

(4) — b

(5) — c

অনুশীলনী 4

(a) — 8.3

(b) — 8.3.9

(c) — 8.4

(d) — 8.4.3

(e) — 8.5

অনুশীলনী 5

(a) — 8.4.3

(b) — 8.4.2

(c) — 8.4.1

একক 9 ❑ পরিবেশের অবক্ষয় (Environmental degradation)

গঠন

9.1 প্রস্তাবনা

উদ্দেশ্য

9.2 দূষণের প্রকৃতি ঃ একটি প্রাথমিক পাঠ

9.3 বায়ুদূষণ ঃ সংজ্ঞা

9.3.1 বায়ুমণ্ডলের স্বাভাবিক উপাদান ও কাজ

9.3.2 বায়ুদূষণের প্রকৃতি

9.3.3 বায়ুদূষণের শ্রেণীবিভাগ

9.3.4 বায়ুদূষক ও তাদের উৎস

9.3.5 গ্রীন হাউস এফেক্ট

9.3.6 ওজোন (O_3) আবরণে ক্ষয় ও ওজোন গহ্বর

9.3.7 অম্লবৃষ্টি

9.3.8 আলোক রাসায়নিক ধোঁয়াশা

9.3.9 বায়ুদূষণ ও তার ফলাফল

9.3.10 বায়ুদূষণের নিয়ন্ত্রণ

9.4 জল দূষণ

9.4.1 জল ও তার উৎস

9.4.2 জলদূষণের প্রকৃতি

9.4.3 মিষ্টি জলের দূষণ

9.4.4 সামুদ্রিক জলের দূষণ

9.4.5 ভূগর্ভস্থ জলের দূষণ

9.4.6 জলদূষক পদার্থগুলির নাম ও তাদের ক্ষতিকারক প্রভাব

9.4.7 জলদূষণ নিয়ন্ত্রণ

9.5 শব্দ দূষণ

9.5.1 শব্দ সৃষ্টির পদ্ধতি ও শব্দ দূষণ

9.5.2 শব্দ দূষণ পরিমাপের পদ্ধতি

9.5.3 শব্দ দূষণের প্রকৃতি

9.5.4 শব্দ দূষণের উৎস

9.5.5 মানুষের স্বাস্থ্যের ওপর শব্দ দূষণের ক্ষতিকারক প্রভাব
9.5.6 শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ

9.6 সারাংশ

9.7 প্রশ্নাবলী

9.8 উত্তরমালা

9.1 প্রস্তাবনা ও উদ্দেশ্য

প্রস্তাবনা

দূষণ হচ্ছে এমন এক বিপজ্জনক অবস্থা যা জীবমণ্ডলের ভৌত রাসায়নিক পরিবর্তনকে সূচিত করে। এক কথায় পরিবেশের কোন অবাঞ্ছনীয় পরিবর্তনই দূষণ। বিভিন্ন দূষণের মাধ্যমে এই পরিবর্তন সূচিত হয়। বায়ু, জল, শব্দের মাত্রায়, মৃত্তিকায়, এমনকি দৃশ্যদূষণ বা সামাজিক দূষণও আজ বহু চর্চিত বিষয়। বিশেষতঃ কৃষি ও শিল্প বিপ্লবের হাত ধরেই বেড়ে চলেছে দূষণের মাত্রা যা বর্তমানে এক ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। আজ অভিধানে ঢুকে পড়েছে অম্লবৃষ্টি, গ্রীনহাউস এফেক্ট, ওজোন গহ্বর, এল নিনো প্রভৃতি শব্দ। আজ আমরা বেশি বেশি করে জানতে পারছি কিভাবে দূষণের প্রভাবে মানুষের পরিবেশ এবং স্বাস্থ্য ক্ষতিগ্রস্থ হয়। দূষণের কারণ অনুসন্ধান, তার প্রকৃতি নির্ণয় এবং দূষণের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ হলে তবেই দূষণের হাত থেকে সভ্যতার সার্বিক মুক্তিলাভ সম্ভব।

উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি—

- দূষণ সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা পাবেন।
- দূষণের প্রকৃতি কি তা জানতে পারবেন।
- দূষণের বিভিন্ন উৎসগুলি সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা পাবেন।
- দূষণের ফলাফল সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- দূষণের নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে একটি ধারণা পাবেন।
- সর্বোপরি বিভিন্ন পরিবেশে দূষণের কুফল ও তার প্রভাব জানতে পারবেন।

9.2 দূষণের প্রকৃতি : একটি প্রাথমিক পাঠ

বিশ্বব্যাঙ্কের এক সমীক্ষায় ধরা পড়েছে যে মানুষের আর্থিক ও শারীরিক ক্ষয়ক্ষতির বেশিরভাগ কারণই হচ্ছে জল ও বায়ুদূষণ, যার মূল্য বছরে প্রায় 24,500 কোটি টাকা। বনাঞ্চল ধ্বংস ও চাষযোগ্য জমির ক্ষতির মূল্য 9,450 কোটি টাকা। সামগ্রিকভাবে পরিবেশের যে ক্ষয়ক্ষতির মূল্য নির্ধারিত হয়েছে তার 59% এর জন্য দায়ী জলদূষণ। এই রিপোর্টে বলা হয়েছে শুধু বায়ুদূষণের জন্য ভারতের 36টি শহরে এক বছরে 40 হাজার মানুষের আকাল মৃত্যু হয়েছে। শুধু দিল্লীতেই বছরে মৃত্যুর সংখ্যা 7,500। বিশ্ব

স্বাস্থ্য সংস্থার (World Health Organisation) সুপারিশে স্বাস্থ্যের সুস্থতা সম্পর্কে যে মান দেওয়া হয়েছে ভারতের 23 টি শহরে বায়ুদূষণের পরিমাণ তার থেকে অনেক বেশি। সুতরাং এটা বোঝা যাচ্ছে যে, সামগ্রিকভাবে জল ও বায়ুদূষণের চিত্র আমাদের দেশে ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। এর সঙ্গে অন্যান্য দূষণও যুক্ত হয়েছে, যেমন—শব্দদূষণ। বর্তমান সময়ে দূষণ অতিমাত্রায় বেড়ে যাবার কারণ হিসাবে বলা যায় বেশি পরিমাণে শক্তির ব্যবহার, অপরিকল্পিত শিল্পায়ন, অতিরিক্ত গাড়ির সংখ্যা, জ্বালানীর অপব্যবহার, জঙ্গল কেটে ফেলা, পরিবেশের তাৎক্ষণিক ব্যবহার ও লাভের প্রচেষ্টা ইত্যাদি।

পরিবেশ দূষণের ভাবনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্তর আছে। যেমন, আন্তর্জাতিক, জাতীয় এবং আঞ্চলিক। দূষণের প্রতিকারের ক্ষেত্রে প্রতিটি স্তরেই আলোচনা ও প্রয়োগের প্রয়োজন। এর সঙ্গে সম্পদের ব্যবহার এবং প্রযুক্তির সঠিক প্রয়োগ ও অর্থনৈতিক প্রশ্নগুলিও একইভাবে প্রাসঙ্গিক। জীবনধারণের শর্ত হিসাবেই জল ও বায়ুর ব্যবহার, শব্দের উৎপত্তি ও তার ক্ষেত্রবিশেষে উপযোগিতা (যেমন, কথা বলা) ইত্যাদি খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। প্রশ্ন হচ্ছে, এদের মাত্রা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থেকে তা ঠিকঠাক নিয়ন্ত্রণ করা। দুঃখের বিষয় আমরা কিন্তু এ ব্যাপারে উদাসীন থেকেছি। তাই দূষণ আজ শুধু কোনো বিশেষ দেশ, জাতি বা সম্প্রদায়ের সমস্যা নয়—এটি সামগ্রিকভাবে মানুষের সভ্যতার অস্তিত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত।

9.3 বায়ুদূষণ (Air-pollution)

প্রাকৃতিক বা মনুষ্যসৃষ্ট কারণে বায়ুমণ্ডলে কঠিন বর্জ্য পদার্থ অথবা অপ্রয়োজনীয় দূষণ পদার্থ (Pollutent) তৈরি হওয়ার ফলে বায়ুর উপাদানের পরিমাণ যদি স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি কমে বা বেড়ে যায় তাহলে সেই বায়ুকে দূষিত বায়ু ও দূষণকে বায়ুদূষণ বলে।

9.3.1 বায়ুমণ্ডলের স্বাভাবিক উপাদান ও তাদের কাজ

ভূপৃষ্ঠের ওপরে যে গ্যাসীয় আবরণ পৃথিবীকে ঘিরে রেখেছে তাকে বায়ুমণ্ডল বলে। বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন গ্যাসের স্বাভাবিক উপাদান ও তাদের শতকরা পরিমাণ নিম্নে দেওয়া হল—

নাইট্রোজেন (N_2)	78.08%
অক্সিজেন (O_2)	20.95%
কার্বন-ডাই অক্সাইড (CO_2)	0.035%
জলীয় বাষ্প, হাইড্রোজেন (H_2) ওজোন (O_3), আর্গন (Ar) নিয়ন (Ne), হিলিয়াম (He), ক্রিপটন (Cr), জেনন (Xe), মিথেন (CH_4) প্রভৃতি গ্যাস।	0.935%

বায়ুর বিভিন্ন প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহের কাজ নিম্নে দেখানো হল—

১। অক্সিজেন (O_2)	● জীবদেহে শ্বাসকার্য চালাতে সাহায্য করে ও প্রাণীদেহে শক্তি ও তাপ বৃদ্ধি করে।
২। নাইট্রোজেন (N_2)	● জীবের প্রোটিন জাতীয় খাদ্য তৈরি করতে সাহায্য করে। ● অনেক ব্যাক্টেরিয়া বাতাস থেকে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে এবং জীবজগৎ এই নাইট্রোজেন ব্যবহার করে।
৩। কার্বন-ডাই অক্সাইড (CO_2)	● এর সাহায্যে উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় শর্করা জাতীয় খাদ্য তৈরি করে। ● পৃথিবীর তাপবণ্টন ও প্রতিফলনের ক্ষেত্রেও এর প্রভাব আছে।
৪। জলীয় বাষ্প	● বৃষ্টিপাত ও তুষারপাত ঘটে এবং মেঘ, শিশির ও কুয়াশার সৃষ্টি হয়।
৫। ওজোন (O_3)	● সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মি শোষণ করে পৃথিবীর জীবকূলকে বসবাসের উপযোগী করে তুলেছে।

9.3.2 বায়ু দূষকের প্রকৃতি

বায়ু দূষকের উৎসের প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে বায়ু দূষককে দুইভাগে ভাগ করা যায়—প্রাথমিক ও গৌণ বায়ুদূষক। নিম্নে দুই প্রকার দূষকের সম্পর্কে জানানো হল।

নাম	বিবরণ
ক। **প্রাথমিক দূষক** (উৎস থেকে সরাসরি বায়ুতে নির্গত হয়)	**আয়তন ঃ** ক্ষুদ্র বস্তু (1μ ব্যাসার্ধের কম), বড় বস্তু (100μ ব্যাসার্ধ থেকে বড়) **উদাহরণ ঃ** ধুলোকণা, ছাই, ধোঁয়া, সালফার গুঁড়ো, নাইট্রোজেনের অক্সাইড, কার্বন-মনো-অক্সাইড (CO), হ্যালোজেন, জৈবীয় পদার্থ, অ্যারোম্যাটিক হাইড্রোকার্বন ও তেজস্ক্রিয় পদার্থ। এছাড়া বিভিন্ন ধাতু, পরাগরেণু, ব্যাক্টেরিয়া প্রভৃতি।
খ। **গৌণ দূষক** (দুই বা ততোধিক প্রাথমিক বায়ু দূষকের সংমিশ্রণে তৈরি)	**উদাহরণ ঃ** ওজোন (O_3), সালফার-ট্রাই-অক্সাইড (SO_3), নাইট্রোজেন- ডাই-অক্সাইড (NO_2), ফরম্যালডিহাইড (HCHO), সালফিউরিক অ্যাসিড (H_2SO_4) এবং বিভিন্ন অ্যালডিহাইড ও কিটোন (CO), পার-অক্সি-অ্যাসিটাইল নাইট্রেট (PAN) প্রভৃতি।

দূষকের উৎসের ওপর নির্ভর করে বায়ু দূষককে আবার দুইভাগে ভাগ করা হয়। প্রাকৃতিক বায়ু দূষক ও মনুষ্য সৃষ্ট বায়ুদূষক। নিম্নে দুটি শ্রেণীর বায়ুদূষকের উৎস ও তাদের বিবরণ দেওয়া হল।

১। প্রাকৃতিক বায়ুদূষক

উৎস	নাম ও বিবরণ
(ক) উদ্ভিদ	● সপুষ্পক ও নগ্নজীবী উদ্ভিদের রেণু, পচনশীল উদ্ভিদ সৃষ্ট মিথেন (CH_4) ও হাইড্রোজেন সালফাইড (H_2S)। ● কীট পতঙ্গ উদ্ভিদের রেণু বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে গিয়ে বংশ বিস্তারে সাহায্য করে। ● উদ্ভিদ ও দাবানল থেকে সৃষ্ট কার্বন-মনো-অক্সাইড (CO)।
(খ) এরোসল	সোডিয়াম ক্লোরাইড (Nacl), বিভিন্ন ধরনের সালফেট (SO_4) যেমন— ম্যাগনেশিয়াম সালফেট ($MgSO_4$), বিভিন্ন শক্ত তরল জাতীয় পদার্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণুতে বিভক্ত হয়ে বাষ্পীয় গ্যাসের মধ্যে ভেসে থাকে। **উদাহরণ ঃ** (১) **ধুলো**—একটি শক্ত পদার্থের কণা যা বাতাসে বা অন্যান্য গ্যাসের মধ্যে ভেসে থাকে। এর ব্যাস সাধারণতঃ 20μ এর মতো। এই ধুলোকণা জৈব ও অজৈব পদার্থের সংমিশ্রণে তৈরি। (২) **ধোঁয়া**— সূক্ষ্মভাগে বিভক্ত পদার্থ দিয়ে তৈরি যা অসম্পূর্ণভাবে দাহ্য হলে তার থেকে ধোঁয়া উৎপন্ন হয়। এর আয়তন 1μ এর কম। (৩) **কুয়াশা**— তরল পদার্থ থেকে উৎপন্ন হয়। (৪) **বাষ্প**— বিভিন্ন পদার্থ নানারূপ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে বাষ্পে পরিণত হয়।
(গ) মাটি	ধুলো, ছত্রাক, ব্যাক্টেরিয়া ও ভাইরাস।
(ঘ) সমুদ্র	লবণ কণা।
(ঙ) আগ্নেয়গিরি	কার্বন-মনো-অক্সাইড (CO), অন্যান্য গ্যাস, ছাই, ধুলো, ধোঁয়া ইত্যাদি।
(চ) মহাজাগতিক বস্তু	মহাজাগতিক রশ্মি, উল্কা, ধূমকেতু থেকে নিক্ষিপ্ত ধূলিকণা ইত্যাদি।

২। মনুষ্য সৃষ্ট বায়ুদূষক

উৎস	নাম ও বিবরণ
(ক) গ্যাসীয় পদার্থ	বিভিন্ন শিল্প ও কারখানা, যানবাহন, কয়লা, পেট্রল থেকে নির্গত গ্যাস ও ধোঁয়া।
(খ) কঠিন বর্জ্য	কল-কারখানা থেকে নির্গত কঠিন পদার্থ।
(গ) তাপ	শিল্প কারখানা ও নানা ধরণের প্রকল্প থেকে নির্গত তাপ।
(ঘ) তেজস্ক্রিয় পদার্থ	পারমাণবিক জ্বালানি, বিস্ফোরণ ও বিদ্যুৎকেন্দ্র।

একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে 50 শতাংশ বায়ুদূষণ হয় বিভিন্ন মোটর গাড়ি চলাচলের মাধ্যমে। 30-35 শতাংশ দূষণ বিভিন্ন কলকারখানা এবং বাকী 15-20 শতাংশ দূষণ হয় অন্যান্য উৎস থেকে।

9.3.3 বায়ুদূষকের শ্রেণীবিভাগ নিম্নের সারণীতে লিপিবদ্ধ করা হল ঃ

শ্রেণী	উদাহরণলিপিবদ্ধ
১। সালফার ঘটিত পদার্থ	সালফার-ডাই-অক্সাইড (SO_2), সালফার-ট্রাই-অক্সাইড (SO_3), হাইড্রোজেন সালফাইড (H_2S)
২। নাইট্রোজেন ঘটিত পদার্থ	নাইট্রাস অক্সাইড (NO), নাইট্রোজেন-ডাই-অক্সাইড (NO_2), অ্যামোনিয়া (NH_3)
৩। অক্সিজেন ঘটিত পদার্থ	ওজোন (O_3), কার্বন-মনো-অক্সাইড (CO), কার্বন-ডাই-অক্সাইড (CO_2)
৪। হ্যালোজেন জাতীয় পদার্থ	হাইড্রোজেন ফ্লুরাইড (HF) ও হাইড্রোজেন ক্লোরাইড (HCl)
৫। জৈব পদার্থ	অ্যালডিহাইড, হাইড্রোকার্বন
৬। রেডিও অ্যাকটিভ পদার্থ	বিভিন্ন রেডিও অ্যাকটিভ গ্যাস

9.3.4 বিভিন্ন বায়ুদূষক ও তাদের উৎসগুলি নীচের সারণীর মাধ্যমে লেখা হলঃ

নাম	উৎস
১। সালফার-ডাই-অক্সাইড (SO_2)	কয়লার দহনে, পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যে, জ্বালানি গ্যাসে, খনিজ খনন কার্যে, মিউনিসিপ্যাল ও প্রকাশ্যে আবর্জনা পোড়ানোর সময় উৎপন্ন হয়।
২। হাইড্রোজেন সালফাইড (H_2S) যথা—মিথাইল মারক্যাপটস, (CH_3SH), মিথাইল সালফাইড (CH_3SCH_3) উল্লেখযোগ্য	কাগজের কারখানায়, পেট্রোলিয়াম পরিশোধিত কারখানায়, রেয়নের কারখানায়, কোকোভেন প্লান্টে, বিভিন্ন রাসায়নিক কারখানায়, বিভিন্ন জৈবিক জিনিস পচনস্থলে, জল ও সমুদ্র থেকে, ভূমিকম্প ও প্রাকৃতিক জলের ঝরণাধারায় উৎপন্ন হয়।
৩। নাইট্রোজেন অম্লজান ঘটিত পদার্থ	নাইট্রিক অ্যাসিড (HNO_3) তৈরির কারখানায়, হিট-বারনার, চুল্লী, পাওয়ার প্ল্যান্ট, গাড়ির গ্যাস বহির্নির্গমনের পাইপ থেকে উৎপন্ন হয়।
৪। নাইট্রোজেনের অক্সাইড	যানবাহন, এক্সস্ট ও রিমকয়লা থেকে উৎপন্ন হয়।
৫। অ্যামোনিয়া (NH_3)	রাসায়নিক প্রক্রিয়া-রঙ প্রস্তুতি, দাহ্য পদার্থ, ল্যাকার ও সার তৈরির কারখানায় উৎপন্ন হয়।
৬। হাইড্রোজেন সায়ানাইড (HCN)	ফিউমিগেশন, ব্লাস্ট চুল্লী, রাসায়নিক প্রস্তুতি, ধাতব পাত তৈরির কারখানা থেকে উৎপন্ন হয়।
৭। ক্লোরিন (Cl) ও হাইড্রোজেন ক্লোরাইড (HCl)	অম্লবৃষ্টি থেকে, তুলা ও ময়দা ব্লিচ করতে, জল পরিশ্রুত করতে, রাসায়নিক বস্তু তৈরিতে উৎপন্ন হয়।
৮। হাইড্রোজেন ফ্লুরাইড (HF)	পেট্রোলিয়াম শোধনাগার থেকে, কাঁচ কাটা ও ফসফেট সার কারখানায়, অ্যালুমিনিয়াম তৈরির কারখানায়, ইটভাটা, মৃৎশিল্পে, এনামেল ফ্যাক্টরীতে পাওয়া যায়।

নাম	উৎস
৯। কার্বন-মনো-অক্সাইড (CO)	কার্বনজাত দ্রব্য অর্ধদাহ্য হলে এই গ্যাস তৈরি হয়। দহন ক্রিয়ায় ও গাড়ির ধোঁয়া নির্গত হওয়ার পাইপ থেকে উৎপন্ন হয়।
১০। ওজোন (O_3)	দহন-ক্রিয়া ও সূর্যরশ্মির সংযোগে এই গ্যাসের উৎপত্তি হয়।
১১। অ্যালডিহাইড (CHO)	গ্যাসোলিন, ডিজেল তেল, জ্বালানি তেল, প্রাকৃতিক গ্যাসের দহন ক্রিয়া ছাড়াও লুব্রিকেটিং ওয়েলের দহনের ফলে উৎপন্ন হয়।
১২। জৈব গ্যাস বায়ুমন্ডলে পৌঁছে এদের প্রচুর পরিবর্তন হয়। শেষ পর্যন্ত এরা কুয়াশায় পর্যবসিত হয়।	প্যারাফিন, ওলিফিন, অ্যাসিটিলিন, সুগন্ধ হাইড্রোকার্বন, ক্লোরিন যুক্ত হাইড্রো কার্বন থেকে, গাড়ির তেল, বাড়ি পোড়ানোর জিনিস এবং পেট্রলজাত পদার্থ থেকে উৎপন্ন হয়।
১৩। তেজস্ক্রিয় রশ্মিযুক্ত গ্যাস	আনবিক বোমা পরীক্ষার সময়, কৃষিকার্যে, শিল্প কারখানায়, চিকিৎসাশাস্ত্রে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া আইসোটোপ তৈরির সময়, আনবিক জ্বালানির প্ল্যান্ট নতুন করে ভর্ত্তির সময়ও এই গ্যাস ব্যবহৃত হয়।
১৪। আরসাইন গ্যাস (আর্সেনিক যুক্ত গ্যাস)	ধাতু ও অম্লের রাসায়নিক প্রক্রিয়ায়, আর্সেনিকের ঝালাই কার্যের ফলে উৎপন্ন হয়।
১৫। ফসজিন (কার্বোণিল ক্লোরাইড, $CoCl_2$)	বিভিন্ন রাসায়নিক ও রঙ প্রস্তুতির কারখানা থেকে উৎপন্ন হয়।
১৬। সীসা (Pb)	গ্যাসোলিন, রঙ, সংরক্ষিত ব্যাটারীর পাইপ থেকে যেসব ধোঁয়া নির্গত হয়।
১৭। ক্যাডমিয়াম (Cd)	কয়লা, দস্তার খনি, প্লাস্টিক জিনিস পোড়ানো, ধাতব দ্রব্য পরিশ্রুত করা এবং তামাকের ধোয়া প্রভৃতি থেকে ক্যাডমিয়াম নির্গত হয়।
১৮। নিকেল (Ni)	কয়লা, ডিজেল, নিঃশেষিত তেল, তামাকের ধোঁয়া, রাসায়নিক ইস্পাত ও অন্যান্য কয়েকটি ধাতব জিনিস তৈরির সময় নিকেল নির্গত হয়।
১৯। পারদ (Hg)	জীবাশ্ম, জ্বালানি, রঙ, ওষুধের কারখানা এবং অন্যান্য কারখানা থেকে বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য নির্গত হয়।

9.3.5 পৃথিবীর ওপর গ্রীন হাউসের প্রভাব (Green-House effect)

গ্রীন হাউস প্রভাবের কারণ ও ফলাফল নিম্নে বর্ণিত সারণী থেকে স্পষ্ট জানা যায়।

কারণ	ফলাফল
পৃথিবীতে সূর্য থেকে যে পরিমাণ তাপ বিকিরিত হয় তার 51 শতাংশ ভূমি শোষণ করে এবং বাকী অংশ নানা পদ্ধতিতে বিক্ষিপ্ত ও প্রতিফলিত হয়। এর ফলে পৃথিবী একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রা ধরে রাখে। বায়ু দূষণের ফলে বায়ুমন্ডলের বিভিন্ন গ্যাস যেমন, কার্বন-ডাই-অক্সাইড (CO_2), মিথেন (CH_4) প্রভৃতির পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার ফলে পৃথিবী গ্রীন হাউসের মতো কাজ করছে। এই গ্যাসসমূহ পৃথিবীর চারদিকে একটা আবরণের সৃষ্টি করেছে। ফলে সৌর বিকিরণ পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে যেতে পারে না। এর ফলে পৃথিবীতে উত্তাপের আধিক্য পরিলক্ষিত হয়।	১। পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার ফলে আন্টার্টিকা, গ্রীনল্যান্ড ও পর্বত গাত্রে অবস্থিত হিমবাহ ও বরফের স্তর গলে জলতলের উচ্চতা বেড়ে যাবে। ভূপৃষ্ঠের উপকূলবর্তী এলাকা প্লাবিত হলে 60 শতাংশ উপকূলের বাসিন্দারা বাসস্থান হারাবে। ২। জলস্তর বৃদ্ধির তালিকায় রয়েছে ইন্দোনেশিয়া, চীন, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড, বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্থান, আফ্রিকার মোজাম্বিক, মিশর, নাইজিরিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ, ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা প্রভৃতি দেশের উপকূলবর্তী এলাকা। ৩। বায়ুমন্ডলের পরিবর্তনের জন্য ঝড়, বৃষ্টি, সাইক্লোন, খরা, বন্যা প্রভৃতি বেশি করে দেখা যাবে। এছাড়া ম্যালেরিয়া, কলেরা, প্লেগ প্রভৃতি বিভিন্ন সংক্রামক রোগ মহামারীর মতো পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে।

যে সমস্ত গ্যাসগুলি গ্রীন হাউস প্রভাবের জন্য দায়ী তাদের উৎস ও প্রভাব নিম্নের সারণীতে প্রকাশ করা হল।

গ্যাসের নাম	উৎস	প্রভাব
১। কার্বন-ডাই-অক্সাইড (CO_2)	● জীবাশ্মঘটিত জ্বালানী (খনিজতেল, কয়লা প্রভৃতি) ব্যবহারের ফলে। ● শিল্প কারখানা ও মোটর গাড়ি ব্যবহারের ফলে। ● সিমেন্ট উৎপাদন কারখানা থেকে। ● অরণ্য সংহার ও সবুজ নিধনের ফলে CO_2 এর পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।	● পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে হিমযুগে কার্বন ডাই অক্সাইডের যে পরিমাণ ছিল আজ তা বেড়েছে প্রায় 1800 কোটি টনের মতো, 0.5% হারে এই বৃদ্ধি ঘটেছে। ● পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ এইভাবে বৃদ্ধি পেলে আগামী শতাব্দীতে পৃথিবীর তাপমাত্রা প্রায় 36° সেলসিয়াস বেড়ে যাবে।

গ্যাসের নাম	উৎস	প্রভাব
২। মিথেন (CH_4)	● জলাভূমি ও কৃষিক্ষেত্রে গাছপালা প্রভৃতির পচনের ফলে, বিভিন্ন জৈব বর্জ্যে, কিছু জীবজন্তুর সাহায্যে এবং তেলখনি থেকে মিথেনের সৃষ্টি হয়। ● ভারত, চীন বিভিন্ন দেশগুলির জলমগ্ন ধানক্ষেতগুলি মিথেনের বড় উৎস হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে।	● মিথেনের তাপধারণ ক্ষমতা কার্বন-ডাই-অক্সাইডের থেকে প্রায় 21 গুণ বেশি।
৩। নাইট্রাস অক্সাইড (N_2O)	● মাটিতে বিভিন্ন ব্যাক্টেরিয়ার বিক্রিয়া ও গাছপালার জন্য নাইট্রোজেন ঘটিত সার সৃষ্টি হয়। ● কলকারখানা, মোটর গাড়ি প্রভৃতি থেকে দহনজনিত কারণেও এটি সৃষ্টি হয়।	● এটি বছরে 0.25% হারে বাড়ছে। ● এটির তাপধারণ ক্ষমতা কার্বন-ডাই-অক্সাইডের থেকে 270 গুণ বেশি।
৪। ক্লোরফ্লুরোকার্বন (CFC) [এটির মধ্যে উল্লেখযোগ্য CFC_{11} এবং CFC_{12}]	● ক্লোরিন ও ফ্লুরিনের সংমিশ্রণে একটি বিশেষ ধরণের গ্যাস হল CFC। বিভিন্ন শিল্পে, যেমন রেফ্রিজারেটার ও শীততাপ নিয়ন্ত্রক যন্ত্র তৈরির জন্য, এরোসল, স্প্রেফ্যান, প্লাস্টিক, প্রভৃতিতে ইহা ব্যবহৃত হয়। ● কলকারখানা, মোটর গাড়ি প্রভৃতি থেকে দহনজনিত কারণেও এটি সৃষ্টি হয়।	● বায়ুস্তরের 10-50 কিলোমিটার ওপরে স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে অনেকদিন থাকে। ● তাপ ধারণের ক্ষেত্রে এটি কার্বন-ডাই-অক্সাইডের থেকে 7000-14000 গুণ বেশি শক্তিশালী।
৫। নিম্নস্তরের ওজোন (O_3)		● এটির তাপধারণ ক্ষমতা কার্বন-ডাই-অক্সাইড-র থেকে 2000 গুণ বেশি।

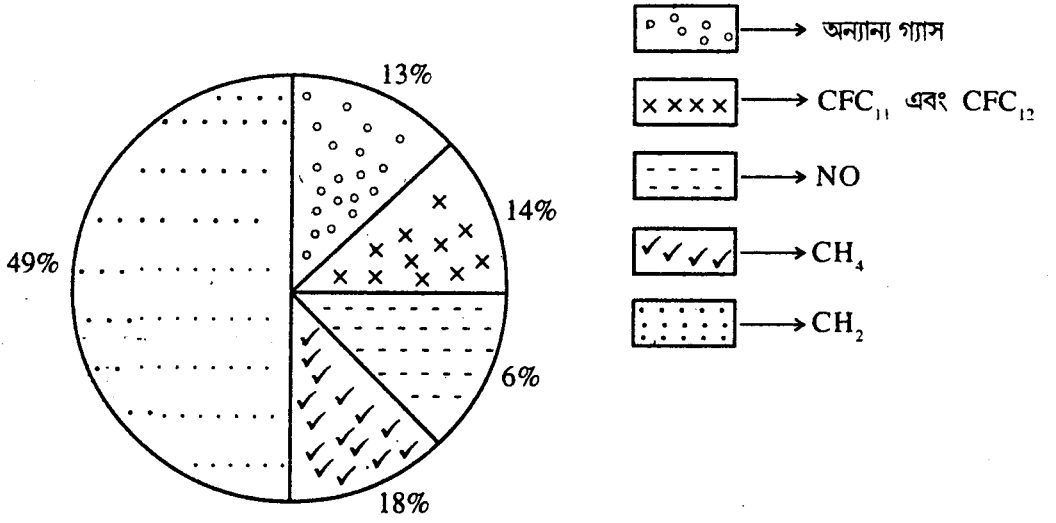

চিত্র : বায়ুমণ্ডলে গ্রীন হাউস গ্যাসগুলির শতকরা পরিমাণ পাই ডায়াগ্রামের সাহায্যে দেখানো হল।

9.3.6 ওজোন (O_3) আবরণে ক্ষয়, ওজোন গহ্বর ও বিপন্ন পরিবেশ

ওজোন স্তর সৃষ্টির পদ্ধতি ঃ

ভূপৃষ্ঠের ওপরে 10 কিলোমিটার থেকে 50 কিলোমিটার পর্যন্ত অঞ্চলটিকে স্ট্যাটোস্ফিয়ার বলে। এখানে ওজোন গ্যাসের আস্তরণ একটি গোলকের মতো পৃথিবীকে আবৃত করে রেখেছে। সৌরশক্তির অতিবেগুনী রশ্মি ওজোন স্তরে শোষিত হয়। অতিবেগুণী রশ্মির বিশেষ অংশ (242 ন্যানোমিটার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য) স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে অক্সিজেন অণুকে ভেঙে দুটি অক্সিজেন পরমাণু গঠন করে এবং এই অক্সিজেন অন্য অক্সিজেন অণুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে ওজোন গঠন করে। বায়ুমণ্ডলে ওজোন তৈরি নিম্ন দুটি ধাপে দেখানো হল ঃ

(ক) $O_2 \xrightarrow[242 \text{ ন্যানোমিটার}]{\text{সূর্যালোক}} 2O$ (দুটি অক্সিজেন পরমাণু)

(খ) $O + O_2 \underset{(230\text{-}290 \text{ ন্যানোমিটার})}{\overset{\text{সূর্যালোক}}{\rightleftharpoons}} O_3$

এইভাবে চক্রাকারে সবসময় স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে ওজোন অণু ভাঙাগড়া চলতে থাকে এবং একইভাবে অতিবেগুণী রশ্মি শোষিত হয়।

ওজোন স্তরের গহ্বর সৃষ্টি হওয়ার কারণ ও ফলাফল নিম্নের সারণীতে দেখানো হল—

ওজোন স্তরে গহ্বর সৃষ্টি হওয়ার কারণ	ফলাফল
(ক) নাইট্রোজেনের অক্সাইড সমূহ ওজোন স্তরের সংস্পর্শে আসে ও ওজোনকে অক্সিজেনে রূপান্তরিত করে।	● অতিবেগুনী রশ্মি থেকে ত্বকের ক্যানসার, চোখের ছানি, প্রভৃতি হয়। পশুপাখীদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও কমে যায়।
(খ) খুব দ্রুতগামী এরোসল যখন স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের মধ্যে দিয়ে যাতায়াত করে তখন প্রচুর পরিমাণে নাইট্রোজেনের অক্সাইড নির্গত হয়। এটি ওজোনকে ভেঙে দেয়।	● সবুজ শ্যাওলা, মাছ ও অন্যান্য পশুপাখি এই অতিবেগুনী রশ্মির জন্য প্রভূত ক্ষতির সম্মুখীন হয়।
(গ) ক্লোরফ্লুরোকার্বন (CFC_{11} এবং CFC_{12}) বিচ্ছুরক পদার্থ হিসাবে, খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণে, CFC_{11} দ্রাবক হিসাবে ইলেকট্রনিক ও কম্পিউটার শিল্পে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া ব্রোমো ট্রাই ফ্লুরো ইথেন অগ্নিনির্বাপণে ব্যবহৃত হয়। এটি ওজোনকে ভেঙে দেয়।	● এরা প্রাকৃতিক বস্তুর সঙ্গে সহজে বিক্রিয়া করে না। স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে পৌঁছে এরা অতিবেগুনী রশ্মির প্রভাবে ভেঙে যায়। এর অন্তস্থ ক্লোরিন (Cl) ও ব্রোমিন (Br) পরমানু মুক্ত হয়ে ওজোন স্তরের ওজোনকে ভেঙে দিয়ে অক্সিজেনে রূপান্তরিত করে।
(ঘ) কার্বন-টেট্রা-ক্লোরাইড (CCl_4) শুষ্ক ধোলাই ও পরিষ্কার করার তরল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এটিও ওজোন ধ্বংস করে।	● ওজোন স্তর বিনষ্ট করে।
(ঙ) ইথাইল ক্লোরফর্ম ($CHCl_4$), বিভিন্ন বস্তু পরিষ্কার করার তরল হিসাবে ব্যবহৃত হয়।	● ওজোন স্তর বিনষ্ট করে।

9.3.7 অম্লবৃষ্টি ঃ উৎস ও ক্ষতিকারক প্রভাব

অম্ল বৃষ্টির উৎস ও ক্ষতিকারক প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করা হল—

উৎস	ক্ষতিকারক প্রভাব
● বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন ও ভাসমান ধূলিকণাগুলি জলের সঙ্গে আলোক রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটিয়ে সালফার-ডাই-অক্সাইড (SO_2) এবং সালফিউরিক অ্যাসিড (H_2SO_4) তৈরি করে।	● জলধারাগুলির জল দূষিত হয় এবং উদ্ভিদ ও প্রাণীর প্রজাতি হ্রাস করে। ● ঘরবাড়ি, স্থাপত্যশিল্পে, মনুমেন্ট, স্মৃতিসৌধ ও অট্টালিকার ক্ষতি সাধিত হয়।

উৎস	ক্ষতিকারক প্রভাব
● কয়লা, খনিজতেল প্রভৃতির প্রচুর পরিমাণে দহনের ফলে বায়ুমণ্ডলে সালফার (S) ও কার্বন-মনো-অক্সাইড (CO) ও নাইট্রোজেনের পরিমাণ সঠিক পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই নাইট্রোজেন ও সালফার ঘটিত অক্সাইডগুলি আলোক রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে নাইট্রিক অ্যাসিড (HNO_3) ও সালফিউরিক অ্যাসিড (H_2SO_4) তৈরি করে। ● নাইট্রিক অ্যাসিড ও সালফিউরিক অ্যাসিড বায়ুমণ্ডলে মিশে থাকা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (HCl) এর সঙ্গে মিশে অম্লবৃষ্টি ঘটায়। অম্লবৃষ্টি তৈরির রাসায়নিক সমীকরণ হল— (ক) সালফার-ডাই-অক্সাইড (SO_2) + জলীয়বাষ্প (H_2O) = সালফিউরিক অ্যাসিড (H_2SO_4) (খ) নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড (NO_2) + জলীয়বাষ্প (H_2O) = নাইট্রিক অ্যাসিড (HNO_3) ও নাইট্রাস অ্যাসিড (HNO_2)	● জলধারাগুলি জলদূষিত হয় এবং উদ্ভিদ ও প্রাণীর প্রজাতি হ্রাস করে। ● ঘরবাড়ি, স্থাপত্যশিল্পে, মনুমেন্ট, স্মৃতিসৌধ ও অট্টালিকার ক্ষতি সাধিত হয়। ● অরণ্যের উদ্ভিদ ধ্বংস করে। ● মৃত্তিকার উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস করে। ● অম্লধর্মী মৃত্তিকার বিভিন্ন ধাতু (তামা, জিঙ্ক, অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতি) মাটির গভীরে ঢুকে জলকে দূষিত করে। ● উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। জমির উর্বরতা নষ্ট হয়। ● অম্লবৃষ্টিতে দুই রকমের অ্যাসিড তৈরি হয়। সালফিউরিক অ্যাসিড এবং নাইট্রিক অ্যাসিড। এই অ্যাসিডগুলি শ্বাসনালীতে ও ফুসফুসে নানা রোগ সৃষ্টি করে। এমনকি এর প্রভাবে ফুসফুসে নানা রোগ সৃষ্টি করে। এমনকি এর প্রভাবে ফুসফুসে ক্যানসার পর্য্যন্ত হতে পারে। এছাড়াও পরিপাকতন্ত্র ও নার্ভতন্ত্রেরও ক্ষতি সাধিত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মথুরার কাছে তৈলশোধনাগার থেকে সালফার-ডাই-অক্সাইড (SO_2) ও অন্যান্য গ্যাস নির্গত হয়ে চলেছে যা জলীয় বাষ্পের সাথে বিক্রিয়া করে অ্যাসিড তৈরি করে। ফলে তাজমহলের মার্বেল পাথরে নানারকম ক্ষয় দেখা যাচ্ছে।

9.3.8 আলোক রাসায়নিক ধোঁয়াশা বা ফোটো কেমিকাল স্মগ

আলোক রাসায়নিক ধোঁয়াশা তৈরির উৎস ও এতে উপস্থিত দূষক পদার্থ ও তার ক্ষতিকারক প্রভাব নীচের সারণীতে দেখা হল—

উৎস	উদাহরণ	ক্ষতিকারক প্রভাব
(ক) ওজোন ও হাইড্রোকার্বন সূর্যালোকের উপস্থিতিতে ফোটোকেমিক্যাল জারকের সৃষ্টি করে। পরিবহন, দহন, গ্যাসোলিন, ডিজেল প্রভৃতির ব্যবহার জনিত কারণে আলোক রাসায়নিক বিক্রিয়া দেখা যায়।	এতে রয়েছে নানা দূষক পদার্থ যেমন, অ্যালডিহাইড (CHO) কিটোন (=CO=) পেরক্সি অ্যাসিটাইল নাইট্রেট (PAN)	● শ্বাসনালীতে জ্বালা, চোখ জ্বালা প্রভৃতি উপসর্গ দেখা যায়।

9.3.9 বায়ুদূষণ ও তার ফলাফল

বিভিন্ন প্রাণী ও উদ্ভিদকূলে বায়ুদূষণের ক্ষতিকারক প্রভাব নীচের সারণীতে দেখানো হল—

দূষক পদার্থ	দূষণের ক্ষতিকারক প্রভাব
১। কার্বন-মনো-অক্সাইড (CO)	**প্রাণীর ক্ষেত্রে** ● রক্তে কার্বোক্সিহিমোগ্লোবিন তৈরির মাধ্যমে অক্সিজেন বহনের ক্ষমতা হ্রাস করে। ● এটি কম পরিমাণে থাকলে মাথা ব্যাথা, শ্বাস প্রশ্বাসের অসুবিধা, ঘুমঘুমভাব ও বমির প্রবণতা দেখা দেয়। ● আবার যদি 1000 আয়তনের বাতাসে 1 আয়তন কার্বন-মনো-অক্সাইড (0.1%) থাকে এবং কোনো লোক যদি এই বাতাসে শ্বাস প্রশ্বাস নেয় তৎক্ষণাৎ লোকটির মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।
২। সালফার-ডাই-অক্সাইড (SO_2)	**প্রাণীর ক্ষেত্রে** ● চোখের পক্ষে ক্ষতিকর ● শ্বাসনালীতে জ্বালা, কানে, নাকে, গলায় ও পালমোনারী নানারকম রোগ সৃষ্টি করে। ● এটি অম্লবৃষ্টির জন্য দায়ী। **উদ্ভিদের ক্ষেত্রে** ● অম্লবৃষ্টি যা শস্যের ক্ষতি করে, গাছের সবুজ পাতার রস নষ্ট করে ফলে এতে সালোক সংশ্লেষের হার কমে যায়। ● নেক্রোসিস নামক রোগের দ্বারা উদ্ভিদের পাতার ও অন্য অঙ্গের কোষ নষ্ট হয়।
৩। নাইট্রোজেনের অক্সাইড সমূহ [নাইট্রোজেন-ডাই-অক্সাইড (NO_2), নাইট্রাস অক্সাইড (N_2O), নাইট্রিক অক্সাইড (NO) প্রভৃতি]	**প্রাণীর ক্ষেত্রে** ● ফুসফুসের গভীরে ঢুকে ক্ষতি করে এবং ব্রঙ্কাইটিস, নিউমোনিয়া ও পালমোনারীতে নানা রোগ দেখা যায়। ● এটি অম্লবৃষ্টির জন্য দায়ী। নাইট্রিক অ্যাসিড (HNO_3) ও নাইট্রাস অ্যাসিড (HNO_3) তৈরি করে যা নার্ভতন্ত্রে, পাচনতন্ত্রে ও শ্বাসতন্ত্রে নানা রোগ সৃষ্টি করে। ● রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়ার ফলে ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি রোগ হয়। **উদ্ভিদের ক্ষেত্রে** ● অম্লবৃষ্টির দ্বারা গাছের পাতার ক্ষতি সাধন করে ফলে সালোকসংশ্লেষের হার কমে যায়। ● উদ্ভিদের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।

দূষক পদার্থ	দূষণের ক্ষতিকারক প্রভাব
৪। অ্যামোনিয়া (NH_3)	**প্রাণীর ক্ষেত্রে** ● চোখের পক্ষে ক্ষতিকর। ● শ্বাসনালীতে অসুবিধা, শ্বাস প্রশ্বাসে প্রদাহের সৃষ্টি হয়। **উদ্ভিদের ক্ষেত্রে** ● ফল ও পাতা বিবর্ণ হয়। অনেক সময় পাতায় মরচে পড়ার মত দাগ দেখা যায়। মূল ও কান্ডের বৃদ্ধি স্বাভাবিক হয় না, বীজের অঙ্কুরোদগম হয় না।
৫। হাইড্রোজেন সালফাইড (H_2S)	**প্রাণীর ক্ষেত্রে** ● মাথাধরা, বমিভাব, চোখজ্বালা ও গলাজ্বালা ও ক্ষুধামন্দ প্রভৃতির সৃষ্টি হয়। ● বেশি ঘনত্বে এই গ্যাস সেবন করলে আন্ত্রিক, অ্যাজমা ও শ্বাসকষ্টের ফলে মৃত্যুও ঘটতে পারে। **উদ্ভিদের ক্ষেত্রে** ● উদ্ভিদ অঙ্গে বিষক্রিয়া ঘটায় ও বিভিন্ন উদ্ভিদ অঙ্গের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।
৬। হাইড্রোজেন সায়ানাইড (HCN)	**প্রাণীর ক্ষেত্রে** ● স্নায়ুকোষের কাজের বাধা সৃষ্টি করে। গলা শুকনো, মাথাধরা, অস্বচ্ছ দৃষ্টি প্রভৃতি নানা উপসর্গ দেখা দেয়। **উদ্ভিদের ক্ষেত্রে** ● উদ্ভিদের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।
৭। আরসাইন গ্যাস	**প্রাণীর ক্ষেত্রে** ● লোহিত রক্তকণিকা ভেঙে যায়। ● বৃক্কের ও যকৃতের ক্ষতি করে পান্ডুরোগ সৃষ্টি করে।
৮। ক্লোরিন গ্যাস (Cl_2)	**প্রাণীর ক্ষেত্রে** ● শ্বাসনালী আক্রান্ত হয়। ● চোখের ঝিল্লি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং কনজাংটিভাইটিস নামক চোখের রোগ হয়।
৯। ওজোন (O_3)	**প্রাণীর ক্ষেত্রে** ● মাথাধরা ও নানারকম চোখের রোগ হতে পারে। ● ব্রঙ্কাইটিস ও ফুসফুসে ক্যানসার পর্যন্ত হতে পারে। **উদ্ভিদের ক্ষেত্রে** ● শস্য উৎপাদন ব্যাহত হয়। ● সবুজ পাতা হলুদ হয়ে যায়। একে ক্লোরসিস বলে।

দূষক পদার্থ	দূষণের ক্ষতিকারক প্রভাব
১০। ফসজিন অথবা কার্বনিল ক্লোরাইড ($COCl_2$)	**প্রাণীর ক্ষেত্রে** ● শ্বাসনালীতে প্রদাহ, ফুসফুসে মারাত্মক ব্যাধি সৃষ্টি করে। এর প্রভাবে ফুসফুসে জল জমতে পারে।
১১। গ্যাসীয় হাইড্রোকার্বন	**প্রাণীর ক্ষেত্রে** ● বেশি ঘনত্বে থাকলে শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট ছাড়াও ফুসফুসের নানা ক্ষতি সাধন করে। ● বেঞ্জিন ও বেঞ্জোপাইরিন যা ক্যানসার তরান্বিত করে।
১২। অ্যালডিহাইড (CHO)	**প্রাণীর ক্ষেত্রে** ● নাসিকা ও শ্বাস প্রশ্বাসের পথে অস্বস্তি।
১৩। ক্লোরাইড কম্পাউন্ড	**উদ্ভিদের ক্ষেত্রে** ● পাতা ও কান্ডে রোগের সৃষ্টি হয় ও মুকুল নষ্ট হয়। উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষ ও শ্বসনে বাধার সৃষ্টি করে।
১৪। ইথিলিন	**উদ্ভিদের ক্ষেত্রে** ● উদ্ভিদের সবুজ রঙ ফ্যাকাশে হয়ে যায়। পাতায় কালো দাগ সৃষ্টি হয়। মূল ও কান্ডের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।
১৫। বায়ুতে ভাসমান পদার্থ (এস. পি. এম. ধোঁয়া, ধুলো, প্রভৃতি)	**প্রাণীর ক্ষেত্রে** ● ই.এন.টি (কর্ণ, নাসিকা, গলদেশ) সংক্রান্ত নানারোগ সৃষ্টি হয়। ● ফুসফুসের ক্ষতি সাধিত হয়।
১৬। সীসা (Pb)	**প্রাণীর ক্ষেত্রে** ● শিশুদের নার্ভতন্ত্রের ক্ষতি, মস্তিষ্কের ক্ষতি, মানসিক অবসাদ সৃষ্টি করে। ● লোহিত রক্তকণিকা সৃষ্টিতে বাধা দান করে। ● মূত্রাশয়ের গঠনে বাধা দান করে।
১৭। ক্যাডমিয়াম (Cd)	**প্রাণীর ক্ষেত্রে** ● হাড়ে ভঙ্গুরতা সৃষ্টি করে। ● ফুসফুস ও অগ্নাশয়ের ক্ষতিসাধন করে।
১৮। বেরিলিয়াম (Be)	**প্রাণীর ক্ষেত্রে** ● চোখ ও ফুসফুসের ক্ষতি করে।
১৯। কোবাল্ট (Co)	**প্রাণীর ক্ষেত্রে** ● পালমোনারীতে ও ফুসফুসে নানা রোগ সৃষ্টি করে।
২০। পারদ (Hg)	**প্রাণীর ক্ষেত্রে** ● নার্ভতন্ত্রের ক্ষতি সাধন করে। ● মুখে ও চামড়ায় ঘা তৈরি করে।

দূষক পদার্থ	দূষণের ক্ষতিকারক প্রভাব
২১। সিলিকা (Si)	**প্রাণীর ক্ষেত্রে** ● সিলিকসিন নামক রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়।
২২। অ্যাসবেস্টস	**প্রাণীর ক্ষেত্রে** ● ই.এন.টি (কর্ন, নাসিকা, গলদেশ) জনিত রোগ সৃষ্টি করে ফুসফুসের ক্ষতি সাধন করে। এমনকি ক্যান্সার পর্যন্ত হতে পারে। অ্যাসবেসটসিস্ এম্ফাইসেমিয়া প্রভৃতি রোগ ছাড়াও চোখ জ্বালা দেখা যায়।
২৩। নিকেল (Ni)	**প্রাণীর ক্ষেত্রে** ● নিঃশ্বাসে কষ্ট, ফুসফুসে ক্যানসার প্রভৃতি সৃষ্টি হয়। **উদ্ভিদের ক্ষেত্রে** বিভিন্ন ভাসমান কণিকা বৃষ্টির জলে ধুয়ে মাটিতে পড়ে, যার ফলে মাটির উর্বরতা শক্তি নষ্ট হয়। এই কণিকাগুলি পত্ররন্ধ্র বন্ধ করে দেয় যার ফলে বাষ্পমোচনের হার ও সালোক সংশ্লেষের হার কমে যায়। উদ্ভিদের বৃদ্ধির হার ব্যাহত হয় ও শস্যের ব্যাপক ক্ষতি হয়।
বিদেশী পেশাদারী কাজ ও তার ক্ষতি	
১। যে সমস্ত লোক কাপড় তৈরির কারখানায় কাজ করে	● কাপড়ের তন্তু থেকে পালমোনারীতে (ফুসফুস) নানা রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে।
২। যারা পেট্রল পাম্পে কাজ করে	● ক্ষুধামন্দ, মাথাধরা, শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট প্রভৃতি হয়। ● গাড়ি রঙ করার স্প্রে থেকে চোখের ক্ষতি করে। ● পেট্রলের সীসা থেকে নার্ভের নানা রোগ হয়। ● ই.এন.টি. তে নানা রোগের সৃষ্টি হয়।
৩। যারা কীটনাশক ওষুধের কারখানায় কাজ করে	● মাথাধরা, চোখের ক্ষতি, বমিভাব, পেটের যন্ত্রনা প্রভৃতি রোগ দেখা যায়।
৪। এক্স-রে মেশিনে যার কাজ করে।	● তেজস্ক্রিয় দূষণের শিকার হয়।

9.3.10 বায়ুদূষণ ও তার নিয়ন্ত্রণ

নিম্নলিখিত পদ্ধতি সমূহের সফল প্রয়োগের মাধ্যমে বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

১। প্রযুক্তিগত পদ্ধতি ঃ

ক) **ফিল্টার দ্বারা ঃ** পাওয়ার প্ল্যান্টের চিমনিতে ফিল্টার লাগিয়ে কণা জাতীয় বায়ুদূষক পদার্থের নিষ্ক্রমণ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

খ) **স্ক্রুবার দ্বারা ঃ** এই যন্ত্রে দূষিত ধোঁয়াকে জল ও কলিচুনের মধ্য দিয়ে পাঠানো হয়। ফলে কণাজাতীয় দূষক ও সালফার ডাই অক্সাইড এই মিশ্রণে শোষিত হয়।

গ) **ক্যাটালাইটিক কনর্ভাটার দ্বারা ঃ** যানবাহনের ইঞ্জিনের সঙ্গে একে যুক্ত করা হয়। নির্গত ধোঁয়া এর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হবার সময় ধোঁয়া মধ্যস্থ কার্বন-মনো-অক্সাইড ও হাইড্রোকার্বন যথাক্রমে জল ও কার্বন-ডাই-অক্সাইডে পরিণত হয়।

২। আইনসম্মত পদ্ধতি ঃ

ক) শিল্পায়নের সময় রাজ্য দূষণ পর্ষদের অনুমতি নেওয়া বাঞ্ছনীয়।

খ) যে সকল শিল্প বা যানবাহন দূষণ নিক্ষেপণের অনুমোদনযোগ্য সীমা অতিক্রম করবে তাদের শাস্তিদানের ব্যবস্থা করা উচিত।

গ) শিল্পক্ষেত্রে বা যানবাহনে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা উচিত।

ঘ) শিল্প ও নিয়ন্ত্রণ সংস্থা থেকে নির্গত বর্জ্য পদার্থগুলির যথাযথ প্রক্রিয়াকরণ হওয়া প্রয়োজন।

৩। ব্যক্তিগত পদ্ধতি ঃ

ক) পুনরাবর্তনের মাধ্যমে বর্জ্য পদার্থের ব্যবহার হওয়া উচিত।

খ) জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে চাহিদা হ্রাসের দ্বারা শক্তিসম্পদের ব্যবহার কমানো বাঞ্ছনীয়।

9.4 প্রস্তাবনা

9.4.1 জল ও তার উৎস

আমাদের পৃথিবীতে প্রায় 75 শতাংশই জলাভূমি। প্রকৃতিতে জল তিনটি রূপে থাকতে পারে, যেমন—জলীয়বাষ্প ও বৃষ্টি, মাটি এবং বরফের মধ্যে উপস্থিত জল। মাটির জলের উৎসই হল বৃষ্টিপাত। এছাড়াও জলের অন্যান্য উৎসগুলি হল ভূপৃষ্ঠস্থ জল, সমুদ্র, নদী, পুকুর, ডোবা, হ্রদ, সরোবর, ঝরণা প্রভৃতি। জলকে সার্বজনীন দ্রাবক হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। জল বিভিন্ন ধাতব ও গ্যাসীয় পদার্থ বহন করে।

উৎসের ওপর নির্ভর করে জল আবার দুভাগে বিভক্ত। লবণাক্ত ও স্বাদু জল বা মিষ্টি জল। এই স্বাদু জলই কৃষিকার্যে, শিল্প কারখানায় পানীয় জল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। জলকে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, যেমন—ভূপৃষ্ঠত্ব জল, হাইগ্রোস্কোপিক জল, কৌশিক জল, অভিকর্ষজ জল, যুগ্ম জল ও জলীয়বাষ্প। ভূগর্ভস্থ জলকে আবার কনেট জল (যা দীর্ঘদিন ধরে বায়ুমণ্ডলের সংস্পর্শে আসেনি), ম্যাগম্যাটিক জল (ম্যাগমা থেকে উৎপন্ন), মেটাফরসিক জল (যা রূপান্তরিত শিলার মধ্যে থাকে), মেটিওরিক (কিছু কাল আগে বায়ুমণ্ডল থেকে পাওয়া গেছে), জুভেনাইল জল (যে জল কখনও বায়ুমণ্ডলের অংশ ছিল না) এইরূপ কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়।

জলের প্রকৃতি অনুযায়ী আবার দুভাগে, যেমন—স্থিরজল বা লেন্টিক জল (যেমন—পুকুর, হ্রদ, সরোবর) ও প্রবাহমান জল বা লেটিক জলে (যেমন—নদনদী, ঝর্ণা প্রভৃতি) ভাগ করা হয়।

জলের বিভিন্ন উৎস ও তার বিস্তার সম্পর্কে নীচের সারণীতে লেখা হল—

সমুদ্রের লবণাক্ত জল	97 ভাগ
অন্তর্দেশীয় (Inland) স্বাদু জল	3 ভাগ

এই পরিমাণ স্বাদুজল আবার নিম্নলিখিত ভাবে বর্তমান থাকে।

বায়ুমণ্ডল	0.035 ভাগ
নদী	0.030 ভাগ
হ্রদ	0.300 ভাগ
মৃত্তিকাস্থিত জল	0.060 ভাগ
ভূগর্ভস্থ জল	11 ভাগ
(770 মিটার গভীরতার কম)	
ভূগর্ভস্থ জল	14 ভাগ
(770 থেকে 3850 মিটার গভীরে)	
হিমবাহ	75 ভাগ

9.4.2 জলদূষণের প্রকৃতি

ভূপৃষ্ঠ অনেক প্রকার জলের উৎস আছে, যেমন—নদ-নদী, খালবিল, পুকুর, হ্রদ ইত্যাদি। এছাড়াও আছে বিশাল বিস্তৃত সমুদ্র। কৃষি, শিল্প ও সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে জল দূষণের পরিমাণও বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে।

জলদূষণের নিমিত্ত বিভিন্ন জলদূষকগুলি জৈবিক প্রক্রিয়ায় ভেঙে যেতেও পারে আবার নাও পারে। জল দূষণের ফলাফল সুদূর প্রসারী। শিল্পজাত বিষাক্ত পদার্থ, কীটনাশক, ভারী ধাতু প্রভৃতি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জলের সঙ্গে মিশে পবিবেশের বিভিন্ন ক্ষতিসাধন করে। তৈল দূষণ সমুদ্রের জলে একটি ভয়াবহ সমস্যা। ভূগর্ভস্থ জলের আর্সেনিক দূষণ একটি বহু চর্চিত বিষয়। এসব কারণেই জলদূষণের প্রকৃতির ব্যাপ্তি বিশাল এবং এর আশু নিয়ন্ত্রণ না হলে সভ্যতার সংকট আরোও গভীর হবে।

জলদূষণের প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে দূষিত পদার্থকে তিনভাগে ভাগ করা যায়।

(১) **ভাসমান পদার্থ ঃ** বিভিন্ন তৈলাক্ত ও গ্যাসীয় পদার্থ-এর উদাহরণ।

(২) **জলে দ্রবণীয় বিভিন্ন বর্জ্য পদার্থ ঃ** জলে দ্রবণীয় পদার্থগুলি হল— (ক) অ্যাসিড, (খ) ক্ষার, (গ) ভারী ধাতব পদার্থ, (ঘ) কীটনাশক প্রভৃতি। যেমন—ফেনল, নাইট্রেট (NO_3), জৈব পদার্থ, সেলেনিয়াম, সোডিয়াম (Na) ও পটাশিয়াম (K) প্রভৃতি।

(৩) **বিভিন্ন প্রকারের সংক্রামক ঃ** ব্যাক্টেরিয়া, প্রোটোজোয়া, ভাইরাস এবং বিভিন্ন ধরনের পরজীবী ইত্যাদি।

9.4.3 মিষ্টি জলের দূষণ

মিষ্টি জলের বিভিন্ন দূষক পদার্থ ও তাদের বিভিন্ন উৎসগুলি নীচের সারণীতে লিপিবদ্ধ করা হল—

দূষক পদার্থ	উৎস
১। নোংরা জল ও গৃহস্থালীর বর্জ্য পদার্থ (প্রায় ৭৫ শতাংশ দূষণ এর থেকে তৈরি হয়)	● রান্নাঘরের আবর্জনা, শাকসব্জি, ফলমূল, মাছ মাসের উচ্ছিষ্ট প্রভৃতি বস্তুকে জঞ্জাল জাতীয় বর্জ্য পদার্থ বলে মনে করা হয়। ● বাড়ির আবর্জনামুক্ত জল বিভিন্ন নদনদী ও অন্যান্য জলাভূমিতে গিয়ে পড়ে এবং সেখান থেকে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে।
২। শিল্পজাত দ্রব্যের দ্বারা উৎপন্ন দূষক পদার্থ (পারদ, কপার, দস্তা)	● কলকারখানা থেকে বিভিন্নরকম অজৈব ও জৈব পদার্থ নির্গত হয়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কাগজ, বোনাকাপড়, চিনি, রঙ, সার, লৌহ ও নানা লৌহযুক্ত ধাতু, রবার, তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে উৎপন্ন ফ্লাই অ্যাশ, আকরিক নিষ্কাশন প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন বিভিন্ন ধাতু, ইস্পাত কারখানার স্লাজ ইত্যাদি। ● ক্লোরিন ও কস্টিক সোডা তৈরি কারখানার বর্জ্যও দূষণের অন্যতম উৎস।
৩। তাপ দ্বারা উৎপন্ন দূষক পদার্থ	● বেশির ভাগ কলকারখানার মেশিন ঠান্ডা করতে জলের ব্যবহার করা হয়। এইসব উষ্ণ জল পুকুর ও নদীতে গিয়ে পড়ে এবং দূষণ ঘটায়।
৪। পলির দ্বারা উৎপন্ন দূষক পদার্থ	● কৃষিকার্য, বাড়ি, রাস্তাঘাট নির্মাণের সময় পলি সঞ্চিত হয়। পলির মধ্যে বিভিন্ন রকম দূষক পদার্থ যেমন— সিলিকেট, কার্বনেট, ফসফেট ও বিভিন্ন ভারীধাতু থাকতে পারে, যা দূষণের অন্যতম কারণ।
৫। তেজস্ক্রিয় বর্জ্য পদার্থ	● পারমানবিক জ্বালানী চক্রের বিভিন্ন ধাপে তরল, বায়বীয় বা গ্যাসীয় তেজস্ক্রিয় বর্জ্য পদার্থ সৃষ্টি হয়। তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ তৈরিতে, খাদ্য সংরক্ষণ কার্যে, পারমানবিক বোমা ও অস্ত্র তৈরির কারখানায় দুর্ঘটনা ঘটলে এবং গবেষণা ও চিকিৎসা কেন্দ্রেও এই সকল বর্জ্য পদার্থের সৃষ্টি হয়। তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ক্রিপ্টন-85, স্ট্রনশিয়াম-90, সিজিয়াম-137, প্রটোনিয়াম-239 প্রভৃতি।
৬। কৃষিকার্যজাত বর্জ্য পদার্থ	● ধানের খোসা, ধানের তুষ, আখের ছিবড়ে, খড়, কাঠের গুঁড়ো, সার, গোবর, বিভিন্ন কীটনাশক ওষুধ ও আগাছানাশক ওষুধ প্রভৃতি। কৃষিজাত বর্জ্য পদার্থে হিউমাস, নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশ ও ট্রেস মৌল থাকে। কীটনাশক ওষুধের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—DDT, BHC, ম্যালথিয়ন, প্যারাথিয়ন প্রভৃতি। আগাছা নাশক পদার্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল আর্সেনিকাল কার্বোনেট প্রভৃতি।

দূষক পদার্থ	উৎস
৭। প্রাণীজ বর্জ্য	● প্রাণীর মলমূত্র, গোবর, প্রাণীর হাড়, বিভিন্ন কসাইখানা থেকে ফেলে দেওয়া প্রাণীর দেহাবশেষ ইত্যাদি।
৮। কঠিন বর্জ্য পদার্থ (রাবিশ, দাহ্য রাবিশ, অদাহ্য রাবিশ)	● বিভিন্ন খাবারের পাত্র, বোতল, কাঁচ, প্লাষ্টিক, চিকিৎসাজনিত বর্জ্য, যেমন—হাসপাতাল বা নার্সিংহোম থেকে রোগীদের গজ, ব্যান্ডেজ, ব্যবহৃত ইনজেকসনের সিরিঞ্জ, অপারেশনের পর পরিত্যক্ত পদার্থ প্রভৃতি। ● সাধারণতঃ জীর্ণ অট্টালিকার চুন, সুরকি, ইট প্রভৃতিকে রাবিশ বলে। ● কাগজ, কাঠ, রাবার, চামড়া ইত্যাদি। ● ধাতু, কাঁচ, সিরামিক ইত্যাদি।
৯। খনন কাজের ফলে উৎপন্ন বর্জ্য	● কয়লাখনি থেকে কয়লা উত্তোলনের জন্য মাটি খুঁড়ে খনিতে নামার ব্যবস্থা করা হয় এবং মাটির উপরে ঐ আবর্জনা ও বর্জ্য স্তূপ করে রাখা হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বিভিন্ন ধরনের ধাতু, যেমন—সালফার ও পলি ক্লোরিনেটেড বাই ফিনাইল (PCB) , যা জলকে দূষিত করছে।
১০। মোড়ক জাতীয় বর্জ্য	● বিভিন্ন ধরনের পলিথিন, ব্যাগ, কাগজ, কার্ডবোর্ড, পাট ইত্যাদি।

9.4.4 সামুদ্রিক দূষণ ও তার উৎস

- নদীর দ্বারা বাহিত বর্জ্য পদার্থ সমূহ, যেমন—বাড়ির নোংরা বর্জ্য পদার্থজাত, শিল্পজাত, কৃষিজাত, ছত্রাকনাশক কীটনাশক ও আগাছানাশক প্রভৃতি এবং বিভিন্ন ভারী ধাতু সমুদ্রের মধ্যে গিয়ে পড়ে ও সমুদ্রের জলকে দূষিত করে।
- তৈল ও পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থবাহী জাহাজ সমুদ্রের ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় দুর্ঘটনা ঘটার ফলে যে তৈল নিষ্ক্রমণ হয় তার দ্বারাও সমুদ্রের জল দূষিত হয়।
- বিভিন্ন রকম সাবান ও ডিটারজেন্টের ব্যবহার সামুদ্রিক জল দূষণের অন্যতম কারণ।
- বিভিন্ন ধরনের তেজস্ক্রিয় বর্জ্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল স্ট্রনসিয়াম-99, সিজিয়াম-177 প্রভৃতি। এগুলির দ্বারাও সমুদ্রের জল দূষিত হয়।
- বিভিন্ন ধরনের প্লাস্টিক, পলিথিন, চামড়ার ব্যাগ প্রভৃতির দ্বারাও দূষণের সম্ভাবনা আছে।

9.4.5 ভূগর্ভস্থ জল দূষণ ও তার উৎস

- মাটির মধ্যেকার গর্ত ও খনির খাদ থেকে নানা বর্জ্য পদার্থ চোঁয়ানোর ফলে বা মল শোধনাশয় বাড়ির মধ্যেকার আবর্জনা, জমির সার ও নানারকম দুর্ঘটনা থেকে ভুগর্ভস্থ জল দূষিত হয়।
- বিভিন্ন প্রকার ধাতু উত্তোলনের সময় খনন কার্যের ফলে, ধাতু গলানো, ধাতু পরিশোধন, ধাতু ভস্মীভূত করা, সক্রিয় স্লাজপদ্ধতির দ্বারা, সীসাযুক্ত গ্যাসোলিনের অবশিষ্ট অংশের দ্বারা জল দূষিত হয়।
- বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের মোটামুটি নয়টি জেলার ভূগর্ভস্থ জলে আর্সেনিক দূষণ দেখা গেছে। এই অঞ্চলগুলিতে নলকূপের জলে আর্সেনেট অথবা আর্সেনাইট যৌগ মিশ্রিত অবস্থায় থাকে।

9.4.6 জল দূষক পদার্থগুলির নাম ও তার ক্ষতিকারক প্রভাব

বিভিন্ন জল দূষক পদার্থ সমূহের নাম ও তার ক্ষতিকারক প্রভাব সমূহ নিম্নে দেখানো হল—

দূষক পদার্থ	ক্ষতিকারক প্রভাব
১। তৈলাক্ত ও গ্যাসীয় পদার্থ	● সূর্যালোক জলের গভীরে না পৌঁছতে পারার জন্য জলজ উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। ● উপকূলবর্তী গাছপালা ধ্বংস হয়। ● জলে বসবাসকারী প্রাণী, যেমন—কিছু পাখীর প্রজাতি প্রভৃতি ধ্বংসের পথে চলে যাচ্ছে। ● জলে অগ্নিসংযোগের ফলে বহু প্রাণীর ক্ষতি হতে পারে।
২। ফেনল (C_2H_2OH)	● এটি কম ঘনত্বে থাকলেও (0001মিলিগ্রাম/লিটার) জলের স্বাদ ও গন্ধ বদলাতে সাহায্য করে। ● এদের প্রভাবে স্বাভাবিক খাদ্য শৃঙ্খল বিনষ্ট হয়।
৩। নাইট্রেট (NO_3)	● অন্ত্রে উপস্থিত ব্যাক্টেরিয়া নাইট্রেটকে বিষাক্ত নাইট্রাইটডে পরিণত করে, যা ফেরাস আয়নকে ফেরিক আয়নে পরিণত করে ফলে রক্তের অক্সিজেন বহন ক্ষমতা হ্রাস পায়। এর ফলে ছোট শিশুদের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। ● মেট-হিমোগ্লোবিনেমিয়া প্রভৃতি রোগ সৃষ্টি করে।
৪। জৈব পদার্থ	● ক্যানসার প্রভৃতি দূরারোগ্য ব্যাধির সৃষ্টি করে।
৫। সংক্রামক পদার্থ	● বিভিন্ন জলবাহিত রোগ যেমন, আন্ত্রিক, টাইফয়েড, আমাশয়, হেপাটাইটিস এ, জিয়া ভিয়াসিস প্রভৃতি রোগ সংক্রামিত হয়।
৬। পলি	● জলে আলোক প্রবেশ করতে পারে না ফলে প্রচুর জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীর (যেমন, স্যালমন প্রজাতির মাছ) ক্ষতি হয়।
৭। অম্লত্ব ও ক্ষারত্ব নির্দেশক পি. এইচ (pH)	● দূষণমুক্ত জলের পি.এইচ 4-9.5 এর মধ্যে হয়। ● বাস ও ট্রাউট প্রভৃতি প্রজাতির মাছগুলি ক্ষারযুক্ত জলে জন্মায় কারণ এতে খাদ্যের পরিমাণ বেশি থাকে। যদি জল কোনো কারণে অম্লধর্মী হয়ে পড়ে এইসব মাছের প্রজাতির বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।
৮। নর্দমার নোংরা জল ও গৃহস্থালির বর্জ্য	● পচা দুর্গন্ধময় জল বিভিন্ন প্রাণীর ক্ষেত্রে হানিকর। ● এর ফলে কলেরা, টাইফয়েড ও আরও অনেক সংক্রামক রোগ ছড়ায়। ● নানারকম অজৈব পদার্থ পচনের ফলে শৈবালের বৃদ্ধি খুব দ্রুত হতে থাকে। ফলে সবাত শ্বসনকারী প্রাণীদের মৃত্যু হয়।

দূষক পদার্থ	ক্ষতিকারক প্রভাব
৯। শিল্পজাত দ্রব্যের দ্বারা	● জলের নীচে বসবাসকারী জীবের ক্ষতি সাধন করে।
১০। পারদ (Hg)	● নার্ভতন্ত্রের ক্ষতি করে।
১১। কপার (Cu) ও জিঙ্ক (Zn)	● বিভিন্ন শম্বুক জাতীয় প্রাণী এই ধাতুগুলি গ্রহণের ফলে নানা ক্ষতির সম্মুখীন হয়।
১২। তাপীয় দূষণ	● বেশির ভাগ জলজ জীব যেমন, ট্রাউট নামক মাছের প্রজাতিগুলি তাপমাত্রার এই বৈষম্য সহ্য করতে পারে না। এটি মাছের বৃদ্ধির হার ও খাদ্য গ্রহণের হার স্বাভাবিকের থেকে অনেকাংশে কমিয়ে দেয়।
১৩। তেজস্ক্রিয় পদার্থ	● তেজস্ক্রিয় দূষণের ফলে ক্যানসার, বিকলাঙ্গতা, স্নায়ুদুর্বলতা, জেনেটিক মিউটেশন প্রভৃতি সমস্যা দেখা দেয়।
১৪। কয়লাখনির খননের ফলে	● এতে উৎপন্ন অ্যাসিড জলের ক্ষারত্ব কমিয়ে দেয় এবং প্রচুর জীব জন্তুর ক্ষতি হয়।
১৫। প্লাস্টিক	● সামুদ্রিক প্রাণীদের স্বাভাবিক জীবন ব্যাহত করে। এটি সমীক্ষায় দেখা গেছে প্রায় 280 টি প্রজাতির প্রায় 15 শতাংশ সামুদ্রিক পাখী এই প্লাস্টিক গ্রহণ করে। এতে পাকস্থলী ও অন্ত্রে নানারকম রোগের সৃষ্টি হয়।
১৬। পলিক্লোরিনেটেড বাই-ফিনাইল (PCB)	● এটি গ্রহণ করার ফলে বিভিন্ন প্রজাতির পাখীর ডিমের খোলক পাতলা হয়ে যায়, ফলে ডিমগুলি সহজে ভেঙে গিয়ে বহু প্রজাতির পাখীর জীবন ক্ষতিগ্রস্ত করে।
১৭। তৈল নিষ্ক্রমণ	● প্রতি বছর পৃথিবীতে বহু সামুদ্রিক মাছ, পাখী ও নানারকম অমেরুদন্ডী প্রাণী, শৈবাল মারা যায়। তৈল দূষণের ফলে উৎপন্ন হাইড্রোকার্বন ও বেঞ্জোপাইরিন নামক বিষাক্ত পদার্থের দ্বারা ক্যান্সার হতে পারে।
১৮। সার ও ডিটারজেন্ট	● শৈবালের বৃদ্ধি হওয়ার ফলে জলে অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যায় ও বহু প্রাণী এর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
১৯। কৃষিজাত বর্জ্য পদার্থ	● পানীয় জল দূষিত করে।
২০। আগাছানাশক রাসায়নিক পদার্থ	● মাটির মধ্যেকার বিভিন্ন উপকারী নাইট্রোজেন স্থিতিকরণ জীবাণু, নীলাভ সবুজ শৈবালের ক্ষতিসাধন করে ফলে উচ্চ শ্রেণীর গাছগুলির স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত হয়।

দূষক পদার্থ	ক্ষতিকারক প্রভাব
২১। বিভিন্ন কীটনাশক রাসায়নিক পদার্থ	● কৃষি জমিতে D.D.T ও অন্যান্য কীটনাশক প্রয়োগ করার ফলে এরা বৃষ্টির জলের সঙ্গে ধুয়ে নদনদী, হ্রদ ও সাগরের সঙ্গে মেশে ফলে জলজ মাছ, চিংড়ি ও বিভিন্ন জলজ প্রাণীর প্রাণহানী ঘটে। ● জলজ উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত হয়। ● জীববিবর্ধক প্রক্রিয়ায় (Biomagnification) কীটনাশক পদার্থগুলি খাদ্য শৃঙ্খলের মাধ্যমে জীবদেহে প্রবেশ করে এবং ফ্যাটজাতীয় কলা ও বিভিন্ন অঙ্গে সঞ্চিত হয়। সঞ্চয়ের পরিমাণ ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। এর ফলে জীবদেহের রক্ত সংবহনের মাধ্যমে দেহের নানা জায়গায় পৌঁছায় ও পরবর্তী পর্যায়ে জীবের মৃত্যু ঘটে। ● এগুলি খাদ্য শৃঙ্খলের মাধ্যমে মানুষের শরীরে গিয়ে টিউমার, ক্যানসার প্রভৃতি রোগ সৃষ্টি করে।
২২। অ্যাসবেসটস	● ফুসফুস, পাকস্থলী ও অন্ত্রে ক্যানসারের সৃষ্টি হয়।
২৩। আর্সেনিক	● মানুষের চামড়ায়, নখে, চুলে, জমা হয়ে হাতে পায়ে কালোদাগ হয়, চুলকানি হয় এবং কখনো কখনো ক্যানসার হতে পারে। ব্লাক ফুট ডিজিজ (Black foot disease) প্রভৃতি ভয়ানক রোগ সৃষ্টি করে।
২৪। ভূগর্ভস্থ জলের দূষণ	● বিভিন্ন জলবাহিত রোগ জীবাণু, যেমন—বিভিন্ন এন্টেরোভাইরাস, স্ট্যাফাইলোকক্কাস, ফ্লেবসিয়েমা, ই. কোলাই প্রভৃতি ব্যাক্টেরিয়া, জিয়ারডিয়া দ্বারা নানা রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে।

9.4.7 জলদূষণ নিয়ন্ত্রণ

জলদূষণের নিয়ন্ত্রণের উপায়গুলি নির্ভর করে ব্যাক্তি, সমাজ, প্রযুক্তির প্রয়োগ ও আইনের সঠিক প্রয়োগের ওপরে। এছাড়াও জলদূষণ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি খুবই জরুরি।

সার্বিকভাবে নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বন করে জলদূষণ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

ক) নর্দমার নিষ্কাশিত জল নিয়ন্ত্রণ ঃ গৃহস্থালীর কাজে ব্যবহারের পর অপরিষ্কার জল নির্গমণের জন্য পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা উন্নতমানের হওয়া উচিত।

খ) কীটনাশক পদার্থ থেকে দূষণ প্রতিরোধ ঃ জমিতে কীটনাশকের পরিবর্তে ক্ষতিকারক পতঙ্গ সমূহের প্রাকৃতিক শত্রু বা শিকারী জীবদের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।

গ) জলের তাপদূষণ প্রতিরোধ ঃ শিল্প ও বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র সমূহে কুলিং টাওয়ার লাগিয়ে জল ঠান্ডা করা প্রয়োজন।

ঘ) জল থেকে দূষক পদার্থের নিষ্কাশন ঃ বিভিন্ন প্রকার তেজস্ক্রিয়, রাসায়নিক, জৈব বা কণাজাতীয় ভাসমান পদার্থ সমূহকে যান্ত্রিক বা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নিষ্কাশন করা উচিত।

ঙ) **আইন প্রণয়নের মাধ্যমে ঃ** জলসংক্রান্ত আইন (দূষণ নিবারক ও নিয়ন্ত্রণ আইন), 1974 ও 1975 সালে সংশোধিত হয়েছে। এই আইনের সঠিক প্রয়োগ বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়।

9.5 শব্দ দূষণ

9.5.1 শব্দ সৃষ্টির পদ্ধতি ঃ শব্দদূষণ

প্রাণী জগতের অনুভূতি আদান প্রদানের অন্যতম মাধ্যম হল শব্দ। শব্দের উৎস থেকে শব্দতরঙ্গ বহিঃকর্ণের পিনা বা কর্ণপত্রের ওপর আঘাত করে কর্নকুহরে ঢোকে। সেখান থেকে প্রবাহিত হয়ে কানের পাতলা পর্দার (কর্ণপটহ) উপর আঘাত করে, এতে কানের পর্দা কম্পিত হয় ও কম্পন সঞ্চারিত হয়ে মধ্য কর্ণের তিনটি হাড়ের (মেলিয়াস, ইনকাস, স্টেপিস) মাধ্যমে অন্তঃকর্ণের ওভালউইন্ডোর পর্দাকে আঘাত করে। পর্দাটির কম্পনের ফলে ককলিয়ার ভিতরে এন্ডোলিম্ফে ভ্রাম্যমাণ শব্দতরঙ্গ সৃষ্টি হয়। এই শব্দতরঙ্গ বেসিলার মেমব্রেনকে (পর্দা) আন্দোলিত করে, যা অর্গান অফ্ কর্টির অঙ্গগুলিকে উভয় পাশে দুলতে সাহায্য করে। ফলে এই অঙ্গেরই কোষের কেশ এবং টেকটোরিয়াল মেমব্রেনের মধ্যে ঘর্ষনজনিত প্রক্রিয়া ঘটে। ফলে কর্টির অঙ্গের মধ্যে স্নায়ু আবেগ উৎপন্ন হয় এবং এই আবেগ স্নায়ুর মাধ্যমে পরিবাহিত হয়ে মস্তিষ্কে যায়। গুরুমস্তিষ্কে স্নায়ু আবেগ পৌঁছলে জটিল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শব্দের অনুভূতি পাওয়া যায়।

আধুনিক যন্ত্রসভ্যতা শব্দের মাত্রা অনেকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। মাত্রাতিরিক্ত অনিয়ন্ত্রিত শব্দ যা মানুষের শারীরবৃত্তীয় কাজকর্মকে প্রভাবিত করে ও মানুষের স্নায়ুতন্ত্র, হৃদপিন্ড ও সংবেদন অঙ্গের ওপর প্রভাব বিস্তার করে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে তাকে শব্দদূষণ বলে।

বস্তুর অনিয়মিত কম্পনের ফলে সুরবর্জিত শব্দ তৈরি হয়। এই সুরবর্জিত শব্দের দ্বারাই শব্দদূষণ হয়।

9.5.2 শব্দ পরিমাপের পদ্ধতি

শব্দ দূষণের পরিমাপকে ডেসিবেল দ্বারা প্রকাশ করা হয়। শব্দের তীব্রতা (1) ও প্রমাণ লোপের তীক্ষ্ণতার (In) অনুপাতকে লগ (log) করলে যে মান পাওয়া যায় তাকে বেল (Bel) বলে। বেলকে এক ডেসিবেল দ্বারা প্রকাশ করা হয়। শব্দের তীব্রতা এবং প্রমাণ শব্দের তীব্রতার 10 লগকে (log10) এক ডেসিবেল বলে। নিম্নলিখিত সূত্রের সাহায্যে ডেসিবেলের মান নির্ণয় করা যায়।

ডেসিবেল (dB) = $10 \log_{10}$ =

শব্দের কম্পন মাপার এককে (Frequency) বলে এবং প্রতি সেকেন্ডে একটি কম্পনকে হার্জ বলে। মানুষ কান দিয়ে 20-20,000 হার্জ কম্পাঙ্কের শব্দ শুনতে পায়।

আই.এস.আই এর চার্ট অনুসারে বিভিন্ন উৎসগুলি থেকে আসা শব্দের মাত্রা হওয়া উচিত 20-60 ডেসিবেল। কেন্দ্রীয় দূষণ পর্ষদ শব্দের নিরীখে পারিপার্শ্বিক বায়ুর গুণাগুণ (Ambieut air quality) ঘোষণা করে পরিবেশ সুরক্ষা ব্যবস্থা করেছে। কেন্দ্রীয় দূষণ পর্ষদ (Central Pollution Control Board) শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে যে শব্দের মাত্রা নির্ধারণ করেছে তা নিচে উল্লেখ করা হল—

আঞ্চলিক সাংকেতিক চিহ্ন	অঞ্চলের বিবরণ	দিনের শব্দ সীমা (ডেসিবেল)	রাতের শব্দ সীমা (ডেসিবেল)
A	শিল্প	75	65
B	বাণিজ্য	65	55
C	বসতি	50	45
D	নীরব (হাসপাতাল, স্কুল, কলেজ)	50	40

9.5.3 শব্দ দূষণের প্রকৃতি

শব্দ তৈরি হয় কম্পনের দ্বারা। শব্দের ব্যবহার ও তার প্রয়োগ আমাদের প্রতিদিনের অভ্যাসের সঙ্গে যুক্ত। সুরবর্জিত বা শ্রুতিকটু শব্দ দ্বারাই শব্দ দূষণের সৃষ্টি হয়। যান চলাচল, উড়োজাহাজের শব্দ, মাইকের আওয়াজ, বাড়ির আওয়াজ প্রভৃতি শব্দ দূষণের কারণ।

শব্দ তরঙ্গের তীব্রতা, শ্রুতিসীমা বা সহন ক্ষমতা এবং তীক্ষ্ণতা অতিরিক্ত হলেই বায়ুমন্ডলে শব্দের যে মাত্রার আধিক্য ঘটে সেটাই প্রকৃতপক্ষে শব্দদূষণ। এটি মাত্রা, স্থান ও কালের ওপর নির্ভরশীল।

9.5.4 শব্দ দূষণের উৎস

প্রাকৃতিক ও মনুষ্য সৃষ্ট প্রাকৃতিক কারণে শব্দদূষণ হয় না। তবে বাজ পড়ার শব্দ ও মেঘের গর্জন প্রভৃতি সামান্য শব্দদূষণ ঘটায়। বেশির ভাগ শব্দদূষণই মনুষ্য সৃষ্ট। নিম্নে শব্দদূষণ ও তার উৎসসমূহ সারণীর দ্বারা দেখানো হল।

দূষণ	উৎস
১। পরিবহন	● যানবাহন চলাচলের শব্দ, বৈদ্যুতিক হর্ন।
(ক) স্টেশন ও রেল পরিবহনের দূষণ	● বাষ্প চালিত ইঞ্জিন ও বড় বড় স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে ট্রেন চলাচলের শব্দ ও ট্রেনের হুইসিল।
(খ) বিমান পরিবহনের দূষণ	● বিমান চালু করার সময় এবং আকাশ পথে উড়বার সময় জেট ও সুপারসনিক গতিসম্পন্ন বিমানের শব্দ।
২। শিল্প কারখানায় উৎপন্ন	● কলকারখানার আওয়াজ, প্রেসের মেশিন, টেক্সটাইল, খবরের কাগজের প্রেস, চাবি পাঞ্চিং মেশিন, গাড়ির সাইরেন প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।
৩। যান্ত্রিক ক্রিয়ার দূষণ	● ডিজেল চালিত জেনারেটর, ওয়াশিং মেশিন, এয়ারকুলার, মিক্সি, ভ্যাকুম ক্লিনার প্রভৃতি।
৪। নতুন বাড়ি নির্মাণ	● নতুন বাড়ি ঘর তৈরি, পুরোনো বাড়ি ভাঙা, নানা রকম মেশিনের আওয়াজ শব্দ দূষণের অন্যতম কারণ।

দূষণ	উৎস
৫। মহাকাশে স্যাটেলাইট নিক্ষেপ করার সময়	● মহাকাশে স্যাটেলাইট ছাড়া হয় অতি-উচ্চমানের বিস্ফোরক রকেটের সাহায্যে। বিস্ফোরকগুলির মধ্যে ট্রাই-নাইট্রো-টলুইন (TNT) অন্যতম।
৬। নিকটবর্তী প্রতিবেশী ও দোকানপাট থেকে দূষণ	● প্রতিবেশীর বাড়ি ও আশেপাশের দোকান থেকে জোরে চালানো T.V., টেপরেকর্ডার, লাউডস্পিকার শব্দদূষণ ঘটায়।
৭। কথোপকথন থেকে দূষণ	● শেয়ারবাজারে, অফিসে বা কোনো জমায়েতে, রেস্টুরেন্টে ও শিক্ষায়তনে উচ্চস্বরের কথাবার্তাও শব্দদূষণের মধ্যে পড়ে।
৮। সামাজিক কারণে	● পুজো-পার্বন, বিবাহ প্রভৃতি সামাজিক অনুষ্ঠানের বাজি, মাইকের আওয়াজ, মিটিং ও মিছিলে মাইকের ব্যবহার অনেক সময় দূষণের কারণ হয়ে দাড়ায়।

নিম্নে বিভিন্ন শব্দের উৎসের নাম ও সেখান থেকে উৎপন্ন বিভিন্ন শব্দানুভূতির মাত্রা ডেসিবেলে (dB) প্রকাশ করা হল ঃ

শব্দের উৎস	ডেসিবেল (dB)	শব্দানুভূতি
১। ক্ষীণতম শব্দ	0	ন্যুনতম শ্রবণানুভূতির মাত্রা
২। স্টুডিওর তীব্রতা	10	শ্রবণযোগ্য
৩। ফিসফিস শব্দ	20	মৃদুশব্দ
৪। স্বাভাবিক কথাবার্তা	30	সহ্যশীল
৫। জোরে রেডিওর আওয়াজ	70	বিরক্তিকর
৬। কর্মব্যস্ত শহরের ট্র্যাফিক ও ট্রেনের হুইসিল	100	পীড়াদায়ক
৭। লাউড স্পিকার	110	ক্ষতিকারক
৮। সাইরেন	130	যন্ত্রণাদায়ক ও স্থায়ি ক্ষতির সম্ভাবনা
৯। ইলেকট্রিক হর্ন	140	অধিক ক্ষতির সম্ভাবনা

9.5.5 মানুষের স্বাস্থ্যের ওপর শব্দদূষণের প্রভাব

১। শব্দদূষণের অস্থায়ী প্রভাব

(ক) হঠাৎ কোনো বিকট শব্দে মানুষের কানের পর্দার সাময়িক ক্ষতি হতে পারে। এর ফলে অস্থায়ীভাবে শ্রবণ ক্ষমতা নষ্ট হয়। দীর্ঘ সময় ধরে 90 dB মাত্রার শব্দের মধ্যে থাকলে আংশিক বধিরতাও দেখা দিতে পারে।

(খ) অনেকক্ষণ 125dB মাত্রার শব্দের মধ্যে থাকলে কানের প্রচন্ড কষ্টদায়ক যন্ত্রণা হতে থাকে।

(গ) জেট প্লেনের ও মাইকের আওয়াজ অনেক সময় প্রয়োজনীয় শব্দগ্রহণে বাধা দেয়, এই ঘটনাকে মাস্কিং বলে।

(২) **শব্দ দূষণের দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব**

(ক) শ্রবনেন্দ্রিয়র ওপর প্রভাব	● অনেকদিন 100 dB মাত্রার শব্দের মধ্যে কাটালে বধিরতা দেখা দেয়। কারণ অর্গান অফ কর্টির কোষগুলি সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ● 160 dB মাত্রার বিকট শব্দে কানের পর্দা ছিড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। স্থায়ীভাবে শ্রবণ ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়।
(খ) হৃদ্ সংবহনতন্ত্রের ওপর প্রভাব	● দীর্ঘস্থায়ী সুতীব্র আওয়াজ হৃদপিন্ডের ওপর প্রভাব ফেলে এতে হৃদস্পন্দনের হার সাধারণত অনেক বেড়ে যায় বা কমে যায়। ● হাইপোকেলিসিমিয়া (রক্তে ক্যালসিয়ামের মাত্রা হ্রাস), হাইপোগ্লাইসেমিয়া (রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা হ্রাস) ও ইউসিনোফিলিয়া (শ্বেতকণিকার সংখ্যা বৃদ্ধি) প্রভৃতি রোগ দেখা দেয়। ● শব্দদূষণে ধমনীর রক্তচাপ অনেক বেড়ে যায়।
(গ) শ্বসনের ওপর প্রভাব	● উঁচু তীব্র শব্দের প্রভাবে শ্বসনের গভীরতা বেড়ে যায় ও দ্রুত শ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ হয়।
(ঘ) মস্তিষ্কের ওপর প্রভাব	● শব্দদূষণের প্রভাবে অর্থাৎ শব্দ যদি 130 dB অতিক্রম করে তাহলে বমি বা ঝিমুনিভাব দেখা দেয়। ● অনিদ্রা দেখা দেয় এবং বিভিন্ন কাজের একাগ্রতা ও কর্মদক্ষতা নষ্ট হয়ে যায়। কারিগরী দক্ষতা ও উৎপাদিকা শক্তি উভয়ই কমে যায়। ● উত্তেজনা ও মাথাধরা প্রভৃতি মানসিক অবসাদ দেখা যায়। ● যন্ত্রণাদায়ক শব্দ স্নায়ুতন্ত্রকে প্রভাবিত করে এর ফলে স্মৃতিশক্তি হ্রাস পায়।
(ঙ) নার্ভতন্ত্রের বা স্নায়ুতন্ত্রের ওপর প্রভাব	● স্বয়ংক্রিয় নার্ভতন্ত্রে বৃদ্ধি ও চেষ্টীয় নার্ভের ক্রিয়া হ্রাস করে। ● অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সংহতি নষ্ট করে হাটতে ও চলতে অসুবিধা দেখা যায়।
(চ) চোখের ক্ষতি	● চোখের তারারন্ধ্রের প্রসারণ দৃষ্টিশক্তির ত্রুটি ও বিভিন্ন রঙের আলো চেনার ক্ষমতা হারায়। ● রাতকানা রোগ দেখতে পাওয়া যায়।
(ছ) বিভিন্ন রোগ	● বিভিন্ন স্থায়ী রোগের (যেমন—টিনিটিস্) সৃষ্টি হয়।
(জ) পরিবেশের ওপর প্রভাব	● মানুষের বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় তন্ত্রের ক্ষতি ছাড়াও পরিবেশে উপস্থিত বিভন্ন রকম প্রাণীর নানা ক্ষতি সাধন করে।

9.5.5 শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ

নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ করা যায়—

ক) **উৎস স্থলে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ ঃ** উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে যানবাহনের ইঞ্জিনের পরিবর্তন ঘটিয়ে, শব্দ শোষণ যন্ত্র ব্যবহার করে বা শব্দ দূষণকারী যন্ত্রকে শব্দ সুপরিবাহী বস্তু দ্বারা আচ্ছাদিত করে বা ইলেকট্রিক ও গ্রিয়ার হর্ণের ব্যবহার সীমিত করে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

খ) **শব্দ চলাচল নিয়ন্ত্রণ ঃ** উৎস থেকে নির্গত শব্দকে কোন শব্দ শোষক দ্বারা শোষিত করে বা শব্দ চলাচলের স্থানে বাধা দিয়ে শব্দদূষণ কমানো যায়।

গ) **শব্দদূষণ প্রভাবিত শক্তির শব্দ প্রতিরোধক ব্যবস্থা গ্রহণ ঃ** শব্দ প্রতিরোধক হিসাবে ইয়ার প্লাগ, ক্যানাল ক্যাপ ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে।

9.6 সারাংশ

দূষণ সম্পর্কে যে কোনো আলোচনার প্রাথমিক শর্ত হল পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের পরিমাণ ও গুণগত মান সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকা। আমরা এতক্ষণ এই আলোচনা থেকে বুঝতে পেরেছি দূষণের প্রকৃতিকে। দূষকের উৎস সমূহ এবং তার ধরণ সম্বন্ধে আমরা একটি যথাযথ ধারণা পাওয়ার চেষ্টা করেছি। দূষণের সর্বগ্রাসী ক্ষমতা আমরা দেখতে পাই পরিবেশ অবক্ষয়ের মাধ্যমে। শুধু তাই নয়, মানুষের স্বাস্থ্যের গুরুতর ক্ষতি করে দূষণ। শুধু দূষণের প্রকৃতি তার উৎস এবং ফলাফল জানলেই যেহেতু দূষণের সম্পূর্ণ ছবি পাওয়া যায় না— তাই আমরা দূষণ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সাম্প্রতিকতম কার্যক্রম ও সুপারিশগুলিকে জানার চেষ্টা করেছি।

9.7 প্রশ্নাবলী

1. **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন**
   (a) গ্রীন হাউস প্রভাবের জন্য দায়ী গ্যাসগুলির নাম করুন।
   (b) ওজোন গহ্বর কি?
   (c) CFC কি? এর দ্বারা কি ক্ষতি সাধিত হয়।
   (d) নিম্নলিখিত দূষকগুলির উৎস ও এদের দ্বারা মানুষের ক্ষতির রূপটি লিখুন।
   নিকেল (Ni), সীসা (Pb), ও ক্যাডমিয়াম (Cd)
   (e) শব্দ দূষণের পরিমাপ আমরা কিভাবে করি?
   (f) PAN শব্দটির পুরো নামটি কি?
   (g) এরোসেলের উদাহরণ দিন।
   (h) সালফার-ডাই-অক্সাইড (SO_2) এবং কার্বন-মনো-অক্সাইড (CO) এর প্রভাবে উদ্ভিদ ও প্রাণীকুলের কি কি ক্ষতি সাধিত হয়?
   (i) ভূগর্ভস্থ জলের দূষণের একটি কারণ লিখুন।
   (j) অম্লবৃষ্টির দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনার একটি উদাহরণ দিন।

2. **শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ**

(a) _____ অতিবেগুনী রশ্মি শোষণ করে।

(b) আণবিক জ্বালানীর প্লান্ট ভর্ত্তির সময় _____ উৎপন্ন হয়।

(c) _____ একটি কীটনাশক ওষুধের নাম।

(d) অনেকদিন _____ dB শব্দের মধ্যে কাটালে বধিরতা দেখা দেয়।

(e) শ্বাসনালীতে প্রদাহ ও ফুসফুসে মারাত্মক ব্যাধি তৈরি করতে পারে _____ বায়ু দূষকটি।

(f) ইথাইল ক্লোরফর্ম একটি _____ যা _____ সৃষ্টি করে।

(g) দাহ্য রাবিশের মধ্যে _____ উল্লেখযোগ্য।

(h) আর্সেনিক _____ রোগের সৃষ্টি করে।

(i) শব্দ দূষণের ফলে _____ রোগের সৃষ্টি হয়।

(j) একটি জলে দ্রবণীয় বর্জ্য পদার্থের নাম _____।

3. **প্রথম স্তম্ভের সঙ্গে দ্বিতীয় স্তম্ভের মিল খুঁজে বার করুন।**

১। বায়ুমণ্ডলে স্বাভাবিক গ্যাস গুলি হল	A. বিভিন্ন ধাতু, আর্সেনিক প্রভৃতি।
২। প্রাথমিক দূষকগুলি হল	B. কার্বন-ডাই-অক্সাইড, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড, ক্লোর-ফ্লুরো-কার্বন, ওজোন।
৩। গ্রীন হাউস গ্যাস গুলি হল	C. ধুলোকণা, ছাই, কার্বন-মনো-অক্সাইড, নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড ইত্যাদি।
৪। ওজোন হোলের জন্য দায়ী গ্যাস গুলি	D. নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, কার্বন-ডাই-অক্সাইড, ওজোন প্রভৃতি।
৫। ভূগর্ভস্থ জলের দূষক পদার্থগুলি হল	E. নাইট্রোজেনের অক্সাইড সমূহ, কার্বন-টেট্রাক্লোরাইড, ক্লোরফ্লুরোকার্বন, ইথাইল ক্লোরফর্ম প্রভৃতি।

4. **দীর্ঘ উত্তর ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ**

(a) বিভিন্ন বায়ুদূষক পদার্থগুলির উৎস ও তাদের ক্ষতিকারক প্রভাবগুলি লিখুন।

(b) শব্দদূষণ কি? ইহা কিভাবে সৃষ্টি হয়?

(c) গ্রীনহাউস এফেক্ট, ওজোন হোল ও অম্লবৃষ্টি সম্বন্ধে আলোচনা করুন।

(d) বায়ুদূষণ ও জলদূষণ নিয়ন্ত্রণ কিভাবে করা যাবে?

(e) বায়ুদূষক পদার্থের শ্রেণীবিভাগগুলি কি কি? আলোচনা করুন।

9.8 উত্তরমালা

অনুশীলনী 1

(a) — 9.3.5

(b) — 9.3.6

(c) — 9.3.5

(d) — 9.3.4 or 9.3.9

(e) — 9.5.2
(f) — 9.3.2
(g) — 9.3.2
(h) — 9.3.9
(i) — 9.4.5
(j) — 9.3.7

অনুশীলনী 2

(a) — ওজোন (O_3)
(b) — তেজস্ক্রিয় বর্জ্য পদার্থ
(c) — ডি.ডি.টি (DDT)
(d) — 100 ডেসিবেল (dB)
(e) — ফসজিন বা কার্বনিলক্লোরাইড ($COCl_2$)
(f) — বায়ুদূষক, ওজোন স্তরের গহ্বর
(g) — কাঠ
(h) — ব্লাক ফুট ডিজিজ্
(i) — ফেনল (C_6H_5OH)

অনুশীলনী 3

(1) — D
(2) — C
(3) — B
(4) — E
(5) — A

অনুশীলনী 4

(a) — 9.3.3 এবং 9.3.9
(b) — 9.5.1 এবং 9.5.4
(c) — 9.3.5, 9.3.6 এবং 9.3.7
(d) — 9.3.10 এবং 9.4.7
(e) — 9.3.2 এবং 9.3.3

একক 10 ❑ গ্লোবাল ওয়ার্মিং

গঠন

10.1 প্রস্তাবনা

উদ্দেশ্য

10.2 পৃথিবীর উত্তাপ বৃদ্ধি বা গ্লোবাল ওয়ার্মিং

10.2.1 গ্রীন হাউস ক্রিয়া

10.2.2 গ্লোবাল ওয়ার্মিং

10.2.3 গ্রীন হাউস ক্রিয়া ও গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর সম্পর্ক

10.2.4 ওজোন স্তরের ছিদ্র

10.2.5 ওজোন গহ্বর সৃষ্টির কারণ

10.2.6 ওজোন স্তরের ক্ষয়ক্ষতিতে আমাদের ক্ষতি

10.2.7 প্রতিরোধের পদ্ধতি

10.2.8 ইউট্রোফিকেশন

10.2.8.1 পরিবর্তনের রূপরেখা

10.2.8.2 সংজ্ঞা

10.2.8.3 ইউট্রোফিকেশনের কুফল

10.2.8.4 প্রতিকারের উপায়

10.3 অনুশীলনী

10.4 উত্তরমালা

10.5 সারাংশ

10.6 সর্বশেষ প্রশ্নমালা

10.7 উত্তরমালা

10.1 প্রস্তাবনা ও উদ্দেশ্য

প্রস্তাবনা

সভ্যতার শুরু থেকেই মানুষ প্রকৃতি থেকে সব কিছু নিঃশেষ করে নিতেই শিখেছে শুধু, বিনিময়ে কিছু দিতে শেখেনি। ফলে আজ আধুনিক মানব সভ্যতা তার চূড়ান্ত উৎকর্ষের দিকে এগিয়ে চলা সত্বেও নিদারুণ কয়েকটি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে। ভবিষ্যতে মানুষ এভাবেই চলতে থাকলে আরও ভয়ংকর ও বিভীষিকাময় অবস্থার মুখোমুখি হবে এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। এই পরিস্থিতিতে একমাত্র আশার আলো এই যে মানুষ আজ যথেষ্ট পরিমাণে পরিবেশ সচেতন হতে চাইছে। বিশ্বের নানা প্রান্তের বিভিন্ন শাখার বৈজ্ঞানিকগণ আজ সেই ভবিষ্যতের ভয়াবহ পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য কঠোর সাধনায় রতী। তবুও আমাদের আশঙ্কা খানিকটা

থেকেই যায়, কেননা সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েই চলেছে পরিবেশ দূষণ। গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জনসংখ্যার দ্রুত লয়ে বৃদ্ধি। এসব ব্যাপারই মনুষ্য সৃষ্ট। তাই আমাদের বাঁচার জন্যই নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এসব মারাত্মক দূষণ। তার আগে জানতে হবে এসব পরিবেশ ধ্বংসকারী দূষণের কি কি রকমের ভয়ংকর প্রতিক্রিয়া হচ্ছে আমাদের চারপাশের পরিবেশে।

পরিবেশের বায়ুমণ্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ দিন দিন বেড়েই চলেছে। ফলে গ্রীণ হাউস ক্রিয়ায় পৃথিবীর তাপ বেড়েই চলেছে। শুরু হয়েছে গোটা পৃথিবীর উত্তপ্ত হয়ে ওঠা বা গ্লোবাল ওয়ার্মিং (Global warming)। কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে মানুষের যান্ত্রিক সভ্যতার উন্নতির অঙ্গ হিসেবে নাইট্রাস অক্সাইড, মিথেন, ক্লোরো ফ্লুরো কার্বন ইত্যাদির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে আবহমণ্ডলে। এরই ফলে মেরু অঞ্চলে আমাদের আবহমণ্ডলের সুরক্ষাদায়ী ওজোন স্তরে হয়েছে বিরাট এক গর্ত, যা আমাদের অনিবার্য বিপদের সংকেত দিচ্ছে। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বড় হ্রদ, নদী এবং সাগরের জলের দূষণ যার ফলে এসব জলাশয় মানুষের ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে উঠেছে।

উদ্দেশ্য

এই অংশটি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন—

- মনুষ্যসৃষ্ট ভয়ঙ্করতম দূষণগুলি কিরকম।
- এই দূষণগুলির প্রকৃতি কি?
- কিভাবে এগুলির মোকাবিলা করা সম্ভব।

10.2 পৃথিবীর উত্তাপ বৃদ্ধি বা গ্লোবাল ওয়ার্মিং (Global warming)

10.2.1 গ্রীন হাউস ক্রিয়া

আমাদের এই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রধান গ্যাসীয় উপাদানগুলি যথা—অক্সিজেন, কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও নাইট্রোজেন নির্দিষ্ট এক অনুপাতে সর্বদা থাকে বলেই সমস্ত জীবকুল শ্বসনকার্য্য চালাতে পারে বা বেঁচে থাকতে পারে। এই গ্যাসীয় উপাদানগুলির সাম্য বজায় থাকার ফলেই পৃথিবীতে গড়ে উঠেছে বিশাল এক জীববৈচিত্র্য। প্রাণদায়ী গ্যাসগুলির বিশেষ করে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের আরও একটি উপকারী ভূমিকা আছে। বায়ুমণ্ডলের এই বিভিন্ন গ্যাস সূর্যালোক দ্বারা উত্তপ্ত ভূপৃষ্ঠের বিকিরিত তাপ শোষণ করে। ফলে বিকরিত তাপ মহাশূন্যে ফিরে যেতে পারে না এবং এ জন্যই পৃথিবী পৃষ্ঠ ও বায়ুমণ্ডল উষ্ণ থাকে। এসব গ্যাসগুলিকে তাই গ্রীন হাউস গ্যাস বলে। কারণ এই গ্যাসে পৃথিবীর ওপর স্বচ্ছ এক কাঁচের আবরণীর মতো আবরণ তৈরি করে যা খুব ছোট তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সূর্যরশ্মিকে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ঢুকতে দেয় কিন্তু বড় তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বিকিরিত তাপ প্রবাহকে বেরোতে দেয়না, পৃথিবীতেই ফিরিয়ে দেয়। এই ধরনের ঘটনাকে গ্রীণ হাউস ক্রিয়া বা Green House effect বলা হয় (ছবি 10.2.1 দ্রষ্টব্য)। স্বাভাবিক ভাবে গ্রীন হাউস ক্রিয়া মানুষের প্রাণ ধারণের উপযোগী, কেননা এই গ্রীণ হাউস ক্রিয়ার ফলেই ভূপৃষ্ঠ এবং সংলগ্ন বায়ুমণ্ডল উত্তপ্ত থাকে। যদি এই গ্রীন হাউস গ্যাস প্রকৃতিতে না থাকতো তবে ভূপৃষ্ঠ ও বায়ুমণ্ডল এতো শীতল হয়ে পড়তো যে তা জীবকুলের বসবাসের অনুপযুক্ত হয়ে পড়তো। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, স্বাভাবিক গ্রীণ হাউস গ্যাসের উপস্থিতির জন্য পৃথিবীপৃষ্ঠের গড় উষ্ণতা 15° সেলসিয়াস। গ্রীন হাউস গ্যাসগুলির অনুপস্থিতে তা হয়ে দাঁড়াতো—18° সেলসিয়াস যা জীবের বাঁচার পক্ষে অতীব প্রতিকূল। প্রকৃতিতে স্বাভাবিক ভাবে প্রাপ্ত এই গ্রীন হাউস গ্যাসগুলি হলো কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও মিথেন। এছাড়াও মনুষ্যসৃষ্ট কিছু গ্রীণ হাউস গ্যাস হলো ক্লোরো-ফ্লুরো-কার্বন (CFC), নাইট্রোজেন-ডাই-অক্সাইড (NO_2), নাইট্রাস অক্সাইড (N_2O) প্রভৃতি।

10.2.2 গ্লোবাল ওয়ার্মিং

মানুষ তার শিল্প বাণিজ্য বাড়ানোর তাগিদে মারাত্মক কিছু গ্রীন হাউস গ্যাসের উৎপাদন বাড়িয়েই চলেছে। প্রাকৃতিক উৎসজাত গ্রীন হাউস গ্যাসগুলির (কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও মিথেন) সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যসৃষ্ট শিল্পজাত গ্রীন হাউস গ্যাসগুলির (ক্লোরো ফ্লুরোকার্বন, নাইট্রোজেন-ডাই-অক্সাইড, নাইট্রাস অক্সাইড ইত্যাদি) পরিমাণ যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়ায় সূর্যের বিকিরিত তাপশক্তি শোষণ করার পরিমাণও বৃদ্ধি পেয়েছে। তার উপর আবহমণ্ডলের সুরক্ষাদায়ী ওজোন (O_3) স্তরের ক্ষয় ঘটিয়ে সূর্যের সৌরশক্তি বেশি পরিমাণে পৃথিবীতে পৌঁছে দিচ্ছে। ফলে সামগ্রিক ভাবে ভূপৃষ্ঠের জড় উষ্ণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। একেই বলা হয় গ্লোবাল ওয়ার্মিং বা ভূপৃষ্ঠের উষ্ণতা বৃদ্ধি।

10.2.3 গ্রীন হাউস ক্রিয়া ও গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর সম্পর্ক

গ্রীন হাউস ক্রিয়া আর গ্লোবাল ওয়ার্মিং পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। গ্রীন হাউস গ্যাসগুলির বিকিরিত তাপ শোষণ ক্রিয়ার ফলেই ভূপৃষ্ঠে ও আবহমণ্ডল উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। শুরু হয়েছে গ্লোবাল ওয়ার্মিং। কিভাবে এই গ্রীন হাউস গ্যাসগুলি আমাদের পৃথিবীকে উত্তপ্ত করে তুলছে এবং এর ক্ষতিকারক প্রভাব কতটা তা নিম্নে আলোচনা করা হল।

কার্বন-ডাই-অক্সাইড (CO_2)

গ্রীন হাউস গ্যাসগুলির মধ্যে অন্যতম হল কার্বন-ডাই-অক্সাইড (CO_2)। এই গ্যাসের প্রধান উৎস হল জীবাশ্ম ঘটিত জ্বালানী যেমন, খনিজতেল বা পেট্রোলিয়াম, কয়লা এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের দহন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে আমাদের বায়ুমন্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের আয়নগত পরিমাণ ছিলো 280 পিপিএম; বিংশ শতাব্দীর শেষদিকে এই পরিমাণ বেড়ে গিয়ে হয়েছিল 315 পি.পি.এম এবং এই হারে বৃদ্ধি যদি চলতেই থাকে তবে হিসেব মতো 2050 সালে এই কার্বন-ডাই-অক্সাইডের বায়ুতে আয়তনগত পরিমাণ গিয়ে দাঁড়াবে 600 পি.পি.এম। কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাসকে গ্রীন হাউস গ্যাসের মধ্যে অন্যতম বলা হয় এই কারণে যে গ্রীন হাউস ক্রিয়ার শতকরা 61 ভাগই এই গ্যাসটির অবদান। পার্থিব উষ্ণতা বৃদ্ধি বা গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এ এই গ্যাসটির ভূমিকাও প্রায় 50 শতাংশ।

মিথেন (CH_4)

এটিও একটি প্রাকৃতিক উৎসজাত গ্রীন হাউস গ্যাস। প্রকৃতিতে মিথেন গ্যাসের পরিমাণ কার্বন-ডাই-অক্সাইডের তুলনায় খুবই কম হওয়া সত্ত্বেও এই গ্যাসের গ্রীন হাউস ক্রিয়ার তীব্রতা কার্বন-ডাই-অক্সাইডের চেয়ে প্রায় 25 গুণ বেশি। প্রতি বছর এই গ্যাসটিরও আয়তনগত পরিমাণ বেড়েই চলেছে। কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরই পার্থিব উষ্ণতা বৃদ্ধির ব্যাপারে এই গ্যাসিটির বিশাল ভূমিকা এবং তা প্রায় 18 শতাংশ (ছবি 10.2.2 দ্রষ্টব্য)। এই গ্যাসটির উৎসগুলি হল— গৃহপালিত পশুর অন্ত্রের কোহল সন্ধান প্রক্রিয়া, বায়োমাস দহন, কয়লাখনি ও প্রাকৃতিক গ্যাস এবং নালা, ডোবা, বিল, জলাশয় ইত্যাদি।

ক্লোরোফ্লুরো কার্বন (CFC)

এই গ্যাসটি প্রাকৃতিক উৎসজাত নয়। শিল্পজাত পদার্থ এর উৎস। এটি খুব মারাত্মক ক্ষতিকারক গ্রীন হাউস গ্যাস। ওজোন স্তরে গর্ত করতে এটিই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে। এই গ্যাসটির নানারকম রূপ দেখা যায় যেমন— CFC-11 ; CFC-12; CFC 113; CFC 114 ; CFC 115 ইত্যাদি। তাই এই ধরনের সব গ্যাসগুলিকে একত্রে CFC গোষ্ঠীভুক্ত গ্যাস বলা হয়। এই ধরনের গ্যাসের বিকিরিত সূর্য তাপ ধারণ বা শোষণ ক্ষমতা কার্ব-ডাই-অক্সাইডের থেকে দশ হাজার গুণ পর্য্যন্ত বেশি হয়। দেখা গেছে এক ধরনের ক্লোরো ফ্লুরো কার্বনের একটি মাত্র অণু 10,000 কার্বন-ডাই-অক্সাইড অণুর তাপধারণ ক্ষমতার সমান তাপ শোষণ করতে সক্ষম। আধুনিক মানুষের জীবন যাত্রার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথেই CFC-এর আয়তনগত পরিমাণ বায়ুমণ্ডলে বেড়েই চলেছে।

ছবি 10.2.1

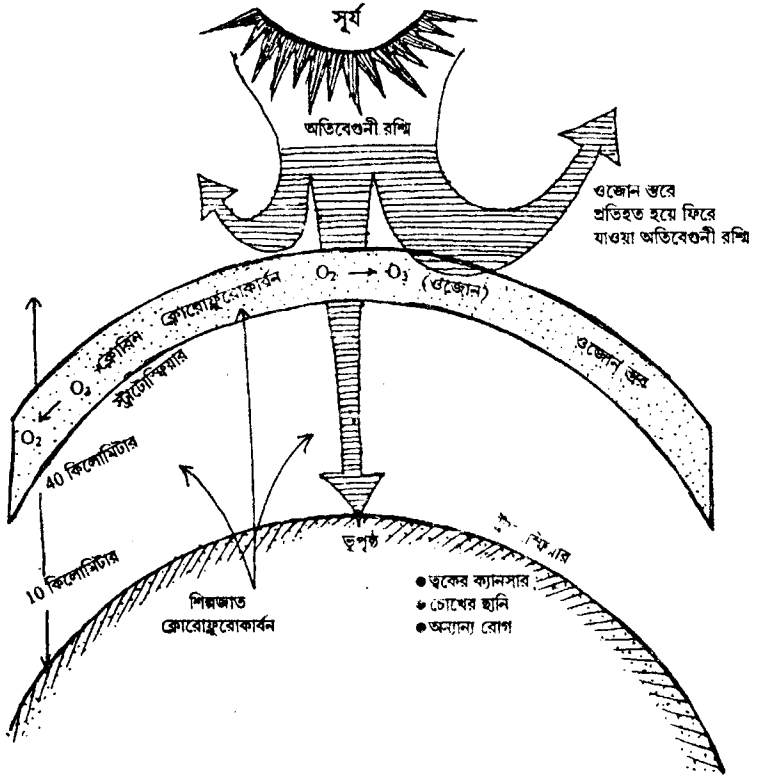

ছবি 10.2.2

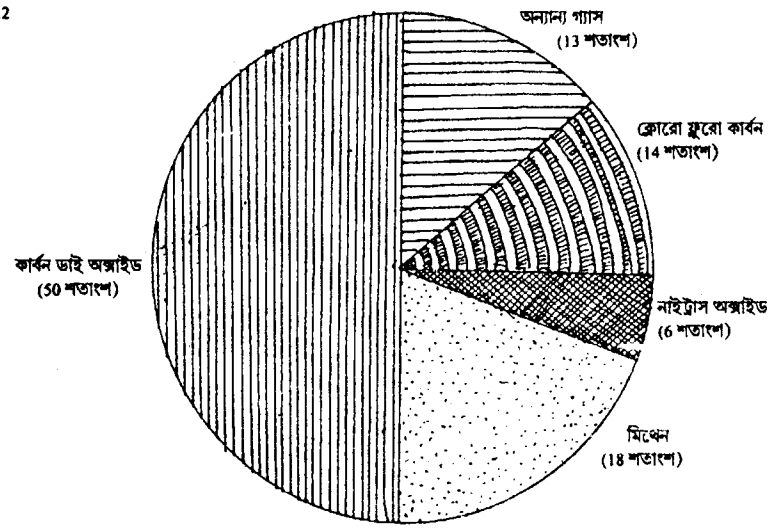

চিকিৎসায় ব্যবহৃত জীবানুনাশক, শিল্পে ব্যবহৃত দ্রাবক, আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় ব্যবহৃত সব রকমের স্প্রে (এরোসেল), রেফ্রিজারেটর, এয়ার কন্ডিশনিং ও প্লাস্টিক উৎপাদনের সময় CFC ব্যবহার বহুল প্রচলিত। পার্থিব উষ্ণতা বৃদ্ধির জন্য এই গোষ্ঠীর গ্রীন হাউস গ্যাসের ভূমিকা 14 শতাংশ।

নাইট্রোজেন-ডাই-অক্সাইড (NO_2) নাইট্রাস অক্সাইড (N_2O) ও নাইট্রিক অক্সাইড (NO)

বিভিন্ন গ্রীন হাউস গ্যাসের মধ্যে নাইট্রাস অক্সাইড (N_2O) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, কেননা পার্থিব উষ্ণতা বৃদ্ধির জন্য এই গ্যাসের অবদান প্রায় 0.6 শতাংশ। রাসায়নিক সার, জীবাশ্ম জ্বালানীর দহন, জৈব পদার্থের দহন ইত্যাদি কারণেই এই গ্যাসের সৃষ্টি হয়। এর পরিমাণও বায়ুমণ্ডলে বেড়েই চলেছে। একই কারণে আমাদের আবহমণ্ডলে অন্যান্য গ্রীনহাউস গ্যাস যেমন, নাইট্রোজেন-ডাই-অক্সাইড (NO_2); নাইট্রিক অক্সাইড (NO) ; কার্বন মনোক্সাইড (CO) ; সালফার ডাই অক্সাইড (SO_2) ইথেন (C_2H_4) ইত্যাদির পরিমাণও বেড়েই চলেছে। সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একজন আবহবিদের সমীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণ করে জানা গিয়েছে যে কার্বন-ডাই-অক্সাইড ছাড়া অন্যান্য প্রায় তিরিশটি স্বল্প মাত্রায় উপস্থিত গ্যাসের কারণে আগামী বছরগুলিতে পার্থিব উষ্ণতা বৃদ্ধি বা গ্লোবাল ওয়ার্মিং ব্যাপক আকার ধারণ করবে। এসব গ্যাস কার্বন-ডাই-অক্সাইডের থেকে দ্বিগুণ তীব্রতায় পার্থিব উষ্ণতা বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করবে।

10.2.4 ওজোন স্তরের ছিদ্র

উর্দ্ধ বায়ুমণ্ডলে স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার স্তরে রয়েছে ওজোন গ্যাসের (O_2) একটি আস্তরণ। আমাদের বায়ুমণ্ডলকে সাধারণত চারটি স্তরে ভাগ করা হয়। (ক) ট্রোপোস্ফিয়ার (Troposphere), (খ) স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার (Stratosphere) (গ) আয়নোস্ফিয়ার (Ionosphere) এবং (ঘ) এক্সোস্ফিয়ার (Exosphere)। এর মধ্যে দ্বিতীয় স্তরটি অর্থাৎ ট্রোফোস্ফিয়ারের পরের স্তরটি অর্থাৎ স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার সাধারণত ভূপৃষ্ঠ থেকে 15 কিলোমিটার উচ্চতা থেকে শুরু করে প্রায় 50 কি.মি. উচ্চতা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এর মধ্যে 20 কিলোমিটার থেকে শুরু করে 50 কিমি পর্য্যন্ত পুরু এক আবরণীর মতো বায়ুমন্ডলকে ঘিরে থাকে ওজোন গ্যাসের স্তর। ওজোন গ্যাসের ঘনত্ব এই বিশাল পুরু আবরণীটির সব জায়গায় সমান থাকে না। সমুদ্র পৃষ্ঠের কাছাকাছি ওজন গ্যাসের ঘনত্ব খুবই কম (প্রায় 1 পিপিএম)। উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে সাথে এর ঘনত্ব বৃদ্ধি পায়। দেখা গেছে ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় 25 কিমি উর্দ্ধ পর্যন্ত ওজোন গ্যাসের ঘনত্ব সবথেকে বেশি থাকে (প্রায় 10 মিলিগ্রাম/কিলোগ্রাম)। এই ওজোন স্তরের আচ্ছাদন পৃথিবীকে সুরক্ষা প্রদান করে। সূর্যের আলোয় থাকা ক্ষতিকর আল্টাভায়োলেট রশ্মি বা অতিবেগুনী রশ্মি এবং মহাজাগতিক অন্যান্য ক্ষতিকর রশ্মি বায়ুমণ্ডলের ওজোন স্তর ভেদ করে ঢুকতে পারে না (ছবি 3.2.3 দ্রষ্টব্য)।

স্বাভাবিকভাবে এই স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার স্তরে সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মি অক্সিজেন গ্যাসের সঙ্গে আরো একটি অক্সিজেন পরমাণু যুক্ত করে তাকে ওজোন গ্যাসে পরিণত করে। আবার বিপরীতমুখী বিক্রিয়ায় ওজোন গ্যাস বিয়োজিত হয়ে অক্সিজেন গ্যাসে পরিণত হয়। এভাবে গতিশীল উভমুখী বিক্রিয়ায় মোট ওজোন গ্যাসের পরিমাণ মোটামুটি একই থাকে এবং এই ওজোন স্তরটির গুরুত্ব একই থাকে।

$$O_2 \xrightarrow{\text{অতিবেগুনী রশ্মি}} 2O \text{ (আয়নিত অক্সিজেন পরমানু)}$$

$$O_2 + O \underset{\text{অতিবেগুনী রশ্মি}}{\rightleftharpoons} O_3 \text{ (ওজোন গ্যাস)}$$

স্বাভাবিকভাবে বায়ুতে থাকা নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড (NO_2) সালফার-ডাই-অক্সাইড (SO_2) ইত্যাদি গ্যাস সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মি শোষণ করে বিয়োজিত হয়ে অক্সিজেন আয়ন তৈরি করে এবং ওজোন গ্যাস তৈরিতে এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

অতিবেগুনী রশ্মি

$NO_2 \rightleftharpoons NO_4$ (উত্তেজিত) $\longrightarrow$ O (আয়নিত অক্সিজেন) + NO

অতিবেগুনী রশ্মি

$SO_2 \rightleftharpoons SO_2$ (উত্তেজিত) $\longrightarrow$ O (আয়নিত অক্সিজেন) + SO

অতিবেগুনী রশ্মি

O (আয়নিত অক্সিজেন) + O_2 (অক্সিজেন) $\longrightarrow$ O_3 (ওজোন গ্যাস)

সুতরাং, স্বাভাবিকভাবে ওজোন স্তরেব ওজোন গ্যাসের ঘনত্ব মোটামুটি ভাবে ঠিকই থাকে। এসব নানারকম উভমুখী বিক্রিয়া ওজোন সংশ্লেষে সাহায্য করে। দুর্ভাগ্যবশতঃ বেশ কয়েক বছর আগে থেকেই আমাদের এই সুরক্ষা চাদর বা ওজোন স্তরে ছিদ্র বা গহ্বর লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ওজোন স্তরে এই গহ্বরের সমস্যাটি 1985 সালে প্রথম বিজ্ঞানীদের দুঃশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আন্টার্টিকা অঞ্চলের ব্রিটিশ বিজ্ঞানী সমীক্ষক দল লক্ষ্য করেন যে ঐ অঞ্চলের Halley Bay-র ওপর থাকা ওজোন স্তর 1977 থেকে 1984 এর মধ্যে দারুন কমে গেছে। 40 শতাংশ ঘনত্ব হ্রাস পেয়েছে ওজোন স্তরের। পরে দূর নিয়ন্ত্রিত মার্কিন উপগ্রহের তোলা ছবি থেকে প্রমাণিত হয় যে ওজোন স্তরের এই গহ্বর বিশালাকার। এর ক্ষেত্রফল গোটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মোট ক্ষেত্রফলের সমান এবং এই গহ্বরের গভীরতা হিমালয়ের সর্বোচ্চ চূড়া মাউন্ট এভারেস্টের উচ্চতার সমান। প্রতি বছর শরৎকালে এই গহ্বরের আয়তন সর্বোচ্চ হয়। আন্টার্টিকা ছাড়াও উত্তর মেরু অঞ্চলে এবং উত্তর গোলার্ধের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ও কানাডার প্রায় অর্ধেক অংশ জুড়েও ওজোন গহ্বরের স্তর পাতলা হয়ে যাচ্ছে।

10.2.5 ওজোন গহ্বর সৃষ্টির কারণ

নানা রকমের ওজোন ধ্বংসকারী গ্যাসের বায়ুমণ্ডলে অত্যাধিক পরিমাণে উপস্থিতির কারণেই ওজোন গহ্বর তৈরি হয়। এই ওজোন ধ্বংসকারী গ্যাসগুলি হল N_2O (নাইট্রাস অক্সাইড); CFC (ক্লোরো ফ্লুরো কার্বন গোষ্ঠীভুক্ত গ্যাস) CCl_4 (কার্বন টেট্রাক্লোরাইড), $C_2H_3Cl_3$ (মিথাইল ক্লোরোফর্ম), CH_3Br (মিথাইল ব্রোমাইড), CH_3Cl (মিথাইল ক্লোরাইড), HO_2 (পারক্সি হাইড্রোক্সিল), OH (হাইড্রক্সিল আয়ন) ইত্যাদি।

এই সকল গ্যাসই ওজোন ধ্বংসকারী। তবে এবার শিরোমণি হিসেবে নাইট্রাস অক্সাইড (N_2O) এবং CFC বা ক্লোরো ফ্লুরো কার্বন গ্যাস সমুহের নাম আসবে সর্ব্বাগ্রে। নাইট্রাস অক্সাইড (N_2O) প্রকৃতিতে বিভিন্ন কলকারখানা, রাসায়নিক সার কারখানা, জীবাশ্ম জ্বালানীর দহন ও মাটিতে থাকা ব্যাকটেরিয়ার ক্রিয়ার উৎপন্ন হয়। এরপর এই গ্যাস উঁচুতে স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে পৌঁছায় এবং সূর্যের আলোর অতিবেগুনী রশ্মির সহায়তায় পর্যায়ক্রমে নাইট্রোজেন-ডাই-অক্সাইড (NO_2) এবং নাইট্রিক অক্সাইড (NO)-এ পরিণত হয়। এই গ্যাসগুলি অনুঘটকের মতো শৃঙ্খল বিক্রিয়ার মাধ্যমে প্রচুর পরিমাণে ওজোন গ্যাস ধ্বংস করতে থাকে। এছাড়াও সুপারসোনিক জেট বিমান ওড়ার সময় তা ওজোনস্তর ভেদ করে চলে এবং তখন বিমানের জ্বালানীর দহনে উৎপন্ন N_2O (নাইট্রাস অক্সাইড) ও OH (হাইড্রক্সিল আয়ন) ওজোন স্তরে যুক্ত হয়। এরাও দারুণভাবে ওজোন স্তরের ক্ষতি করে।

অতিবেগুনী রশ্মি

(i) N_2O (নাইট্রাস অক্সাইড) ⟶ NO_2 (নাইট্রোজেন-ডাই-অক্সাইড) + NO (নাইট্রাস অক্সাইড)

(ii) O_3 (ওজোন) + NO_2 (নাইট্রোজেন-ডাই-অক্সাইড) ⟶ NO + $2O_2$ (অক্সিজেন)

(iii) OH^- (হাইড্রক্সিল আয়ন) + O_3 (ওজোন) ⟶ HO_2 (পারক্সি হাইড্রক্সিল) + O_2 (অক্সিজেন)

(iv) HO_2 + O (আয়নিত অক্সিজেন) ⟶ OH (হাইড্রক্সিল আয়ন) + O_2 (অক্সিজেন)

এরপরই ওজোনস্তর ধ্বংসকারী মারাত্মক যৌগ CFC গোষ্ঠিভুক্ত গ্যাসসমূহ কিভাবে ওজোন স্তরের সর্বনাশ করে চলেছে তা দেখা যাক্। আমরা আগেই জেনেছি যে এরোসল স্প্রে, রেফ্রিজারেটর, এয়ার কন্ডিশনার, জৈব দ্রাবক, প্লাষ্টিক কোষ ইত্যাদি তৈরির সময় নানা রকমের CFC যৌগ আমাদের বায়ুমণ্ডলে যুক্ত হয়। এরা প্রত্যেকেই ওজোন স্তরের মারাত্মক শত্রু। এই ক্লোরো ফ্লুরো কার্বন গোষ্ঠীভুক্ত গ্যাসগুলি বা যৌগগুলি স্থায়ী প্রকৃতির এবং সেজন্য এরা প্রায় 100 বছর ধরে অবিকৃত অবস্থায় থাকে। এসব গ্যাস উৎপাদনের প্রায় 30 বছর পরে ধীরে ধীরে স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে পৌঁছোয় এবং সেখানে পৌঁছানোর পর সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মির উপস্থিতিতে ইলেকট্রন যুক্ত হয়ে ক্লোরিন পরমানুতে বিয়োজিত হয়, যা আবার ওজোন গ্যাসকে ক্লোরিণ মনোক্সাইড (ClO) এ পরিণত করে। এই ClO বা ক্লোরিণ মনোক্সাইড এরপর আবার মুক্ত ইলেকট্রন বিশিষ্ট ক্লোরিণ পরমানু তৈরি করে এবং ক্রমান্বয়ে শৃঙ্খল বিক্রিয়ায় অন্য ওজোন অণু ধ্বংস করতে থাকে। এভাবে মাত্র এক অণু ক্লোরোফ্লুরো কার্বন হাজার হাজার ওজোন অণুকে ধ্বংস করে।

এভাবেই মনুষ্যসৃষ্ট নানা রকম গ্যাস আমাদের পৃথিবীর আবহমণ্ডলের সুরক্ষা প্রদানকারী ওজোন গ্যাস স্তরে ছিদ্র বা গহ্বর তৈরি করেছে এবং করে চলেছে। যার ফলে আমরা আজ নানা রকম পার্থিব ক্ষতির মুখোমুখি আজ আমরা।

10.2.6 ওজোন স্তরের ক্ষয়ক্ষতিতে আমাদের ক্ষতি

ওজোন স্তরের সুরক্ষা আচ্ছাদন গোটা পৃথিবীটাকে ঘিরে রেখেছে। এই স্তরে সূর্যের আলোর মধ্যে উপস্থিত ক্ষতিকর অতিবেগুনী রশ্মি এবং অন্যান্য ক্ষতিকর মহাজাগতিক রশ্মি প্রতিহত হয়। ফলে এসব ক্ষতিকর রশ্মিগুলি ওজোন স্তরের আচ্ছাদনে প্রতিফলিত হয়ে আবার মহাশূন্যে ফিরে যায়। পার্থিব কোন ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে না।

অতিবেগুনী রশ্মির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য অনুসারে তিনরকম অতিবেগুনী রশ্মিকে পৃথক করা যায়। অতিবেগুনী রশ্মি A বা UV-A। এর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য 320-400 ন্যানোমিটার। অতিবেগুনী রশ্মি B বা UV-B এর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য 280-320 ন্যানোমিটার আর অতিবেগুনী রশ্মি C বা UV-C যার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য 280 ন্যানোমিটার থেকে কম। ক্ষতি সাধনের দিক থেকে এই UV-C বা UV-C ই হলো সবচেয়ে মারাত্মক। যদিও স্বাভাবিক অবস্থায় এই UV-C রশ্মির প্রায় সবটাই ওজোন স্তরে শোষিত হয়। ওজোন স্তর ভেদ করে আমাদের বায়ুমণ্ডলে বা ভূপৃষ্ঠে তা পৌঁছতে পারে না। ওজোন স্তর পাতলা হয়ে যাওয়ায় এবং তাতে ছিদ্র সৃষ্টি হওয়ায় এখন UV-B রশ্মি ওজোন স্তর ভেদ করে পৃথিবীতে পৌঁছায় ও নানা ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে।

পথিবীর ওজোন স্তরের গহ্বর নিয়ে বিজ্ঞানীদের আশঙ্কা 1974 সাল থেকে শুরু হলেও প্রথমে ব্যাপারটিকে কেউই তেমন গুরুত্ব দিতে চায়নি। শেষ পর্য্যন্ত 1987 সালে মার্কিন মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র বা NASA ওজোন স্তরের অবস্থাটা জানার জন্য বিস্তারিত সমীক্ষা এবং পরীক্ষা নিরীক্ষা চালায়। আর তখনই আমরা বিজ্ঞান সম্মত ভাবে ওজোন স্তরের গহ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করি। দেখা যায় বিশেষভাবে দক্ষিণ মেরুর ওপর থাকা ওজোন স্তরে বিশাল

এক শূণ্যতা বা গহ্বর সৃষ্টি হয়েছে। ফলে সূর্যের ক্ষতিকর অতিবেগুণী রশ্মি সরাসরি পৃথিবীর জীবজগতের ক্ষতি করছে। ওজোন স্তর আর তা পুরোপুরি প্রতিরোধ করতে পারছে না।

অতিবেগুণী রশ্মির উপস্থিতিতে ত্বক বা চামড়ার ক্যানসার হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের উত্তর ভাগের মানুষদের মধ্যে এই ওজোন স্তরের ক্ষয়ের কারণে ত্বকের ক্যানসারের প্রবণতা এবং প্রাদুর্ভাব বেড়ে গেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এখন প্রতি বছর এই ত্বকের ক্যানসার বা মেলানোমায় আক্রান্ত হয়ে প্রায় 2300 মানুষ মারা যায়। বিজ্ঞানীরা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে 10 শতাংশ ওজোন স্তর ক্ষয় হলেই গোটা পৃথিবীর প্রায় তিন লক্ষ লোক বেসাল কোষ এবং ত্বকের স্কোয়ামাস কোষের ক্যান্সারে আক্রান্ত হবে প্রতি বছর এবং অতিরিক্ত প্রায় হাজার দশেক মানুষ মেলানোমা জাতীয় ত্বকের ক্যান্সারে আক্রান্ত হবে। শুধুমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের প্রায় 15 লক্ষ মানুষ আগামী চল্লিশ বছরের মধ্যে ত্বকের ক্যান্সারে আক্রান্ত হবে। একই সময়ে প্রায় 50 লক্ষ মানুষ চোখের ছানি জনিত রোগে আক্রান্ত হবে। অতিবেগুণী রশ্মির প্রভাবে প্রতি বছর সারা পৃথিবীর প্রায় 16 লক্ষ মানুষ চোখের ছানি পড়া বা cataraet রোগে আক্রান্ত হবে। ত্বকের ক্যান্সার ছাড়াও ত্বকের বা চামড়ার নানারকম রোগ, চোখের নানা উপসর্গ ইত্যাদি প্রকাশ পাবে।

মাত্র আড়াই শতাংশ ওজোন স্তরের ক্ষয় হলেই আমাদের প্রায় সবরকম প্রধান খাদ্যশস্যের উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হবে বা কমে যাবে। জলে থাকা ফাইটোপ্লাঙ্কটন ইত্যাদি অনুজীবের সংখ্যা প্রচুর পরিমাণে কমে যাবে অতিবেগুণী রশ্মির প্রভাবে। ফলে খাদ্য শৃঙ্খলের প্রাথমিক স্তরেই উৎপাদন শক্তি কমে গিয়ে খাদ্য শৃঙ্খল এবং খাদ্য জালক ব্যবস্থাটি দারুণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

এছাড়া গ্লোবাল ওয়ার্মিং বা পার্থিব উষ্ণতা বৃদ্ধির সমস্যা আছেই। ওজোন স্তরের ক্ষয় ঘটলে পৃথিবীর উষ্ণতাও বেড়ে যাবে। ফলে দেখা দেবে আরও নানা রকম ক্ষতির আশঙ্কা।

১। প্রখ্যাত যুগোশ্লাভ সমুদ্র জীববিজ্ঞানী এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘের সমুদ্র ও উপকূলবর্তী এলাকায় পরিবেশ সংক্রান্ত প্রকল্পের অধিকর্তা স্টিফেন কেকেস (Stephen Keekes) এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে আগামী 30 বছরের মধ্যে পার্থিব উষ্ণতা বৃদ্ধি জনিত কারণে সমুদ্র তলের উষ্ণতা বৃদ্ধি পাবে যথেষ্ট এবং তাতে অনেক দেশ পুরোপুরি মুছে যাবে মানচিত্র থেকে এবং উপকূলবর্তী শহরগুলির সবই অর্থাৎ বোস্টন থেকে মুম্বাই জলের নীচে তলিয়ে যাবে। Keekes এর হিসেব মতো আগামী তিন দশকের মধ্যে জলতল দেড় থেকে সাড়ে তিন মিটার পর্যন্ত উঁচু হয়ে যাবে।

মাত্র একমিটার জলতলের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলেই মালদ্বীপ মানচিত্র থেকে মুছে যাবে। আর গঙ্গা অববাহিকার অসংখ্য জনপদ জলমগ্ন হয়ে পড়বে আগামী শতাব্দীর শুরুতেই।

২। পার্থিব উষ্ণতা বৃদ্ধির জন্য মৌসুমী বায়ুর গতিপথে পরিবর্তিত হয়ে কোন কোন অঞ্চল কম বৃষ্টির জন্য মরুভূমিতে পরিণত হবে এবং একই কারণে কোন কোন অঞ্চলে প্রবল বৃষ্টিপাত হবে।

৩। সমুদ্রের উষ্ণতা বৃদ্ধির জন্য সমুদ্র জলের আয়তন বৃদ্ধি পাবে। এর সঙ্গে যুক্ত হবে হিমবাহ ও তুন্দ্রা অঞ্চলের বরফ গলে গিয়ে সমুদ্র জলের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার ঘটনা। ফলে উর্বর ব-দ্বীপ অঞ্চলে যেমন ভারত, বাংলাদেশ, মিশর, ইন্দোনেশিয়া, চীন ইত্যাদি দেশের উপকূলগুলি প্লাবিত হবে এবং সমুদ্রের জলের জন্য উর্বরতা নষ্ট হবে।

৪। এছাড়াও সামুদ্রিক জীব বৈচিত্র্য ও খাদ্য শৃঙ্খল নষ্ট হবে। মানুষের এবং জলজীবের খাদ্যভান্ডারে টান পড়বে। স্বাভাবিক জলের উৎসগুলি সমুদ্রের নোনা জলে মিশে গিয়ে পানীয় জলের তীব্র অভাব দেখা দেবে।

10.2.7 প্রতিরোধের পদ্ধতি

কানাডার মন্ট্রিলে 1987 সালে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি (Montreal Protocol) সম্পাদিত হয়। এতে অংশগ্রহণকারী 34টি দেশ ক্লোরো ফ্লুরো কার্বন-এর ব্যবহার যথাসম্ভব কমানো এবং 2000 সালের মধ্যে

এই গ্যাসটির ব্যবহার 50 শতাংশ কমিয়ে দেবার প্রস্তাব গ্রহণ করে। ক্লোরো ফ্লুরো কার্বনের বিকল্প খোঁজার চেষ্টা চলছে বহুদিন ধরে। 1990 এর জুন মাসে লন্ডন সম্মেলনে সমস্ত উন্নত দেশগুলি 2000 সালের মধ্যে এই ক্ষতিকর গ্যাসটির ব্যবহার পুরোপুরি বন্ধ করার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছে। ইতিমধ্যে বিজ্ঞানীরা খুঁজে পেয়েছেন CFC-এর নানা ধরনের বিকল্প। CFC ছাড়াও কার্বন টেট্রাক্লোরাইড (CCl_3+) এবং ক্লোরোফর্ম ($CHCl_3$) ব্যবহারেও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

কীটনাশক ও নানা প্রসাধন দ্রব্য স্প্রে করার জন্য CFC-এর ব্যবহার হয়। এগুলো শুধুমাত্র উচ্চচাপে স্প্রে করার জন্য বলা হয়েছে। এছাড়াও CFC-এর বদলে অন্য রাসায়নিক, যেমন—HCFC ব্যবহার করা যেতে পারে।

এভাবে বিজ্ঞানীদের CFC ব্যবহার কমানোর প্রচেষ্টার সঙ্গে যদি আমাদের আন্তরিক সদিচ্ছা যুক্ত হয় তবেই এসব গ্যাসের ব্যবহার আমরা বন্ধ করতে পারবো এবং আমাদের পরিবেশকে মারাত্মক ক্ষতির হাত থেকে বাঁচাতে পারবো।

10.2.8 ইউট্রোফিকেশন (Eutrophication) বা জলে পুষ্টিগুণের বৃদ্ধি

স্বাভাবিক অবস্থায় আবদ্ধ জলে খনিজ লবনের পরিমাণ খুব কম থাকে তাই সেখানে খুব বেশি পরিমাণে জলজ জীব বসবাস করতে পারে না। নির্দিষ্ট সংখ্যক জলজ জীব বসবাসের ফলে সেই জলের পরিবেশ স্বাভাবিক থাকে। এই অবস্থাকে অলিগোট্রফিক (Oligotrophic) অবস্থা বলে। আবদ্ধ জলাশয় ছাড়াও নদী এবং সাগরের জলেও সাধারণত এই অলিগোট্রফিক অবস্থাই স্বাভাবিক ভাবে বজায় থাকে, ফলে এসব জলে খুব বেশি পরিমাণে নীলাভ সুবজ শ্যাওলা, জলজ আগাছা এবং ব্যাকটেরিয়া জন্মাতে পারে না। আর এ কারণেই পুকুর, হ্রদ, নদী ও সাগরের জল স্বচ্ছ এবং নাব্য থাকতে পারে। কিন্তু মনুষ্য সৃষ্ট নানারকম দূষণের ফলে জলের এই স্বাভাবিক অলিগোট্রফিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটে চলেছে।

10.2.8.1 পরিবর্তনের রূপরেখা

পয়ঃপ্রণালী নিঃসৃত নানারকম জৈব বর্জ্যবস্তু, কারখানা থেকে নির্গত রাসায়নিক এবং জৈব বর্জ্যবস্তু এবং সর্বোপরি কৃষিক্ষেত্রের বিভিন্ন নাইট্রেট, সালফেট ও ফসফেট সার ইত্যাদি বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ধীরে ধীরে কাছাকাছি অবস্থিত পুকুর, হ্রদ, নদী ইত্যাদি জলাশয়ে এসে জমা হয়। এর মধ্যে ফসফেট লবন জীবের জন্য অতিরিক্ত পুষ্টির জোগান দিতে সক্ষম। এছাড়াও নানারকম ব্যাকটেরিয়ার উপস্থিতিতে এসব নানা জৈব রাসায়নিক পদার্থ বিয়োজিত হয়ে পুষ্টিকর উপাদানে পরিণত হয় যা জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয়ের পক্ষেই বৃদ্ধি সহায়ক।

10.2.8.2 সংজ্ঞা

যে পদ্ধতিতে জলাশয়ে নানারকম জৈব রাসায়নিক পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে জলের পুষ্টিগুণ বাড়িয়ে তোলে তাকে ইউট্রোফিকেশন (Eutrophication) বা জলের পুষ্টিগুণ বৃদ্ধি বলে।

এর ফলে জলাশয়ে নানারকম জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীর বৃদ্ধি ঘটে। জলের ফসফেট এবং নাইট্রেট লবন এসব জীবের পুষ্টি সরবরাহ করে। জলের দূষণের সঙ্গে তাই ইউট্রোফিকেশনের সরাসরি সম্পর্ক থাকে। সমগ্র পৃথিবীতে 1994-95 সালে মোট প্রায় এক কোটি টন রাসায়নিক সার ব্যবহৃত হয়েছে। ব্যবহৃত এসব সারের মধ্যে ফসফেট জাতীয় সারের প্রয়োগই সব চাইতে বেশি। আমরা ইতিমধ্যেই জেনেছি যে ফসফেট জাতীয় সারের দূষণ জলে ইউট্রোফিকেশন ঘটায় সব থেকে বেশি। কৃষিকার্য্যে ব্যবহৃত এসব সার ধীরে ধীরে সব রকম জলাশয়ে জমা হতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে ইউট্রোফিকেশন বা জলের পুষ্টিগুণ বেড়ে গিয়ে প্রচুর পরিমাণে শ্যাওলা, জলজ আগাছা এবং নীলাভ সবুজ শ্যাওলা জন্মায়। এই নীলাভ সবুজ শ্যাওলা জলের ওপর একটি পুরু স্তর সৃষ্টি করে এবং দূর্গন্ধযুক্ত একটি bloom তৈরি হয়।

10.2.8.3 ইউট্রেফিকেশনের কুফল

নীলাভ সবুজ শ্যাওলার এই আস্তরণ অমেরুদন্ডী কিছু প্রাণী এবং জু-প্লাঙ্কটনের খাবার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। নীলাভ সবুজ শ্যাওলার স্তর যখন জলের ওপর পুরু আচ্ছাদন সৃষ্টি করে তখন স্বাভাবিক ভাবেই সূর্য্যের আলো জলের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না। এর জন্য জলে থাকা অন্যান্য উদ্ভিদ এবং শ্যাওলা সালোক সংশ্লেষ করতে পারে না। ফলে জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যেতে থাকে। কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে থাকে। তার উপর কিছু শ্যাওলা স্ট্রিফ্নিন নামক বিষাক্ত উপক্ষার সংশ্লেষ করতে থাকে। ফলে জলজ প্রাণী ও মাছ অক্সিজেনের অভাব ও বিষাক্ত পরিবেশে মারা যায়।

ইউট্রোফিকেশন চলতে থাকলে ধীরে ধীরে আগাছাপূর্ণ এবং দূর্গন্ধময় হয়ে ওঠে। জলজীব এবং মাছেরা ঐ জলে বাঁচতে পারে না। এমনকি ঘন আগাছার জন্য ঐ জলে নৌকা বা বোট চালানোও সম্ভব হয় না। জলের দূষণ বন্ধ না হলে শেষ পর্য্যন্ত জলাশয়টি পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে। আমাদের পরিচিত কাশ্মীরের ডাল হ্রদও এই জলদূষণ এবং তজ্জনিত ইউট্রোফিকেশনের কবলে পড়েছে। পৃথিবীর নানা দেশের উপকূলবর্তী সমুদ্রের অগভীর জলে শহর এবং নগরের পয়ঃপ্রণালীর বর্জ্য পদার্থ জমে জমে ইউট্রোফিকেশনের জন্য ঘন আগাছা পূর্ণ এলাকার সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের আশেপাশের নানা জলাশয় এবং হ্রদও নিয়মিত দূষণের ফলে ইউট্রোফিকেশনের কবলে পড়েছে। কলকাতার পূর্ব প্রান্তের বিশাল জলাভূমিও আজ এই কারণে নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে।

10.2.8.4 প্রতিকারের উপায়

জলে প্রচুর পরিমাণে জৈব পুষ্টিগুণের উপস্থিতিই ইউট্রিফিকেশনের প্রধান কারণ। সেজন্য জলে এসব জৈব পদার্থের অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে শহরের জৈবপদার্থ পূর্ণ দূষিত জল যেন সরাসরি এসব জলাশয়ে ফেলা না হয়। গঙ্গা অ্যাকশন প্লানের মতোই এসব দূষিত জল সম্পূর্ণভাবে পরিশোধন করে তবেই তা জলাশয়ে ফেলা যেতে পারে। চামড়ার ট্যানারী, মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র, পোলট্রী, গবাদিপশুর চাষের কেন্দ্র, দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র, মাংস প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র ইত্যাদি থেকে দূষিত বর্জ্য তরল যা বহুল পরিমাণে জৈব খাদ্যে ভরপুর, তা যেন সরাসরি জলাশয়ে না পড়ে। এসব কেন্দ্রের বর্জ্য তরলকে অন্যভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে অথবা পরিশোধন করার পর জলাশয়ে ফেলা যেতে পারে।

সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হলো কৃষিক্ষেত্রের রাসায়নিক সারের ফসফেট ও নাইট্রেট লবনের অবশিষ্টাংশ যাকে কোন ভাবেই সরাসরি জলে না ফেলা হয় তা দেখতে হবে। এসব লবন পূর্ণ পুষ্টিগুণ সম্পন্ন জল চাষের জমিতে পুনঃপুনঃ ব্যবহার করা যেতে পারে বা অন্য কাজেও ব্যবহার করা যেতে পারে। এসব কৃষিক্ষেত্রের অতিরিক্ত জলই জলাশয়ে পতিত হয়ে ইউট্রোফিকেশনের প্রধান ভূমিকা পালন করে। তাই যেমনভাবেই হোক না কেন এটা আমাদের বন্ধ করতেই হবে। কৃষিকার্যে সারের ব্যবহার কমাতে হবে। বিকল্প হিসেবে জীবাণু সার ব্যবহার করতে হবে। এছাড়াও ইউট্রোফিকেশন বন্ধ করার জন্য মানুষের শুভবুদ্ধি জাগ্রত করতে হবে।

10.3 অনুশীলনী/প্রশ্নাবলী ও উত্তরমালা

1. সঠিক উত্তরটিতে ✓ চিহ্ন দাও ঃ-

(a) CFC বা ক্লোরো-ফ্লুরো-কার্বনের বিকল্প হিসেবে কোন রাসায়নিক ব্যবহার করা যায়?

(i) NCFC (ii) OCFC (iii) HCFC

(b) অতিবেগুণী রশ্মির ক্ষতিকর প্রভাবে প্রতি বছর আনুমানিক প্রায় 16 লক্ষ মানুষের—

(i) চোখে ছানি পড়বে (ii) ক্যানসার রোগ হবে (iii) শ্বাসকষ্ট জনিত রোগ হবে।

(c) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এখন প্রতি বছর ত্বকের ক্যানসারে 2300 মানুষ মারা যাবার প্রধান কারণ

(i) পার্থিব উষ্ণতা বৃদ্ধি (ii) ওজোন স্তরের ছিদ্র (iii) জলদূষণ।

(d) ওজোন স্তরের গহ্বরের আয়তন প্রতি বছর সর্বোচ্চ হয়—

(i) শরৎকালে (ii) বর্ষাকালে (iii) গ্রীষ্মকালে।

(e) ভূপৃষ্ঠের গড় উষ্ণতা হলো—

(i) 15° সেলসিয়াস (ii) 25° সেলসিয়াস (iii) 30° সেলসিয়াস।

(f) গ্রীনহাউস গ্যাসগুলির মধ্যে অন্যতম কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পার্থিব উষ্ণতা বৃদ্ধির জন্য ভূমিকা

(i) 30 শতাংশ (ii) 25 শতাংশ (iii) 50 শতাংশ।

(g) ক্লোরো ফ্লুরো কার্বন গ্যাসগুলির তাপধারণ ক্ষমতা কার্বন-ডাই-অক্সাইডের থেকে—

(i) 5 হাজার গুণ বেশি (ii) 10 হাজার গুণ বেশি (iii) 20 হাজার গুণ বেশি।

(h) ভূপৃষ্ঠ থেকে কতটা উর্দ্ধে ওজোন গ্যাসের ঘনত্ব সবচাইতে বেশি থাকে?

(i) 25 কিলোমিটার (ii) 10 কিলোমিটার (iii) 50 কিলোমিটার।

(i) গ্রীণহাউস গ্যাসগুলি না থাকলে ভূপৃষ্ঠ ও সংলগ্ন বায়ুমন্ডলের তাপমাত্রা দাঁড়াতো—

(i) –10° সেলসিয়াস (ii) –18° সেলসিয়াস (iii) –25° সেলসিয়াস।

(j) মিথেন গ্যাসটির পার্থিব উষ্ণতাবৃদ্ধির জন্য ভূমিকা—

(i) 18 শতাংশ (ii) 5 শতাংশ (iii) 10 শতাংশ।

10.4 উত্তরমালা

a) — (iii); b) — (i); c) — (ii); d) — (i); e) — (i)

f) — (iii); g) — (ii); h) — (i); i) — (ii); j) — (i)

10.5 সারাংশ

পৃথিবীই সৌর জগতের একমাত্র গ্রহ যেখানে জীবন ধারণ সম্ভব। জীবের বেঁচে থাকার এবং সীমাহীন জীব বৈচিত্র্যকে ধারণ করার জন্য পৃথিবীর আবহমন্ডলে আছে নির্দিষ্ট পরিমাণ অক্সিজেন, কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও নাইট্রোজেন।

তাছাড়া পৃথিবীপৃষ্ঠ এবং তার সংলগ্ন বায়ুমণ্ডলেরও একটা নির্দিষ্ট উষ্ণতা আছে। এসব মিলেই পৃথিবীতে জীবের বেঁচে থাকার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

বায়ুমণ্ডলে অবস্থিত বিভিন্ন গ্যাস সূর্য থেকে তাপ শোষণ করে পৃথিবীপৃষ্ঠ ও সংলগ্ন বায়ুমন্ডলকে উষ্ণ রাখে। বিকিরিত তাপকে মহাশূন্যে ফিরে যেতে দেয় না। এরকমই প্রাকৃতিক গ্যাস হলো কার্বন-ডাই-অক্সাইড আর মিথেন। তাছাড়া শিল্পজাত বা মনুষ্য সৃষ্ট গ্যাস ক্লোরো ফ্লুরো কার্বন-ডাই-অক্সাইড আর মিথেন। তাছাড়া শিল্পজাত বা মনুষ্য সৃষ্ট গ্যাস ক্লোরো ফ্লুরো কার্বন (CFC), নাইট্রোজেন-ডাই-অক্সাইড (NO_2), নাইট্রিক অক্সাইড (NO_2), নাইট্রাস অক্সাইড (NO_2) ইত্যাদি গ্যাস বিকিরিত তাপ শোষণ করে পৃথিবীর উষ্ণতা বাড়ায়। এদের গ্রীন হাউস গ্যাস বলা হয়। এসব গ্যাসের পরিমাণ অনেক বেড়ে যাওয়াতে আমাদের প্রয়োজনের অনেক বেশি এবং অতিরিক্ত উষ্ণতার সৃষ্টি হয়েছে। একেই গ্লোবাল ওয়ার্মিং বা পার্থিব উষ্ণতা বৃদ্ধি বলা হয়।

গ্রীন হাউস গ্যাসগুলির মধ্যে আবার ফ্লুরো কার্বন (CFC), নাইট্রাস অক্সাইড (N_2O), নাইট্রিক অক্সাইড (NO), নাইট্রোজেন-ডাই-অক্সাইড (NO_2) ইত্যাদি গ্যাস মনুষ্য সৃষ্ট এবং বায়ুমণ্ডলের ওজোন স্তরের মারাত্মক শত্রু। এই ওজোন স্তর পৃথিবীর চারিদিকে পুরু চাদরের মতো আচ্ছাদন সৃষ্টি করে। ওজোন স্তরের জন্যই সূর্যের ক্ষতিকারক অতিবেগুনী রশ্মি আমাদের বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করতে পারে না। দুঃখের কথা এসব গ্রীনহাউস গ্যাসের ক্রমাগত বৃদ্ধি ঐ রক্ষাকবচের মতো ওজোন স্তরকে ফুটো করে দিয়েছে (Ozone Hole) ফলে সূর্যেলর বিকিরিত তাপ আরও বেশি করে ভূপৃষ্ঠ আবর্তিত হচ্ছে, বাড়ছে পার্থিব উষ্ণতা। তাছাড়া অতিবেগুনী রশ্মির মারাত্মক প্রভাবে মানুষের নানা রোগ, বিশেষভাবে ত্বকের ক্যানসার বেড়েই চলেছে। এসব প্রতিরোধে আজ সারা বিশ্বে মানুষ নানারকম ব্যবস্থা নিচ্ছে এটাই একমাত্র আশার কথা।

এছাড়া পুকুর, হ্রদ, নদী এমনকি সমুদ্রেও নিয়মিতভাবে জৈব রাসায়নিক বর্জ্য পদার্থ ফেলার জন্য জলদূষণ বেড়েই চলেছে। নানা জলাশয়ে এভাবে জৈব পুষ্টিগুণ বৃদ্ধি পাবার ফলে সৃষ্টি হয়েছে ইউট্রোফিকেশন (Eutrophication) এবং ইউট্রোফিকেশনের জন্য জলাশয় হয়ে যাচ্ছে দুর্গন্ধময় ও জলজ আগাছাপূর্ণ। জলাশয়গুলি হারিয়েছে তাদের নাব্যতা। মরে যাচ্ছে সমস্ত জলজ প্রাণী ও মাছ। দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যাওয়ায় নীলাভ সবুজ শ্যাওলা ও ব্যাকটেরিয়ার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটছে এবং শেষ পর্য্যন্ত জলাশয়গুলি পরিত্যক্ত হয়ে পড়ছে। মনুষ্যসৃষ্ট জলদূষণ রোধ করলে এই ইউট্রোফিকেশন জনিত দুর্ভোগের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

10.6 সর্বশেষ প্রশ্নমালা

সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও—

(a) গ্রীন হাউস গ্যাস কাকে বলে?

(b) দুটি প্রাকৃতিক গ্রীন হাউস গ্যাসের নাম লেখ।

(c) দুটি মনুষ্যসৃষ্ট গ্রীন হাউস গ্যাসের নাম লেখ।

(d) পার্থিব উষ্ণতা বৃদ্ধি কাকে বলে?

(e) ওজোন গ্যাস কিভাবে ধ্বংস করে?

(f) গ্রীন হাউস গ্যাসের অনুপস্থিতিতে কি কি অসুবিধা হয়?

(g) ওজোন গ্যাসের স্তরকে বাঁচাবার জন্য আন্তর্জাতিক স্তরে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে?

(h) CFC গ্যাসগুলির উৎস কি কি?

(i) অতিবেগুনী রশ্মি কয় প্রকার? এদের মধ্যে সব থেকে মারাত্মক কোনটি?

(j) ইউট্রোফিকেশনের সংজ্ঞা দাও।

(k) কিভাবে ইউট্রোফিকেশন প্রতিরোধ করা যায়?

10.7 উত্তরমালা

(a) 10.2.1 প্রথম অনুচ্ছেদ।

(b) CO_2 এবং মিথেন।

(c) ক্লোরোফ্লুরো কার্বন ও নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড।

(d) 10.2.2

(e) 10.2.5

(f) 10.2.1 প্রথম অনুচ্ছেদ।

(g) 10.2.7. প্রথম অনুচ্ছেদ।

(h) চিকিৎসায় ব্যবহৃত জীবাণুনাশক, শিল্পে ব্যবহৃত দ্রাবক, সব রকমের স্প্রে (এরোসল), রেফ্রিজারেটর, এয়ারকন্ডিশনার ও প্লাস্টিক ফোম ইত্যাদি উৎপাদনের সময় CFC ব্যবহৃত হয়।

(i) 10.2.6 দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

(j) 10.2.8 সংজ্ঞা

(k) 10.2.8 প্রতিকারের উপায়।

সঠিক উত্তরটি বেছে নাও—

(a) প্রাকৃতিক উৎসজাত প্রধান গ্রীন হাউস গ্যাসটি হল—

(i) হাইড্রোজেন (ii) অক্সিজেন, (iii) কার্বন-ডাই-অক্সাইড

(b) গ্রীন হাউস গ্যাস না থাকলে পৃথিবী—

(i) শীতল হয়ে পড়তো, (ii) বেশি উষ্ণ হয়ে পড়তো, (iii) কিছুই হতো না।

(c) মনুষ্য সৃষ্ট সবচাইতে শক্তিশালী গ্রীন হাউস গ্যাসটির নাম—

(i) মিথেন, (ii) নাইট্রিক অক্সাইড, (iii) ক্লোরোফ্লুরো কার্বন।

(d) পার্থিব উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলিতে প্লাবন দেখা দিতে পারে—

(i) মেরু প্রদেশের বরফ গলার জন্য, (ii) অতিবৃষ্টির জন্য, (iii) ভূমিস্তর বসে যাবার জন্য।

(e) বায়ুমন্ডলের কোন স্তরে ওজোন গ্যাসের ঘনত্ব সবচাইতে বেশি?

(i) স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার, (ii) ট্রাফোস্ফিয়ার, (iii) আয়নোস্ফিয়ার।

(f) মানুষের উপর সবচাইতে ক্ষতিকর প্রভাব কার?

(i) UV-A রশ্মি, (ii) UV-B রশ্মি, (iii) UV-C রশ্মি।

(g) কোন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে আগামী 2000 সালের মধ্যে CFC-এর ব্যবহার পুরোপুরি বন্ধের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়?

(i) 1987-র মন্ট্রিল সম্মেলন, (ii) 1990-র লন্ডন সম্মেলন, (iii) 1995-এর স্টকহোম সম্মেলন

(h) কোন অজৈব লবনের উপস্থিতিতে জলাশয়ে ইউট্রোফিকেশন খুব বৃদ্ধি পায়?

(i) ক্যালসিয়াম ফসফেট, (ii) অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট, (iii) সোডিয়াম সালফেট।

(i) ইউট্রোফিকেশন চলতে থাকলে জলাশয়ের জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ

(i) কমতে থাকে, (ii) বাড়তে থাকে, (iii) অপরিবর্তিত থাকে।

উত্তরমালা

(a) — (iii) ; (b) — (i) ; (c) — (iii) ; (d) — (i) ; (e) — (i) ; (f) — (iii) ; (g) — (ii) ; (h) — (i) ; (i) — (i).

দীর্ঘ উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

(a) কিভাবে গ্লোবাল ওয়ার্মিং ঘটে?

(b) ওজোন স্তরে কিভাবে ছিদ্র হয়?

(c) ওজোন স্তরে ছিদ্র হলে মানুষের কি কি ক্ষতি হয়?

(d) ইউট্রোফিকেশনের কুফলগুলি কি কি এবং তাদের প্রতিকার কিভাবে সম্ভব?

উত্তরমালা

(1) 10.2.1 এবং 10.2.2

(2) 10.2.5

(3) 10.2.6

(4) 10.2.8.3 এবং 10.2.8.4

সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ ঃ

1. গ্রীন হাউস ক্রিয়া, 2. ওজোন গহ্বর, 3. ক্লোরোফ্লুরো কার্বন,

4. পার্থিব উষ্ণতা বৃদ্ধি, 5. অতিবেগুনী রশ্মি, 6. ইউট্রোফিকেশন।

উত্তরমালা

(1) 10.2.1

(2) 10.2.4

(3) 10.2.3 এর ক্লোরোফ্লুরো কার্বন অংশ

(4) 10.2.1 এর শেষাংশ

(5) 10.2.6 এর দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

(6) 10.2.8.2

একক 11 ❑ পরিবেশগত বিষবিদ্যা

গঠন

11.1 প্রস্তাবনা
উদ্দেশ্য
11.2 বিষাক্ত পদার্থ ও বিষবিদ্যা
11.3 জীবের উপর বিষাক্ত পদার্থের প্রভাব
11.4 বিষাক্ত পদার্থের ক্ষণস্থায়ী প্রভাব
11.5 বিষাক্ত পদার্থের দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব
11.6 LC 50 এবং LD 50
11.7 জৈব মূল্যায়ন
11.7.1 জৈব নির্দেশক
11.7.2 জৈব মূল্যায়ন কর্মসূচীতে জীবকূলের ব্যবহার
11.8 পরিবেশগত অভিঘাত মূল্যায়ন
11.8.1 পরিবেশগত অভিঘাত মূল্যায়নের সংজ্ঞা ও বিভিন্ন ধাপগুলির বৈশিষ্ট্য
11.8.2 পরিবেশগত অভিঘাত মূল্যায়নের পদ্ধতি
11.9 সারাংশ
11.10 সর্বশেষ প্রশ্নমালা
11.11 উত্তরমালা

11.1 প্রস্তাবনা

প্রস্তাবনা

জনসংখ্যার উত্তরোত্তর বৃদ্ধির ফলে খাদ্য, বাসস্থান এবং চাহিদা এমনভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে যে মানুষ প্রকৃতিকে নিজের ইচ্ছামত ব্যবহার করছে। বন কেটে, খাদ্য উৎপাদনের জন্য অধিক কৃষি জমি তৈরি, সার ও বিভিন্ন কীটনাশক ব্যবহার করে এবং ফসল উৎপাদন, শিল্পজাত পদার্থের উৎপাদন বৃদ্ধি ইত্যাদির ফলে পরিবেশ বিভিন্নভাবে দূষিত হচ্ছে। বিভিন্ন শিল্পের উপজাত বিভিন্ন বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ, অজৈব সার, কীটনাশক ইত্যাদি মানুষ ও বাস্তুতন্ত্রের বিভিন্ন জৈব উপাদানের ওপর মন্দ প্রভাব ফেলছে এবং মানুষের বিভিন্ন রোগ সৃষ্টি করছে। সুতরাং এই সকল রাসায়নিক পদার্থের বিষক্রিয়া সম্বন্ধে আমাদের ধারণা হওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন—

- বিষাক্ত পদার্থ এবং বিষবিদ্যা সম্বন্ধে আলোচনা করতে পারবেন।
- জীবের ওপর বিভিন্ন বিষাক্ত পদার্থের প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

- বিষাক্ত পদার্থের ক্ষণস্থায়ী ও দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- বিষাক্ত পদার্থের মাত্রার দুটি উল্লেখযোগ্য বিষয় LC 50 এবং LD 50 সম্পর্কে ধারণা দিতে পারবেন।
- জৈব মূল্যায়ন কি তা জানতে পারবেন।
- জৈব নির্দেশক সম্পর্কে একটা ধারণা পাবেন।
- জৈব মূল্যায়ন কর্মসূচীতে জীবকূলকে কিভাবে ব্যবহার করা হয় তার ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।
- পরিবেশগত অভিঘাত মূল্যায়ন কি? ইহার বিভিন্ন ধাপগুলির বৈশিষ্ট্য এবং পরিবেশগত অভিঘাত মূল্যায়ন পদ্ধতি সম্পর্কে আলোকপাত করতে পারবেন।

11.2 বিষাক্ত পদার্থ ও বিষবিদ্যা

নিম্নে বিষাক্ত পদার্থ ও বিষবিদ্যা সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

বিষাক্ত পদার্থ ঃ যে সকল রাসায়নিক পদার্থ পরিবেশের জৈব উপাদান (মাইক্রোবস্, উদ্ভিদ, প্রাণী) এর উপর মন্দ প্রভাব সৃষ্টি করে তাদের বিষাক্ত পদার্থ বলে।

যেমন— কলকারখানা থেকে নির্গত বিভিন্ন উপজাত পদার্থ, কীটনাশক, অজৈব সার, ভারী ধাতু ইত্যাদি।

বিষবিদ্যা ঃ যে বিদ্যায় বিষাক্ত পদার্থের বিষক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করা হয় তাকে বিষবিদ্যা বলে।

11.3 জীবের উপর বিষাক্ত পদার্থের প্রভাব

কৃষিতে যে সকল অজৈব সার ও কীটনাশক ব্যবহার করা হয় তা বিভিন্নভাবে স্থলজ ও জলজ বাস্তুতন্ত্রের ক্ষতি সাধন করে। বিভিন্ন অজৈব সার (নাইট্রোজেন ও ফসফরাস) বৃষ্টির জলের মাধ্যমে কৃষিজমি থেকে পুকুর বা নদীতে গিয়ে পড়ে তখন ঐ সকল জলাশয়ে পুষ্টি দ্রব্যটির পরিমাণ বেড়ে যায়, যার ফলস্বরূপ অ্যালগি বা শৈবালের ঘনত্ব খুবই বেড়ে যায়। একে প্ল্যাঙ্কটনি ব্লুম বলে। এর ফলে জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যায় এবং BOD বা বায়োলজিক্যাল অক্সিজেন ডিমান্ড বেড়ে যায়। ধীরে ধীরে জল দূষিত হয়ে পড়ে এবং উদ্ভিদ সহ মাছ প্রভৃতি জলজ প্রাণীদের বৃদ্ধি ও প্রজননের হার হ্রাস পায়।

বিভিন্ন কীটনাশক পদার্থ পেস্ট দমনের জন্য ব্যবহার করা হয়, কিন্তু বিজ্ঞান সম্মত উপায়ের ব্যবহার না করার জন্য মাটি, জল প্রভৃতি দূষিত হয়ে যাচ্ছে। কিছু কিছু কীটনাশক যেমন, DDT ইত্যাদি যাদের পরিবেশে স্থায়িত্ব অনেক বেশি তারা জলজ এবং স্থলজ বাস্তুতন্ত্রে বায়োম্যাগনিফিকেশন ঘটায় অর্থাৎ ট্রপিক্ লেভেলের উপর দিকে যাওয়ায় এই বিষাক্ত পদার্থের পরিমাণ বেড়ে যায়। মাটির মধ্যে বিভিন্নরকম মাইক্রোবস, পোকা, কেঁচো ইত্যাদি জীব মাটির সাধারণ উর্বরতা রক্ষা করে, কিন্তু বিভিন্ন কীটনাশক পদার্থ এই সকল জীবের ওপর মন্দ প্রভাব সৃষ্টি করে। ফলে মাটির বাস্তুতন্ত্র অনিয়মিত হয়ে পড়ে ও মাটির সাধারণ উর্বরতা আস্তে আস্তে কমে যায়। ঠিক সময় কীটনাশক পদার্থ ব্যবহার না করলে, মৌমাছির (যারা ইতর পরাগযোগে অংশগ্রহণ করে) সংখ্যাও কমে যায়। সাধারণতঃ আমরা জানি কীটনাশক পদার্থের ব্যবহার হওয়া উচিত শষ্যের ফুল আসার প্রাথমিক অবস্থায়। এছাড়াও বিভিন্ন কীটনাশক পদার্থ, খাদ্যে সংযোজিত বস্তু মানুষেরও বিভিন্ন রোগ যথা, ক্যানসার, বিভিন্ন জন্মগত রোগ ইত্যাদি সৃষ্টি করে।

11.4 বিষাক্ত পদার্থের ক্ষণস্থায়ী প্রভাব

এই অংশে আমরা বিষাক্ত পদার্থের ক্ষণস্থায়ী প্রভাব নিয়ে আলোচনা করব। সাধারণতঃ উচ্চ ঘনত্বের বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থের খুব স্বল্প সময়ে মানুষের ওপর ক্রিয়ার ফলে ক্ষণস্থায়ী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। বিষাক্ত পদার্থের সংস্পর্শে আসার কিছু পরেই ক্ষণস্থায়ী প্রভাবের লক্ষণ প্রকাশ পায়। উদাহরণ হিসেবে ভূপাল দুর্ঘটনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ইউনিয়ন কার্বাইড-এর মিক্ প্ল্যান্ট থেকে নির্গত MIC বা মিথাইল্ আইসো সায়ানাইড গ্যাসের সংস্পর্শে আসার সঙ্গে সঙ্গে কিছু মানুষ মারা যায় এবং কিছু মানুষ তীব্রভাবে বুকে ব্যাথা ও চোখের জ্বালা অনুভব করে। ক্ষণস্থায়ী প্রভাবের মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বিষাক্ত পদার্থের প্রকটতা বন্ধ হয়ে গেলে প্রভাব আর অনুভূত হয় না।

11.5 বিষাক্ত পদার্থের দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব

দীর্ঘ সময় স্বল্প মাত্রায় বিষাক্ত পদার্থের ব্যবহারে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব দেখা যায়। বিষাক্ত পদার্থের সংস্পর্শে আসার এক মাস বা এক বছর পরে মানুষের শরীরে প্রভাবের প্রতিক্রিয়া বা লক্ষণ প্রকাশ পায়। ভূপালে মিক্ দুর্ঘটনায় আক্রান্ত মানুষরা যে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাবের শিকার হয় তার ফলস্বরূপ কয়েক সপ্তাহ পরে মানুষের মধ্যে পঙ্গুত্ব জাতীয় উপসর্গ দেখা যায়। এছাড়া ক্যানসার, জন্মগত ত্রুটি প্রভৃতি বিভিন্ন বিষাক্ত পদার্থের দীর্ঘস্থায়ী প্রভাবও পরিলক্ষিত হয়।

11.6 LC 50 এবং LD 50

LC 50 : বিষাক্ত পদার্থের যে ঘনত্বে অর্ধেক পরীক্ষা প্রাণী মারা যায় সেই ঘনত্বকে LC 50 বলে। সাধারণতঃ এ ক্ষেত্রে বিষাক্ত পদার্থের বিভিন্ন ঘনত্ব পরীক্ষা প্রাণীর ওপর খাইয়ে বা শরীরে ইন্‌জেকশন মারফৎ প্রবেশ করিয়ে প্রয়োগ করা হয় এবং 24, 48, 72 বা 96 ঘন্টা বাদে ঐ পরীক্ষা প্রাণীর কত শতাংশ মৃত্যু হল সেটা দেখা হয়।

LD 50 : বিষাক্ত পদার্থের যে মাত্রায় প্রাণী মারা যায় সেই মাত্রাকে LD 50 বা লেথাল ডোজ 50 বলে।

বিষাক্ত পদার্থের মাত্রা বেশি এবং প্রকটকাল দীর্ঘ হলে বিষক্রিয়া অপেক্ষাকৃত বেশি হয়। কোন বিষাক্ত পদার্থের মাত্রার প্রভাব দেখার জন্য ঐ বিষাক্ত পদার্থের বিভিন্ন মাত্রা পরীক্ষা-প্রাণীর ওপর প্রয়োগ করে প্রতিক্রিয়া দেখা হয়। পরীক্ষালব্ধ ফল থেকে যে রেখা চিত্র পাওয়া যায় তাকে মাত্রা প্রতিক্রিয়া লেখ বা ডোজ রেসপনস্ কার্ভ বলে (চিত্র ঃ 11.2)।

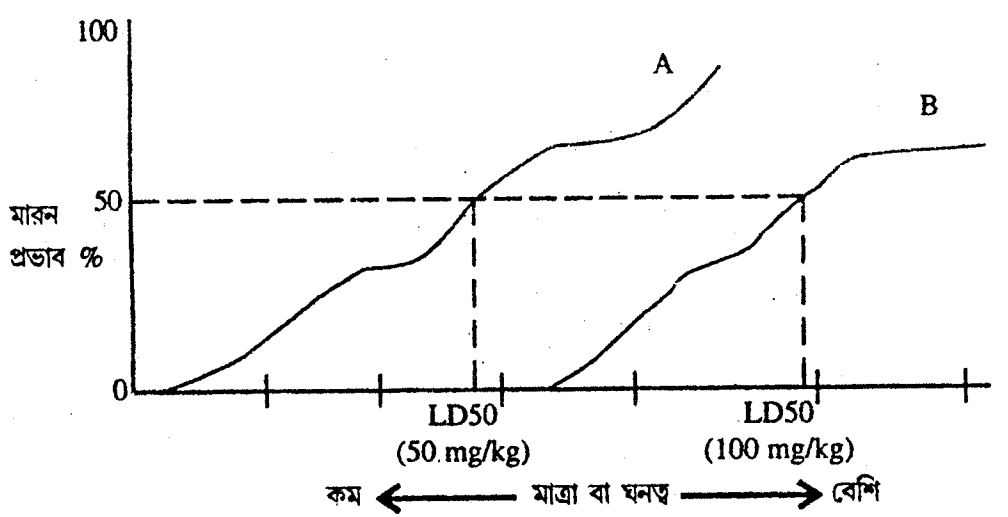

চিত্র ঃ 11.2 : 'A' এবং 'B' দুটি ভিন্ন বিষাক্ত পদার্থের 'মাত্রা প্রতিক্রিয়া লেখ' দেখানো হয়েছে।

উপরোক্ত চিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে যে 'A' পদার্থের LD 50 মাত্রা ইঁদুরের ওপর হচ্ছে 50mg/kg দেহের এবং 'B' পদার্থের LD 50 মাত্রা ইঁদুরের ওপর হচ্ছে 100mg/kg দেহের ওজন। যেহেতু 'B' পদার্থের LD 50 মাত্রা 'A' পদার্থের চেয়ে বেশি। তাই 'B' পদার্থের বিষের ঘনত্ব কম।

11.7 জৈব মূল্যায়ন

পৃথিবীর জনসংখ্যার বৃদ্ধি ও তার ফলে বন কেটে বসতি সৃষ্টির ফলে একদিকে যেমন বনাঞ্চল ধ্বংস হচ্ছে অন্যদিকে ঐ বনাঞ্চলে বসবাসকারী গাছ ও প্রাণীর বহু প্রজাতি আজ অবলুপ্তির পথে। অবৈজ্ঞানিক শিল্প স্থাপনের ফলে পরিবেশ দূষণ, বিষাক্ত আবর্জনার স্তূপীকরণ, ওজন স্তরের ক্ষয়প্রাপ্তি, অ্যাসিড বৃষ্টি, পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি ইত্যাদি মানুষের অবৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকলাপেরই ফল।

বিভিন্ন দূষণকারী পদার্থের পরিমাণ মাপার জন্য বিভিন্ন দামী যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। যেমন—HPLC (হাই প্রেসার লিকিউড ক্রোমাটোগ্রাফি), AAS (এ্যাটোমিক অ্যাবসরপসন স্পেকট্রোফোটোমিটার), MS (মাস স্পেকট্রোথেরাপি) ইত্যাদি। কিন্তু জৈব মূল্যায়নে বিভিন্ন রকম জৈব উপাদান (যেমন—উদ্ভিদ, প্রাণী ইত্যাদি) ব্যবহার করা হয়। বাস্তুতন্ত্রে জৈব মূল্যায়নের প্রথম ব্যাখ্যা করা হয় 1982 সালে কানাডার অটোয়া শহরে ইন্টারন্যাশানাল ইউনিয়ন অফ বায়োলজিক্যাল সাইনস (IUBS) এর 21তম সভায়।

11.7.1 জৈব নির্দেশক

জৈব মূল্যায়ন পদ্ধতিতে যে সকল জীবকে দূষণকারী পদার্থের মাত্রা নির্ধারণকারী সূচক বা নির্দেশক হিসাবে ব্যবহার করা হয় তাকে জৈব নির্দেশক বলে।

11.7.2 জৈব মূল্যায়ন কর্মসূচীতে জীবকূলের ব্যবহার

আমরা ইতিমধ্যেই জৈব মূল্যায়ন এবং জৈব নির্দেশক সম্বন্ধে সম্যক ধারণা পেয়েছি। এবার আমরা জৈব মূল্যায়ন কর্মসূচীতে জীবকূলের ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করব।

প্রাকৃতিক পরিবেশের জল, বায়ু, মাটি, সর্বস্তরে জীব বাস করে এবং পরিবেশ যদি স্বাভাবিক থাকে তখন জীবকূলের বেঁচে থাকতে কোনও অসুবিধা হয় না। কিন্তু পরিবেশে দূষণের ফলে জীবকূল কোন না কোন ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। জৈব মূল্যায়ন কর্মসূচীর নির্দেশক প্রজাতি বিশ্লেষণ করে পরিবেশের দূষণ সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা যায়। জৈব নির্দেশক প্রাণীদের কিছু নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য থাকে—(i) বিষাক্ত পদার্থের প্রতি অতি সংবেদনশীল হতে হবে। (ii) ল্যাবোরেটরীতে সহজে পালন করা যাবে। (iii) পৃথিবীর সর্বত্র পাওয়া যাবে।

সাধারণতঃ পরিবেশ দূষণ মূল্যায়নে বহুবিধ জীবকে ব্যবহার করা হয়। জল দূষণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে যেমন, প্রাথমিক উৎপাদক স্বাদুজলের মাইক্রো এবং ম্যাক্রো অ্যালগি, মূলযুক্ত অথবা স্বাধীন সন্তরনশীল ম্যাক্রোফাইটস অথবা সামুদ্রিক আগাছা, বিভিন্ন প্ল্যাঙ্কটন প্রভৃতি দূষণ মূল্যায়নে ব্যবহার করা হয়। একইভাবে হেটারোট্রফদের মধ্যে বিভিন্ন প্রোটোজোয়া, রটিফেরা, ড্যাফনিয়া অন্যান্য ক্রাফ্‌টেসিয়া পতঙ্গ এবং অন্যান্য সমগোত্রীয় প্রাণীদের পরিবেশীয় চাপ মূল্যায়নে ব্যবহার করা হয়।

জলে কীটনাশক পদার্থের দূষণ মূল্যায়নের জন্য মাছ এবং মাটিতে কীটনাশক পদার্থের দূষণ মূল্যায়নের জন্য কেঁচো, মাইট, কোলেমবোলা (এক ধরনের পোকা) ইত্যাদিকে ব্যবহার করা হয়।

সমুদ্রে তৈল দূষণ মূল্যায়নে বিভিন্ন ধরনের ফানজাই এবং অ্যালগি যেমন— *Penicillium sp., Candida quillermondii, Duniclla teritolocta, Criosphaera carterae* প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়।

জলে ভারী ধাতু মূল্যায়নে বিভিন্ন অ্যালগী যেমন, *Cladophora sp.* এবং *Stigeolonium sp.* ব্যবহার করা হয়।

উন্নত সংবেদনশীল বৃক্ষদের মাটি দূষণের মূল্যায়নের জন্য অনেকদিন থেকেই ব্যবহার করা হচ্ছে। এরা যেমন একদিকে মাটিতে অবস্থিত ভারী ধাতু, যেমন—Al, Ca, Co, Cu, Zn, Cd, Pb, Hg, Mn প্রভৃতির নির্ধারক তেমনি বায়ুর SO_2, O_3, NOx নির্ধারণে ইহারা প্রয়োজনীয়। Anthozanthium (দস্তা সহিষ্ণু) Agrostis (তামা সহিষ্ণু), Impatiens (ক্যাডমিয়াম সহিষ্ণু) প্রভৃতি দূষণের জৈব নির্ধারক তো বটেই এছাড়াও এরা বহু দূষণকারী পদার্থকে নিজ শরীরে গ্রহণ করে।

জৈব মূল্যায়ন এবং বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও তাদের ফলাফল প্রভৃতি SCOPE-1 (1971, SCOPE-3 (1973), IUBS-INSA Symposium (1985)-এ বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করা আছে। (SCOPE ; Scientific Committee on the Problems of the Environment, IUBS—International Union of Biological Science ; INSA—Indian National Science Academy).

11.8 পরিবেশগত অভিঘাত মূল্যায়ন

নতুন কলকারখানা, নদী-বাঁধ, নগরোন্নয়ন, খনি প্রভৃতি উন্নয়নমূলক বড় বড় প্রকল্পের পরিবেশগত ফল অনেক সময়েই ভালো হয় না। এগুলি থেকে সৃষ্টি হয় নতুন ধরনের সমস্যা এবং দীর্ঘকালীন ক্ষতি। সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে পাশ্চাত্যের দেশগুলিকে (ইউরোপীয় ইকনমিক কমিউনিটি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অস্ট্রেলিয়া) বর্তমানে এই ধরনের কোনো বড় প্রকল্পে হাত দেওয়ার আগে পরিবেশগত অভিঘাত সমীক্ষা আইন করে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

পরিবেশগত অভিঘাত মূল্যায়ন প্রথম শুরু হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়, ফলে এ সময়ে বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ, কীটনাশক, অজৈব সার বিভিন্ন কলকারখানা ও খনি প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছিল। পারমানবিক শক্তি কারখানাগুলোও স্থাপিত হচ্ছিল। এসব কারখানার বর্জ্য পদার্থগুলি যেমন বিষাক্ত তেমনি পরিবেশে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব রাখতে সক্ষম। বড় বড় প্রকল্পগুলি স্বাভাবিক পরিবেশকে যেমন প্রভাবিত করে তেমনটি আগে কখনও দেখা যায়নি। এরই প্রতিক্রিয়ার ধীরে ধীরে 1960 দশকে সাধারণের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা গড়ে উঠলো এবং 1969 সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জাতীয় পরিবেশ নীতি আইন (National Environment Policy Act) পাশ করে প্রতিটি বড় প্রকল্পের কাজ শুরুর আগে 'পরিবেশ বিবৃতি' (Environmental Statement) দেওয়া এবং 'পরিবেশগত অভিঘাত মূল্যায়ন' (Enviromental Impact Assessment বা EIA) করা বাধ্যতামূলক করা হল।

11.8.1 পরিবেশগত অভিঘাত মূল্যায়নের সংজ্ঞা ও ধাপগুলির বৈশিষ্ট্য

পরিবেশগত অভিঘাত মূল্যায়নের সংজ্ঞা ঃ

ওয়ালথার্ন (1992) পরিবেশগত অভিঘাত মূল্যায়ন বা EIA-র সংজ্ঞা দেন। তাঁর মতে, নীতি নির্ধারকদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে জৈব ও ভৌত পরিবেশ এবং মানুষের স্বাস্থ্য ও মঙ্গলের যে সব ফলাফল ঘটতে পারে সেই সকল তথ্য প্রকল্প অনুমোদনের প্রথম পর্যায় থেকে অন্যদের জানানোকে পরিবেশগত অভিঘাত মূল্যায়ন বলে।

পরিবেশগত অভিঘাত মূল্যায়নের ধাপগুলির মূল বৈশিষ্ট্য ঃ

- *প্রকল্প চিহ্নিত করা ঃ* এর মধ্যে ঠিক কি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে এবং কি ভাবে তা হবে, এর অবস্থান ও প্রক্রিয়ার কোন বিকল্প আছে কিনা এবং প্রকল্পের আয়তন ও স্কেলের বিবরণ থাকে।

- *প্রকল্পের বাছাই ঃ* প্রকল্পটির EIA দরকার আছে কিনা এবং এর আয়তন বা প্রক্রিয়াকার্য পরিবর্তন ঘটিয়ে EIA প্রক্রিয়াকে বাদ দেওয়া যায় কিনা এগুলির বিচার।
- *পরিধি নির্দেশ ঃ* EIA-র পরিধি কমিয়ে সবচেয়ে সম্ভাব্য লক্ষণীয় অভিঘাতগুলির উপরে দৃষ্টিপাত এবং পরিবেশ বলতে এক্ষেত্রে ঠিক কি বোঝায় তার ব্যাখ্যা।
- *প্রকল্প বিবরণ ঃ* কর্ম প্রকল্পটির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণের মধ্যে তার সব কয়টি দিক তুলে ধরা, যাতে সম্ভাব্য সকল অভিঘাত চিহ্নিত করা যায়।
- *প্রকল্প পূর্ব পরিবেশের বিবরণ ঃ* এতে যে পরিবেশগত অবস্থায় প্রকল্পটির সুচনা করা হবে তার পূর্ণাঙ্গ অনুসন্ধান এবং অডিট।
- *প্রধান অভিঘাতগুলি চিহ্নিতকরণ ঃ* এই পর্যায়ে আগের ধাপগুলির সব সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়াগুলির মধ্যে কোন একটি ভালো বা খারাপ অভিঘাত সৃষ্টি করতে পারে, সেগুলিকে চিহ্নিত করা হয়।
- *অভিঘাতের পূর্বাভাস ঃ* অভিঘাতের তাৎপর্য কি এবং কতখানি তার মূল্যায়ন।
- *সমাধানের ব্যবস্থা ঃ* খারাপ অভিঘাতগুলির তীব্রতা হ্রাসের জন্য সমাধানের পথ নির্দেশ করা।
- *জনসাধারণের অংশগ্রহন এবং আলাপ-আলোচনা ঃ* প্রকল্প গৃহীত হবার সময় থেকে শুরু হবে সাধারণ মানুষের সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা।
- *পরিবেশগত বিবৃতি রচনা ঃ* প্রথমে পরিবেশগত বিবৃতির খসড়া রচনা হবে এবং সাধারণ মানুষের পরীক্ষা ও মন্তব্যের জন্য প্রকাশ করা হবে।
- *পুনর্বিচার বা রিভিউ ঃ* এই পর্যায়ে প্রকল্পের উদ্যোক্তা পরিবেশগত বিবৃতি পরীক্ষা করে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্বাচন করেন এবং প্রয়োজন হলে তাতে বদলও ঘটান।
- *সিদ্ধান্ত গ্রহণ ঃ* এই পর্যায়ে বৃহত্তর বিষয়গুলি, যেমন—জাতীয় নিরাপত্তা বা অর্থনৈতিক নীতি প্রভৃতি বিষয় অনুসারে প্রকল্পটির বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
- *সদাজাগ্রত দৃষ্টি রাখা ঃ* পরিবেশের অভিঘাতগুলির উপর সদা জাগ্রত দৃষ্টি রাখা হয় যাতে সেগুলি মারাত্মক ক্ষতি করতে না পারে।
- *নিরীক্ষা ঃ* আগে থেকে অনুমিত এবং প্রকৃত ঘটা অভিঘাতের মধ্যে তুলনার মাধ্যমে EIA প্রক্রিয়ার গুণমান বিচার।

11.8.2 পরিবেশগত অভিঘাত মূল্যায়নের পদ্ধতি

পরিবেশগত অভিঘাত মূল্যায়নের কতকগুলি পদ্ধতিগত দিক আছে। সেগুলি হল—

(i) প্রথম পর্যায়ে উদ্যোক্তা/শিল্পপতি, সরকারি ও বেসরকারি নিয়ন্ত্রণমূলক সংস্থাগুলির এবং পরামর্শদাতাদের সাহায্য নেবেন।

(ii) বড় প্রকল্পগুলির জন্য সমীক্ষা শুরু হবে।

(iii) সমীক্ষাটি প্রকাশ করা হবে সকলের সামনে এবং সাধারণ মানুষ ও সরকারি সংস্থাগুলির সঙ্গে আলোচনার ভিত্তি হিসাবে ব্যবহৃত হবে।

(iv) পরামর্শ ও আলোচনার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য নির্দিষ্ট সরকারি সংস্থার সামনে পেশ করা হবে।

(v) পরিবেশগত ক্ষতি কমানো এবং ক্ষতিপূরণের দিকগুলি দেখা হবে।

(vi) প্রকল্প চলাকালীন এবং শেষে তার পরিবেশগত ফলাফল নজরে রাখা হবে।

11.9 সারাংশ

এই এককটি আপনারা পড়েছেন—

- যে সকল রাসায়নিক পদার্থ পরিবেশের জৈব উপাদানের উপর ব্যাপক মন্দ প্রভাব সৃষ্টি করে তাকে বিষাক্ত পদার্থ বলে এবং যে বিদ্যায় বিষাক্ত পদার্থের বিষক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করা হয় তাকে বিষবিদ্যা বলে।
- নাইট্রোজেন ও ফসফরাস যুক্ত অজৈব সার অধিক ব্যবহারের ফলে পুকুর বা নদীতে ইউট্রিফিকেশন হয়, ফলে প্ল্যাঙ্কটনিক ব্লুম হয় এবং জলে দ্রবীভূত O_2-র পরিমাণ কমে যায় ও 'BOD'-র মাত্রা বেড়ে যায়।
- কিছু কিছু কীটনাশক আছে যেমন—DDT পরিবেশে এর স্থায়িত্ব অনেক বেশি এবং এরা বায়োম্যাগনিফিকেশন বা জীব বিবর্ধক হিসাবে কাজ করে।
- বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থের খুব অল্প সময়ে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর ওপর ক্রিয়ার ফলে ক্ষণস্থায়ী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়—যেমন ভূপালে MIC গ্যাসের সংস্পর্শে আসার সঙ্গে সঙ্গে কিছু মানুষ মারা যায়, ইহা ক্ষণস্থায়ী প্রতিক্রিয়ার ফল।
- আবার কোন কোন ক্ষেত্রে বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থের প্রতিক্রিয়া সঙ্গে সঙ্গে না হয়ে অনেক দিন বাদে হয়—ইহা বিষাক্ত পদার্থের দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব। যেমন—MIC-এর প্রভাবে মানুষের মধ্যে ধীরে ধীরে পঙ্গুত্ব বৃদ্ধি পাওয়া।
- বিষাক্ত পদার্থের যে ঘনত্বে অর্ধেক পরীক্ষালব্ধ প্রাণী মারা যায় তাকে LC 50 এবং যে মাত্রায় অর্ধেক প্রাণী মারা যায় তাকে LD 50 বলে।
- জীবকূল দ্বারা পরিবেশের দূষণের মূল্যায়নকে জৈব মূল্যায়ন বলে এবং এই সকল জীবকে দূষণকারী পদার্থের মাত্রা নির্ধারণকারী সূচক বলে।
- জৈব নির্দেশক প্রাণীদের কিছু নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য থাকে, যথা—(i) বিষাক্ত পদার্থের প্রতি অতি সংবেদনশীলতা, (ii) পরীক্ষাগারে সহজে পালন করা যাবে (iii) পৃথিবীর সবজায়গায় পাওয়া যাবে।
- জৈব নির্দেশক হিসাবে বিভিন্ন অ্যালগি, ফানজাই, ছোট গাছ, বড় গাছ, বিভিন্ন প্রোটোজোয়া, রটিফেরা, ড্যাফনিয়া অন্যান্য ক্রাসটাসিয়া, পতঙ্গ, মাইট, কেঁচো ইত্যাদিকে ব্যবহার করা হয়।
- পরিবেশগত অভিঘাত মূল্যায়ন হচ্ছে নীতি নির্ধারকদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে জৈব ও ভৌত পরিবেশ এবং মানুষের স্বাস্থ্য ও মঙ্গলের যে সব ফলাফল ঘটতে পারে, যেসব তথ্য প্রকল্প অনুমোদনের প্রথম পর্যায় থেকে অন্যদের জানানো।

11.10 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও—

(a) বিষাক্ত পদার্থ কি? একটি উদাহরণ দিন।

(b) পুকুরের বাস্তুতন্ত্রে অজৈব সারের প্রভাব কি?

(c) BOD-র পুরো কথা কি?

(d) প্ল্যাঙ্কটনিক ব্লুম কি?

(e) বিষাক্ত পদার্থের ক্ষণস্থায়ী প্রভাব ও দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব কি?

(f) LC50 ও LD50 বলতে কি বোঝো?

(g) প্রতিক্রিয়া লেখ বা ডোজ রেসপনস্ কার্ড কি?

(h) জৈব মূল্যায়ন কি?

(i) জৈব নির্দেশক কি? জৈব মূল্যায়ন কর্মসূচীতে জীবকূলকে কিভাবে ব্যবহার করা হয়?

(j) পরিবেশগত অভিঘাত মূল্যায়ন কি? ইহার বিভিন্ন ধাপগুলির মূল্য বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যাখ্যা করুন।

(k) পরিবেশগত অভিঘাত মূল্যায়নের পদ্ধতিটি অতি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন।

11.11 উত্তরাবলী

(a) 11.2 অংশ উত্তরটি দেখুন।

(b) উত্তরটি 11.3 অংশে দেখুন।

(c) Biological Oxygen Demand।

(d) 11.3 অংশ উত্তর দেখুন।

(e) 11.4 ও 11.5 অংশে উত্তরটি দেখুন।

(f) উত্তরটি 11.6 অংশে দেখুন।

(g) 11.6 অংশে দেখুন।

(h) উত্তরটি 11.7 অংশে দেখুন।

(i) 11.7.1 ও 11.7.2 অংশে উত্তরটি দেখুন।

(j) 11.8.1 অংশে উত্তরটি দেখুন।

(k) উত্তরটি 11.8.2 অংশে দেখুন।

একক 12 ❑ অ্যাপ্পিকো, চিপকো ও অন্যান্য আন্দোলন

গঠন

12.1 প্রস্তাবনা

উদ্দেশ্য

12.2 চিপকো আন্দোলন

12.2.1 প্রথম আন্দোলন

12.2.2 আন্দোলনের রূপরেখা

12.2.3 আন্দোলনের আন্তর্জাতিক খ্যাতিলাভ

12.2.4 চিপকো আন্দোলনের বিভিন্ন উদ্দেশ্য

12.2.5 চিপকো থেকে অ্যাপ্পিকো

12.3 অ্যাপ্পিকো আন্দোলন

12.3.1 আন্দোলনের প্রসার

12.3.2 সারাংশ

12.3.3 প্রশ্নাবলী

12.3.4 উত্তরমালা

12.4 ভূপাল গ্যাস দূর্ঘটনা

12.4.1 ভয়ঙ্কর দিন

12.4.2 প্রতিরোধের ব্যর্থ চেষ্টা

12.4.3 ভূপালবাসীর ভয়ঙ্কর দুর্ভোগ

12.4.4 ভূপালবাসীর বাঁচার চেষ্টা

12.4.5 ক্ষতির পরিমাণ

12.4.6 প্রকৃত ক্ষতির হিসাব

12.4.7 ক্ষতিপূরণ

12.4.8 ঘটনা থেকে শিক্ষা

12.5 সারাংশ

12.5.1 প্রশ্নাবলী

12.5.2 উত্তরমালা

12.6 নদীবাঁধ প্রকল্পের বিরোধী আন্দোলন

12.6.1 নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন

12.6.2 মানব কল্যাণ ও অকল্যাণ
12.6.3 আন্দোলনের বর্তমান অবস্থা
12.6.4 সুপ্রিম কোর্টের মর্মান্তিক রায়
12.6.5 ক্ষতির পরিমাণ
12.6.6 তেহরী বাঁধ আন্দোলন
12.6.7 প্রকল্পটির উদ্দেশ্য
12.6.8 বিরোধিতার কারণ
12.6.9 প্রতিরোধ
12.7 সাইলেন্ট ভ্যালী আন্দোলন
12.8 সারাংশ
12.9 সর্বশেষ প্রশ্নমালা
12.10 উত্তরমালা

12.1 প্রস্তাবনা ও উদ্দেশ্য

প্রস্তাবনা

সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে মানুষের শিল্পায়নের ঝোঁক ও চাহিদা বেড়েই চলেছে। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ক্রমবর্ধনশীল জনসংখ্যার চাপ ও চাহিদার বৃদ্ধি। ফলে মানুষকে নতুন নতুন বসতি স্থাপন, শহর ও নগরের আয়তন বৃদ্ধি, শষ্য উৎপাদনের জমি বৃদ্ধি, নতুন নতুন কলকারখানা স্থাপন ইত্যাদির জন্য প্রাকৃতিক পরিবেশের বিশেষ করে অরণ্য ও বনজঙ্গল ইত্যাদির দিকে হাত বাড়াতে হয়েছে। মানুষের এসব প্রয়োজনেই বন জঙ্গল আর অরণ্যের গাছপালা কেটে ধ্বংস করা হচ্ছে। সেখানে স্থাপিত হচ্ছে নতুন বসতি, নতুন চাষের জমি বা কলকারখানা। এছাড়াও বহুমূল্য কাঠের নিয়মিত যোগান দেওয়ার জন্যও কেটে ফেলা হচ্ছে বড় বড় গাছ। মানুষের লোভ তাৎক্ষণিক লাভের আশায় প্রয়োজনেরও বেশি সংখ্যক গাছ কেটে ফেলেছে। অরণ্য তার স্বকীয়তা ও বৈচিত্র্য হারিয়ে ফেলছে। বনচারী পশুপাখীরও স্বাভাবিক বাসস্থানের অভাব ঘটছে ভীষণ ভাবেই। তাই মানুষের শুভবুদ্ধি আজ জাগ্রত হয়েছে। ভবিষ্যতের পরিবেশের চরম বিপর্যয় এড়াতে হলে এসব গাছ কাটা সর্বাগ্রে বন্ধ করা দরকার। এজন্য আমাদের ভারতবর্ষেই ঘটে গেছে পরিবেশ বিরোধী যে কোন কাজ বন্ধ করার জন্য বিশাল আকারের অনেক আন্দোলন। অ্যাপ্পিকো ও চিপকো আন্দোলন পেয়েছে আন্তর্জাতিক মর্যাদা। এখানে সেই আন্দোলনগুলির রূপরেখা বর্ণনা করার চেষ্টা করা হয়েছে।

শিল্পায়নের সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছে শিল্পজাত দুর্ঘটনার ঘটনা। রাসায়নিক কীটনাশক তৈরির কারখানা থেকে বিষাক্ত গ্যাস বেরিয়ে এসে মধ্যপ্রদেশের ভূপালের লক্ষ লক্ষ নরনারীর মৃত্যু ও অন্যান্য দুর্দশার সৃষ্টি করে। মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যেই প্রায় দশ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়। এরকম ভয়ংকরতম দুর্ঘটনা ভারতের তো বটেই পৃথিবীতেও বেশ বিরল।

এছাড়াও প্রগতিশীলও উন্নয়নকামী দেশ হিসেবে ভারত তার বিভিন্ন প্রধান নদীগুলিকে বাঁধ দেবার প্রকল্প বাস্তবায়িত করেছে। আরও বেশ কয়েকটি প্রকল্প রূপায়ণের অপেক্ষায়। কিন্তু মানুষের পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়ায় এরকম বেশ কয়েকটি বড় নদী বাঁধ প্রকল্প আজ জনগণের ক্ষোভের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য কোন কিছুর বিনিময়েই যে বিঘ্নিত হতে দেওয়া চলেনা তা মানুষ আজ বুঝেছে। তাই এসব নদী বাঁধের বিরুদ্ধে সংগঠিত হয়েছে নানারকম শক্তিশালী আন্দোলন।

উদ্দেশ্য ঃ

এই অংশটি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন—

পরিবেশ আন্দোলনের প্রয়োজন কেন হয়েছিল?

চিপকো ও অ্যাপ্পিকো আন্দোলন কি?

নর্মদা বাঁচাও ও তেহরী বাঁধ আন্দোলনের রূপরেখা কি?

সাইলেন্ট ভ্যালি আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা কেন হয়েছিল?

পরিবেশ আন্দোলনের প্রসারতার প্রয়োজনীয়তা কি?

12.2 চিপকো আন্দোলন

ভারতবর্ষের গাছের সঙ্গে মানুষের এক অবিচ্ছেদ্য প্রীতি ও সখ্যতার সম্পর্ক বহুদিনের। সুপ্রাচীন মনু সংহিতায়, পুরাণে, রামায়ণ ও মহাভারতে এর উল্লেখ আছে। ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতা সবসময়ই গাছের প্রতি সহানুভূতিশীল।

12.2.1 প্রথম আন্দোলন

গাছ কাটার বিরুদ্ধে 1973 সালে উত্তরপ্রদেশের তেহরী গাঢ়ওয়াল জেলার গোপেশ্বর নামক একটি পাহাড়ী গ্রামে চিপ্‌কো নামের অহিংস আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন রাজস্থানের যোধপুর থেকে 25 কিলোমিটার দূরে খেজারিলি গ্রামের বিষ্ণই সম্প্রদায়ের এক অসম সাহসী মহিলা—অমৃতাদেবী। অমৃতাদেবীর নেতৃত্বে প্রায় 360 জন বিষ্ণই মহিলা এবং অমৃতাদেবীর স্বামী রামোজী ও তাদের তিন মেয়ে আসিবাঈ, রতনিবাঈ ও ভাগবতী তাদের সকলের প্রিয় গ্রামটিকে বাঁচাতে বড় বড় গাছগুলিকে জড়িয়ে ধরে রাখে। ঠিকাদারদের নির্দেশে তাদের লোকজন তা সত্ত্বেও ঐ জড়িয়ে থাকা মানুষজন সমেত গাছগুলিকে কুঠারাঘাতে কেটে ফেলে। রাজস্থানের খেজরিলি গ্রামের সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু হয় 1927 সালে। এই গান্ধীবাদি সত্যাগ্রহ আন্দোলন প্রথমে শুরু হয় হিমালয়ের কোলে অবস্থিত ছোট্ট একটি গ্রাম থেকে। তারপর 1962 সালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে মহাত্মা গান্ধীর শিষ্যা সরলা বেনের নেতৃত্বে তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। এই আন্দোলনেরই প্রভাবে গঠিত হয় উত্তরখন্ড সর্বোদয় মন্ডল, যা পরিবেশের ক্ষতি রোধ করার উদ্দেশ্যেই গঠিত হয়েছিলো।

12.2.2 আন্দোলনের রূপরেখা

1972 সালে ইউনাইটেড নেশনস্ কনফারেন্স অন হিউম্যান এনভায়র্নমেন্ট বা ঐতিহাসিক স্টকহোম সম্মেলনের কিছুদিন পরেই উত্তর হিমালয়ের গাড়োয়াল অঞ্চলের দুটি জায়গায় প্রায় একসঙ্গেই গণ আন্দোলন দানা বাঁধে। জায়গা দুটি হল উত্তর কাশী ও গোপেশ্বর। এই দুটি এলাকায় নিরক্ষর আদিবাসী মহিলারা খেজরিলি গ্রামের ঘটনায় পুনরাবৃত্তি ঘটায়। তারা একই ভঙ্গিমায় গাছগুলিকে জড়িয়ে ধরে ঠিকাদারদের নির্মম কুঠারের আঘাত থেকে রক্ষা করত। হিমালয় অরণ্যের কাঠ ব্যবসায়ী আর ঠিকাদারদের নির্বিচার গাছ কাটার বিরুদ্ধেই গড়ে ওঠে এই চিপকো আন্দোলন। 'চিপকো' কথাটির অর্থ হল "আলিঙ্গন" বা "জড়িয়ে ধরা"। এই আন্দোলন তাই চিপকো আন্দোলন নামেই বিশেষ খ্যাতি লাভ করে এবং ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। 1978 সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ঠিকাদারের লোকেরা তেহরী গাড়োয়াল জেলার আদিবাসী গ্রামে গাছ কাটতে এলে ঐ গ্রামের সমস্ত মহিলারা গাছগুলিকে একইভাবে জড়িয়ে রেখে পুলিশের গুলি ও গ্রেপ্তারের মুখোমুখি হন। এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন সুন্দরলাল বহুগুণা। বহুগুণার সুযোগ্য নেতৃত্বে ধীরে ধীরে এই আন্দোলন দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়তে থাকে ও দীর্ঘায়িত হতে থাকে। আদিবাসী ছাড়াও বুধেকার গ্রামের

মহিলারাও এই আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। সুন্দরলাল বহুগুণা UNEP (ইউনাইটেড নেশনস্ ইকোলজিক্যাল পোগ্রাম) এর 1982 সালের লন্ডন সম্মেলনে তাদের বক্তব্য সারা বিশ্বকে জানান। তিনি মৃত্তিকা ও জল সংরক্ষণের জন্য হিমালয় অঞ্চলে গাছ কাটা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করার জন্য শক্তিশালী আন্দোলনের ডাক দেন।

12.2.3 আন্দোলনের আন্তর্জাতিক খ্যাতিলাভ

1982 সালের লন্ডন সম্মেলনে প্রচারিত সুন্দরলাল বহুগুণার বক্তব্য জানার পর বিশ্ববাসী এই আন্দোলনের গুরুত্ব উপলব্ধি করে। পরিবেশের জল এবং মৃত্তিকা দূষণ রোধে ভারতের এই গণআন্দোলন আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পায়।

চিপকো আন্দোলনকে সমর্থন জানায় বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিগণ। বিশ্বের নানা দেশ যেমন—ফ্রান্স, জার্মানী, সুইডেন, সুইজারল্যান্ড ইত্যাদি দেশ চিপকো আন্দালননের প্রতি আন্তরিক সমর্থন জানায়। এমনকি স্কটহোমে বিশ্বপরিবেশ দিবসে অর্থাৎ 5ই জুন অনুষ্ঠিত এক প্রদর্শনীতে চিপকো আন্দোলনের সম্পর্কে এই কথাগুলো তুলে ধরা হয়েছে— "একটি শক্তিশালী পরিবেশ আন্দোলন যা গড়ে উঠেছে হিমালয়ের পার্বত্য ঢাল এলাকায়। গ্রামবাসীরা বিচিত্র এক অহিংস পদ্ধতিতে সফলভাবে বনজ শিল্পের দ্বারা পরিবেশের ক্ষতিসাধন প্রতিরোধ করতে পেরেছেন। যখনই কাঠুরেরা গাছ কাটতে এসেছেন তখনই চক্রাকারে গাছকে জড়িয়ে ধরে বা আলিঙ্গন করে রক্ষা করেছেন গাছগুলিকে। এই জড়িয়ে ধরা বা আলিঙ্গন করার পদ্ধতির জন্যই আন্দোলনটির নাম হয়েছে "চিপকো আন্দোলন" গাছকে আলিঙ্গনের আন্দোলন।

12.2.4 চিপকো আন্দোলনের বিভিন্ন উদ্দেশ্য

চিপ্‌কো আন্দোলনের নানা উদ্দেশ্যের কথা বলতে গেলে এদের পাঁচটি "F" এর স্লোগানের কথাই উল্লেখ করতে হয়। এই পাঁচটি এফ্ (F) হলো যথাক্রমে, Food, Fodder, Fuel, Fibre এবং Fertilizer। অর্থাৎ খাদ্য, পশুখাদ্য, জ্বালানী, তন্তু এবং সার। এই পাঁচটি জিনিসই প্রাথমিকভাবে আমাদের প্রয়োজনীয় উপাদানের যোগান দেয়। গোটা জীবজগতকে বাঁচিয়ে রাখে। সর্বোপরি পরিবেশের যথার্থ সুরক্ষা প্রদান করে এরা স্থায়ী সমৃদ্ধির ভরসা যোগায়।

12.2.5 চিপ্‌কো থেকে অ্যাপ্পিকো

সুন্দরলাল বহুগুণার যোগ্য নেতৃত্বে শ্রীনগর থেকে শিলিগুড়ি পর্য্যন্ত 300 কিলোমিটার পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের গ্রামবাসী এবং আদিবাসীরা এই আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে সামিল হন। গাছকাটার বিরুদ্ধে এই আন্দোলন আদিবাসী অধ্যুষিত সাঁওতাল পরগণা, ছত্তিশগড়, থানে, আরাবল্লী ইত্যাদি এলাকায় বিস্তার লাভ করে এবং ক্রমশঃ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। কর্ণাটকে এই আন্দোলন এক নতুন মাত্রা পেয়ে অ্যাপ্পিকো আন্দোলন নামে পরিচিতি লাভ করে।

12.3 অ্যাপ্পিকো আন্দোলন

1983 সালের 8ই সেপ্টেম্বর কর্ণাটকের কেলাসী (Kelase) অরণ্যের বড় বড় গাছকে ঠিকাদারদের মৃত্যু পরোয়ানা থেকে বাঁচাতে 8 কিলোমিটার দীর্ঘ পদযাত্রায় সামিল হয়ে প্রায় 160 জন নারী পুরুষ অরণ্যের গাছগুলিকে চিপকো আন্দোলনের পদ্ধতিতেই অহিংস উপায়ে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরে। ঠিকাদারের কাঠুরেরা গাছগুলিতে কুঠারাঘাত করতে আসেন। শেষ পর্য্যন্ত রাজ্যের বনদপ্তরের নির্দেশে ঠিকাদারেরা গাছকাটা থেকে বিরত হয়। জয় হয় গ্রামবাসীদের এবং একই সঙ্গে অ্যাপ্পিকো আন্দোলনের।

12.3.1 আন্দোলনের প্রসার

অ্যাপ্পিকো আন্দোলনের এই সাফল্যের পর অঞ্চলের ঠিকাদারেরা ভীত হয়ে পড়েন। ফলে আন্দোলন আরও দুর্বার গতিতে ছড়িয়ে পড়ে চর্তুদিকে। অনেক মানুষের সমর্থনে আন্দোলনে আসে জোয়ার। সাধারণ জনসাধারণ থেকে শুরু করে বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন এবং অরাজনৈতিক বেসরকারী সংগঠন এবং প্রায় প্রতিটি পরিবেশ প্রেমী মানুষ ও সংগঠন এগিয়ে আসেন আন্দোলনটিকে আরও শক্তিশালী করে তোলার জন্য।

দিল্লীর স্কুল অফ সোস্যাল ওয়াকার্স এর ছাত্র শ্রী পান্ডুরাঙ হেগড়ে 1979 সালে তেহরী গাড়োয়াল অঞ্চলের নবজীবন আশ্রমে চিপ্‌কো আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র স্থাপন করেন। তারপর গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে এই আন্দোলন ছড়িয়ে দেবার জন্য কাশ্মীর থেকে কোহিমা বা শ্রীনগর থেকে শিলিগুড়ি পর্য্যন্ত দীর্ঘ পদযাত্রার আয়োজন করা হয়। লন্ডন সম্মেলনের পর আন্তর্জাতিক খ্যাতি পাওয়ায় দেশের আন্দোলনকারীদের সঙ্গে বিদেশের পরিবেশপ্রেমী মানুষও একাত্ম হয়ে চিপকো এবং অ্যাপিক্কো আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে যোগদান করেন। ধীরে ধীরে চিপকো এবং অ্যাপ্পিকো আন্দোলন দেশে ও বিদেশে বিশেষ খ্যাতি লাভ করে।

12.3.2 সারাংশ

ভারতবর্ষে সেই সুপ্রাচীনকাল থেকেই গাছের সঙ্গে এক নিবিড় আত্মীয়তা ও ভালোবাসার সম্পর্ক চলে আসছে। কাঠের প্রয়োজনে ঠিকাদাররা কাঠুরে নিয়োগ করে বড় বড় গাছ কেটে ফেলছে সাময়িক লাভের জন্য। আমাদের অরণ্য এবং পরিবেশ এভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। বাস্তুতন্ত্রেরও ঘটছে মহা সর্বনাশ। তাই এভাবে নির্বিচারে গাছকাটা প্রতিরোধ করতে গড়ে উঠেছে নানা পরিবেশ আন্দোলন। গাছকে ঠিকাদারদের হাত থেকে রক্ষা করতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে গ্রামবাসীরা গাছকে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে বা নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন করে কাঠুরের আঘাত থেকে রক্ষা করার এক অভিনব আন্দোলনে সামিল হন। এই আন্দোলনের সুযোগ্য নেতৃত্ব দেন সুন্দরলাল বহুগুণা। এই বিশেষ আন্দোলনে গাছকে জড়িয়ে ধরে রক্ষা করা হয় বলে একে 'চিপ্‌কো আন্দোলন' বলা হয়। 1982 সালে লন্ডনের UNEP-র সম্মেলনে এই চিপ্‌কো আন্দোলন আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পায়। বিশ্বের নানা দেশের মানুষ এই আন্দোলনের সমর্থনে এগিয়ে আসেন।

পরবর্তীকালে কর্ণাটকের অরণ্যে একই পদ্ধতিতে গ্রামবাসীরা অরণ্যের বৃক্ষছেদন প্রতিরোধ করে ঠিকাদারদের নিরস্ত করেন। এই আন্দোলন অ্যাপ্পিকো আন্দোলন নামে খ্যাতি লাভ করে। এই আন্দোলনের ফলে শেষ পর্যন্ত বন বিভাগের নির্দেশে ঠিকাদার বাহিনীকে পিছু হটতে হয় এবং অ্যাপ্পিকো আন্দোলন জয়যুক্ত হয়।

12.3.3 প্রশ্নাবলী

(1) গাছ কাটার বিরুদ্ধে কবে এবং কোথায় ভারতে প্রথম আন্দোলন হয়?

(2) চিপ্‌কো কথাটির অর্থ কি? চিপ্‌কো আন্দোলনের সূত্রপাত কোথায় হয়?

(3) চিপ্‌কো আন্দোলনের নেতৃত্ব কে দিয়েছিলেন?

(4) কবে কোথায় চিপ্‌কো আন্দোলন আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পায়?

(5) চিপ্‌কো আন্দোলনের পাঁচটি F এর শ্লোগানগুলি কি কি?

(6) অ্যাপ্পিকো আন্দোলন কোথায় কবে শুরু হয়?

(7) চিপ্‌কো এবং অ্যাপ্পিকো আন্দোলনের সমর্থনে দুটি পদযাত্রার উল্লেখ কর।

(8) 1979 সালে কে কোথায় চিপ্‌কো আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র স্থাপন করেন।

(9) UNEP কথাটির পুরো অর্থ কি?

(10) পরিবেশ নিয়ে ইউনাইটেড নেশনস্ এর সম্মেলন 1972 সালে কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?

12.3.4 উত্তরমালা

(1) 12.2.1 অংশ দেখুন।

(2) আলিঙ্গন বা জড়িয়ে ধরা। 5.2.2 অংশ দেখুন।

(3) সুন্দরলাল বহুগুণা।

(4) 12.2.3 অংশ দেখুন।

(5) 12.2.4 অংশ দেখুন।

(6) 12.3 অংশ দেখুন।

(7) কাশ্মীর থেকে কোহিমা। শ্রীনগর থেকে শিলিগুড়ি।

(8) 12.3.1 অংশ দেখুন।

(9) ইউনাইটেড নেশনস্ ফর ইকোলজিক্যাল পোগ্রাম।

(10) স্টকহোমে।

12.4 ভূপাল গ্যাস দুর্ঘটনা

বিশ্বের যেখানে যত শিল্প কারখানা দুর্ঘটনা ঘটেছে আমাদের দেশের ভূপাল গ্যাস দুর্ঘটনা তাদের মধ্যে ভয়ঙ্করতম। ভারতের মধ্যপ্রদেশের ভূপালে অবস্থিত ইউনিয়ন কার্বাইড কোম্পানির কীটনাশক তৈরির কারখানায় এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। আজও গোটা ভারতবর্ষে তথা ভূপালের নাগরিকদের মন থেকে সেই ভয়ংকর এবং বিভীষিকাময় দুর্ঘটনার স্মৃতি মুছে যায়নি। শিল্প এবং কারখানার নিরাপত্তাজনিত ত্রুটির কারণে ঘটেছিলো এই মারাত্মক ঘটনা।

12.4.1 ভয়ংকর দিন

1984 সালে 3রা ডিসেম্বর রাত সাড়ে এগারোটায় ভূপালের ইউনিয়ন কার্বাইড কারখানায় রাতের শিফ্‌টে কর্মরত কিছু কর্মচারীই প্রথম তাদের চোখমুখ জ্বালা করায় বিপদের গন্ধ পান। সকলের সন্দেহ হয় MIC বা মিথাইল আইসো সায়ানেট গ্যাস, যা কীটনাশক তৈরিতে কাজে লাগে তা সঞ্চয়কারী ট্যাঙ্ক থেকে কোন কারণে লিক্ করছে। তাই কয়েকজন কর্মী এই মিক্ (MIC) গ্যাস সঞ্চয়কারী ট্যাঙ্কের দিকে যান। তারা লক্ষ্য করেন ট্যাঙ্কের প্রায় 50 ফুট দূরে হলদেটে সাদা রঙের কিছু তরল পদার্থ চুঁইয়ে পড়ছে। একজন কর্মী তখন ট্যাঙ্কের আভ্যন্তরীন তাপ এবং চাপ নির্দেশকারী ডায়ালগুলির দিকে তাকিয়ে দেখেন যে ট্যাঙ্কের আভ্যন্তরীণ তাপ 25°C হয়ে গেছে, চাপও বেড়ে গিয়ে 40 পি.এস. আই হয়েছে। ট্যাঙ্কের ওপর চাপা দেওয়া ছয় ইঞ্চি পুরু এবং ষাট ফুট লম্বা কংক্রিটের স্ল্যাব থরথর করে কাঁপছে। স্ল্যাবের নীচে রাখা MIC তরল তখন ফুটতে শুরু করেছে। প্রচন্ড উত্তপ্ত হয়ে পড়েছে ট্যাঙ্কটি। ট্যাঙ্কের ভেতরে থেকে সশব্দ ধোঁয়ার মতো গ্যাস বাষ্প নির্গত হচ্ছে। ট্যাঙ্কের আভ্যন্তরীণ চাপ তখন আরও বেড়ে 55 পি.এস. আইতে দাঁড়িয়েছে। রিলিজ ভাল্ব খুলে গিয়ে তখন প্রায় 25 টন গ্যাস বাষ্প বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে। ভয়ংকর এক দুর্ঘটনা ঘটতে চলেছে।

12.4.2 প্রতিরোধের ব্যর্থ চেষ্টা

এরপর কর্মচারীরা প্রায় 120 ফুট উঁচু থেকে জলের তীব্র ধারা বা water চালু করে গ্যাসটির নির্গমন রোধের এবং উত্তাপ হ্রাসের চেষ্টা করেন। কিন্তু water jet এ কাজে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। বরং জলের বাষ্পের সঙ্গে বিক্রিয়া জনিত কারণে MIC গ্যাসটি আরও মারাত্মক চেহারা নেয়। প্লান্টের কষ্টিক সোডা সম্বলিত গ্যাস স্ক্রাবার (Gas Scrabber) দিয়ে অতঃপর MIC গ্যাস প্রশমিত করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু নির্গত গ্যাসের চাপ ও আয়তন বেশি থাকায় গ্যাস স্ক্রাবার ব্যবস্থাটিও কোন কাজে আসেনি। নানা চেষ্টা করেও যখন গ্যাস নির্গমন রোধ করা সম্ভব হলো না তখনই অর্থাৎ গ্যাস লিক শুরু হবার প্রায় 1 ঘন্টা পর কারখানার বিপদ সংকেত জ্ঞাপক সাইরেন বাজানো হয়। প্রায় দু ঘন্টা ধরে Safety Valve খোলা থাকায় প্রায় 50 হাজার পাউন্ড আয়তনের MIC গ্যাস বাষ্প, $COCl_2$ (কার্বনিল ক্লোরাইড) এবং HCN (হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড বাষ্প) খোলা হাওয়ায় বেরিয়ে আসে। এরপর গ্যাসের চাপ কমে যাওয়ায় Safety valve আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যায়। গ্যাস নির্গমনও বন্ধ হয়।

12.4.3 ভূপালবাসীর ভয়ংকর দুর্ভোগ

রাত তিনটে নাগাদ বিপদের খবর পেয়ে কারখানার ওয়ার্কস ম্যানেজার কারখানার পৌঁছানোর আগেই কারখানার কাছাকাছি অঞ্চলে বসবাসকারী অনেক মানুষ মারা যান এবং অনেকেই ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন। দুর্ঘটনার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় আড়াই হাজার মানুষ মারা যান এবং ক্ষতিগ্রস্ত হন প্রায় তার দশগুণ মানুষ (ব্রিট্‌জ পত্রিকা, 1986)।

12.4.4 ভূপালবাসীর বাঁচার চেষ্টা

দুর্ঘটনার দিন রাতে সাড়ো বারোটা থেকে একটা পর্যন্ত শহরের মানুষের চোখ ভীষণ জ্বালা করায় তাদের ঘুম ভেঙে যায়। ঘটনার চরম পরিণতি উপলব্ধি করতে না পারলেও ভয়ংকর কিছু একটা যে ঘটতে চলেছে সেই আশঙ্কায় ভূপালবাসী শহর ত্যাগে উদ্যত হয়। প্রত্যেকেই বিভিন্ন যানবাহনে চেপে দ্রুত শহর ছেড়ে পালাতে চায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও বহু লোক গ্যাস চেম্বারে আবদ্ধ অবস্থায় অসহায় ভাবে মৃত্যুবরণ করেন।

12.4.5 ক্ষতির পরিমাণ

অভিশপ্ত ঐ দিনটিতে ইউনিয়ন কার্বাইড কারখানা থেকে নির্গত MIC ও অন্যান্য মারাত্মক গ্যাস প্রায় 5 থেকে 8 কিলোমিটার ব্যাসার্ধ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। গ্যাসের এই মিশ্রণটি বায়ুর থেকে ভারী হওয়ায় তা জমির কাছাকাছি নিম্নমুখী গতিতে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় শিশুরা। বিজ্ঞানীদের ধারণা, ভূপাল শহরের কাছাকাছি দুটি বড় হ্রদ ঐ গ্যাস বেশ খানিকটা শোষণ না করলে ক্ষতির পরিমাণ আরও বেড়ে যেতো।

কারখানাটির কাছাকাছি থাকা হামিদিয়া হাসপাতালে রাত সওয়া একটা নাগাদ প্রথম চোখজ্বালা উপসর্গ নিয়ে লোক আসতে শুরু করে। রাত আড়াইটার মধ্যেই প্রায় চার হাজার মানুষ চোখজ্বালা ও শ্বাসকষ্ট নিয়ে ভর্ত্তি হয়েছিলেন। পরের দিন সকালে প্রায় পঁচিশ হাজারের মতো মানুষ গ্যাসের আক্রমণে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভিড় করে এবং তার মধ্যে তখনই আড়াই হাজার লোক মারা যায়। এক সপ্তাহের মধ্যেই প্রায় দশ হাজার লোক মারা যায়। হাজার খানেক লোকের চোখ অন্ধ হয়ে যায়। লক্ষ লক্ষ লোক অন্যান্য উপসর্গ নিয়ে বেঁচে থাকে।

12.4.6 প্রকৃত ক্ষতির হিসাব

সময় মতো ব্যবস্থা নিতে না পারায় এবং ঘটনার আকস্মিকতায় প্রকৃত মৃত্যুর সংখ্যা সরকারি ভাবে সঠিক জানা যায়নি—এ ধারনা প্রায় সমস্ত বেসরকারি সেবা প্রতিষ্ঠানের। ভূপাল গ্যাস পীড়িত মহিলা সংগঠন এবং জহরিলি গ্যাস কান্ড সংঘর্ষ মোর্চা নামক দুটি বেসরকারী সংগঠনের হিসাব মতো প্রায় বারো হাজার মানুষ মারা যায় ঐ বিষাক্ত গ্যাসের

প্রভাবে। শিশু, অসুস্থ, বৃদ্ধ, লোকেরা প্রথমেই মারা যায়। তারপর প্রায় প্রতি সপ্তাহে 5 জন করে গ্যাস আক্রান্ত মানুষ মারা যেতে থাকে। শিশু মৃত্যু ছাড়াও 1350 জন জন্ম নেওয়া শিশুর মধ্যে 16 জন শারীরিক ভাবে বিকলাঙ্গ হয়ে যায় এবং প্রায় 60 টি শিশুর অকাল প্রসব হয়। প্রায় সমস্ত শিশুই হৃদযন্ত্রের গোলমাল, চোখ, হাত ও পায়ের অস্বাভাবিকতা নিয়ে জন্মলাভ করে।

ঘটনার একশো দিন পর একটি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দল সমীক্ষা চালিয়ে তাঁদের অভিমত ব্যক্ত করেন। তাঁদের মতে সরাসরিভাবে এই ঘটনায় প্রায় আড়াই লক্ষ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর মধ্যে প্রায় 65 হাজার মানুষ মারাত্মকভাবে শ্বাসযন্ত্র, চোখ, অন্ত্র, স্নায়ুজনিত ও স্ত্রীরোগ সম্পর্কিত নানা রোগে আক্রান্ত হয়েছে। গর্ভবতী মহিলারা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন এবং আরও 45 হাজার মানুষ কমবেশি এই গ্যাসের ভয়ংকরতম শিকার হয়েছেন।

12.4.7 ক্ষতিপূরণ

এই দুর্ঘটনার ভয়ঙ্করতা সারা বিশ্বকে স্তম্ভিত করে দিয়েছিলো। ক্ষতির পরিমাণ সরকারি বা বেসরকারি মতে যাই হোক না কেন— মানুষের এই ক্ষতি এককথায় অপূরণীয়। তবুও বহুজাতিক সংস্থা ইউনিয়ন কার্বাইডের বিরুদ্ধে আমেরিকায় দেড় লক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের ক্ষতিপূরণের জন্য 100 বিলিয়ন পাউন্ড দাবি করে প্রায় 60টি মামলা রুজু করা হয়। তারপর ভারত সরকার স্বয়ং উদ্যোগী হয়ে মামলা মোকদ্দমা শুরু করে। মামলা মোকদ্দমার দীর্ঘসূত্রতার আশঙ্কায় শেষ পর্য্যন্ত কোর্টের বাইরেই ইউনিয়ন কার্বাইডের সঙ্গে 1 বিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ দেওয়ার চুক্তি সম্পাদিত হয়। যদিও খুবই দুঃখের কথা এই যে, ইতিমধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত আরও অনেক মানুষ মারা যান। ক্ষতিপূরণের আশায় জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত রোগের সঙ্গে লড়াই করে শেষ পর্য্যন্ত ক্ষতিপূরণ না পেয়েই মারা যান অনেকেই।

12.4.8 ঘটনাটি থেকে শিক্ষা

ভূপালের এই মারাত্মক ঘটনা প্রমাণ করে দিয়েছে যে সব কারখানায় ভীষণ বিষাক্ত রাসায়নিক নিয়ে কাজ হয় সেখানে যথেষ্ট নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেই। তাই রাসায়নিক কারখানাগুলির তৈরি এবং রক্ষণাবেক্ষণের দিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে কঠোর আইনের প্রয়োগ ঘটাতে হবে। দুর্ঘটনা যদি ঘটে তবে তার প্রতিরোধের সম্ভাব্য সমস্ত রকম ব্যবস্থা রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে যে দুর্ঘটনার পর ক্ষতিপূরণের দাবি নয়, দুর্ঘটনা ঘটতে না দেওয়া বা ঘটলে তার যথোপযুক্ত প্রতিরোধ ব্যবস্থার দাবিই কাম্য।

12.5 সারাংশ

পৃথিবীর ইতিহাসে ভূপাল গ্যাস দুর্ঘটনা অন্যতম মারাত্মক এবং প্রাণঘাতী দুর্ঘটনা। নানারকম বিষাক্ত রাসায়নিক উৎপাদন শিল্পে সঠিক নিরাপত্তার ব্যবস্থার ত্রুটি এবং অবহেলার কারণেই এই বিয়োগান্তক ঘটনায় লক্ষ লক্ষ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলো। 1984 সালের 3রা ডিসেম্বর রাতে ভূপালের ইউনিয়ন কার্বাইড কোম্পানীর কীটনাশক তৈরির কারখানায় MIC (মিথাইল আইসো সায়ানেট) গ্যাস সঞ্চয়কারী ট্যাঙ্ক থেকে লিক্ করে বাতাসে মিশে যায়। ফলে লক্ষ লক্ষ ঘুমন্ত ভূপালবাসীর ঐ বিষাক্ত গ্যাসে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলির হাতে মোট প্রায় 12 হাজার মানুষ এই দুর্ঘটনায় মারা যান। তাছাড়া অসংখ্য রোগী পরবর্তী সময়ে মারা যান বা অন্ধ হয়ে যান। নানা রকম উপসর্গ নিয়ে প্রায় লক্ষাধিক রোগী বেঁচে থাকে। শিশু ও গর্ভবতী মহিলারা দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। শেষ পর্য্যন্ত ইউনিয়ন কার্বাইড কোম্পানির সঙ্গে ভারত সরকারের এক বিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ দেবার চুক্তি সম্পাদিত হয়। চুক্তি যাই হোক না কেন এ ধরনের দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পাবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা এবং কঠোর আইনেরও প্রয়োজন।

12.5.1 প্রশ্নাবলী

সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ-

(1) কবে ভূপালে গ্যাস দুর্ঘটনা ঘটেছিলো?

(2) কোন গ্যাস লিক্ করে এই দুর্ঘটনা ঘটে?

(3) কি দিয়ে গ্যাস লিক্ বন্ধ করার চেষ্টা হয়েছিলো?

(4) কোন কম্পানীর কারখানায় এই দুর্ঘটনা ঘটে?

(5) প্রথম কোন হাসপাতালে শারীরিক উপসর্গ নিয়ে লোক আসে?

(6) ঘটনার 100 দিন পর চিকিৎসক দলের পরিদর্শন থেকে কত লোক এই মিক্ গ্যাসে আক্রান্ত হয়েছে জানা যায়?

(8) আমেরিকায় কত ক্ষতিপূরণ চেয়ে মোট কতগুলি মামলা হয়?

12.5.2 উত্তরমালা

(1) 1984 সালের 3রা ডিসেম্বর রাতে এই দুর্ঘটনা ঘটেছিলো।

(2) MIC বা মিথাইল আইসোসায়ানেট গ্যাস।

(3) Water jet বা জলের তীব্র ধারা এবং Gas Serabber ব্যবস্থার সাহায্যে।

(4) বহুজাতিক বা মার্কিন ইউনিয়ন কার্বাইড কম্পানীর ভূপালস্থিত কীটনাশক তৈরির কারখানায়।

(5) হামিদিয়া (Hamidia) হাসপাতালে রাত সওয়া একটা নাগাদ।

(6) প্রায় আড়াই লক্ষ মানুষ।

(7) আমেরিকার আদালতে মোট 100 বিলিয়ন পাউন্ড ক্ষতিপূরণ চেয়ে মোট 60 টি মামলা রুজু করা হয়।

12.6 নদীবাঁধ প্রকল্পের বিরোধী আন্দোলন

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বিশাল নদীবাঁধ প্রকল্প রূপায়িত হয়েছে। আরও বিভিন্ন জায়গায় নতুন নতুন বড় নদীবাঁধ প্রকল্প সরকারি ছাড়পত্র পেয়েছে। কাজও চলছে অনেক জায়গায়। দেখা গেছে এসব বাঁধ তৈরি হলে একদিকে কিছুটা উপকার হলেও অনেক প্রাকৃতিক সম্পদ ও মানব সম্পদ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। তাই এই অমূল্য পরিবেশের বিনিময়ে বাঁধ প্রকল্প তৈরির বিরুদ্ধে আমাদের দেশে গড়ে উঠেছে নানা আন্দোলন। এসব আন্দোলনের সমর্থনে এগিয়ে এসেছেন দেশবিদেশের পরিবেশবিদ্ ও বিজ্ঞানীরা। ভারতবর্ষের এরকমই তিনটি সর্বাত্মক নদীবাঁধ বিরোধী আন্দোলনের কথা এখানে আলোচনা করা হয়েছে।

12.6.1 নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন

বিশাল এই নদী উপত্যকায় 30টি বড় বাঁধ ও অসংখ্য ছোট ছোট নদীবাঁধ নির্মাণের জন্য ভারতবর্ষের অনুরোধ ক্রমে বিশ্বব্যাঙ্ক 1985 সালে মোট 45 কোটি ডলার ঋণ মঞ্জুর করেছে। এই বিশাল প্রকল্পের কাজ পুরোদমে শুরু হয় 1988 সালে। প্রকল্পটির তিনটি মহান জনকল্যাণমুখী উদ্দেশ্য ছিলো। প্রথমতঃ বন্যা প্রতিরোধ করা, দ্বিতীয়তঃ সংলগ্ন তিনটি রাজ্যে জলসেচ ব্যবস্থা এবং তৃতীয়তঃ দেড় হাজার মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন জলবিদ্যুৎ তৈরির ব্যবস্থা।

12.6.2 মানব কল্যাণ ও অকল্যান

নর্মদা বাঁধ প্রকল্পের বিরুদ্ধে প্রথম থেকেই সরব হন বিশ্বখ্যাত মহিলা পরিবেশবিদ্ মেধা পাটেকর। তিনি বিভিন্ন পরিবেশবিদ্, ইঞ্জিনীয়ার ও বিজ্ঞানীদের সঙ্গে আলোচনা ক্রমে এই প্রকল্পের নেতিবাচক দিকগুলির দিকে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তার মতে, এই প্রকল্প রূপায়িত হলে মাত্র 50 মেগাওয়াটের বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদন অসম্ভব। এই বাঁধের ফলে একদিকে বন্যা প্রতিরোধ করা হলে অন্য দিকে নতুন করে বন্যা দেখা দেবে। প্রায় 56000 হেক্টর উর্বর সুফলা কৃষিজমি বন্যার কবলে পড়বে। সব থেকে মারাত্মক হল গরিব, অনুন্নত ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের প্রায় এক মিলিয়ণ লোক গৃহহীন হয়ে পড়বে। 60.000 হেক্টর অরণ্য ধ্বংস হবে, ফলে নানারকম পশুপাখী ধ্বংস হবে। 25টি প্রজাতির পাখী ও তাদের বাসস্থান ধ্বংস ও বিলুপ্ত হয়ে যাবে। অসংখ্য মানুষ তাঁদের রোজগার ও জীবিকা হারাবে।

পরবর্তীকালে 'নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন' নামে একটি যৌথ আন্দোলন গড়ে ওঠে। আরো অনেক স্বেচ্ছাসেবী এবং পরিবেশপ্রেমী সংস্থা এই প্রকল্পের বিরোধীতা করে আন্দোলনে যোগ দেয়। 1989 সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোক হারসুদ উপত্যকায় সমবেত হয়ে এই প্রকল্পের বিরোধী 'নর্মদা বাঁচাও' আন্দোলনে সামিল হন। এভাবেই নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করে। বাবা আমতে এবং শ্রীমতী মেধা পাটেকর এই আন্দোলনের জন্য আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেন।

12.6.3 আন্দোলনের বর্তমান অবস্থা

নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন এখনো শেষ হয়ে যায়নি। এই মহাবাঁধ এবং অন্যান্য বাঁধ তৈরির প্রকল্পের যৌক্তিকতা নিয়ে ভারতের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রীম কোর্টের তিন সদস্যের এক বেঞ্চ তৈরি হয়। তারা এই প্রকল্পটির সবদিক খতিয়ে দেখার পরও শেষ পর্য্যন্ত গত 18ই অক্টোবর, 2000 সালে এই বাঁধ নির্মাণের পক্ষেই রায় দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, মহারাষ্ট্র সরকার ও মধ্যপ্রদেশ সরকার লিখিতভাবে আন্দোলনের বিশ্বখ্যাত নেত্রী মেধা পাটেকরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে বাঁধ তৈরির পর হাজার হাজার মানুষের বাড়িঘর জলমগ্ন হলেও কারোও পুনর্বাসন দেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

12.6.4 সুপ্রীম কোর্টের মর্মান্তিক রায়

সুপ্রীম কোর্টের রায় যে শুধুমাত্র জনগনের বা আন্দোলনের বিরুদ্ধেই গেছে তা নয়। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের মতে নর্মদা বাঁধের ফলে পরিবেশের কিছুটা পরিবর্তন অবশ্যই হবে তবে তা পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করবে একথা ভাবা ভুল। বিশাল বাঁধকে কখনই দূষণ ছড়ানোর শিল্প বা পরমানুচুল্লীর সাথে তুলনা করা উচিৎ নয়।

12.6.5 ক্ষতির পরিমাপ

নর্মদার বিশাল বাঁধের জন্য ক্ষতি যে হবেই তা স্বীকার করে নিয়েছেন প্রায় সকলেই। সর্দার সরোবর বাঁধের জলাধারের উচ্চতা 455 ফুট হওয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হবে মধ্যপ্রদেশের 193টি গ্রাম, মহারাষ্ট্রের 33টি গ্রাম ও গুজরাতের 19টি গ্রাম। এর মধ্যে মধ্যপ্রদেশের একটি ও গুজরাতের তিনটি গ্রাম সম্পূর্ণভাবে জলে ডুবে যাবে। জলের তলায় চলে যাবে প্রায় 11279 একর চাষযোগ্য জমি। তবে সুপ্রীম কোর্টের মতে ওড়িশার হীরাকুঁদ, অন্ধ্রের শ্রীরামসায়র কিংবা কর্ণাটকের তুঙ্গভদ্রা বাঁধের তুলনায় নর্মদা বাঁধের জন্য ক্ষতির পরিমাণ অনেক কমই থাকবে। এমনকি আশ্চর্য্যের ব্যাপার সুপ্রীম কোর্ট মনে করে এই বাঁধের ফলে আশেপাশের পরিবেশের উন্নতিও ঘটতে পারে।

বর্তমানে মেধা পাটেকর আরও বৃহত্তর আন্দোলন শুরু করছেন। ইতিমধ্যেই তিনি মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির সামনে টানা পাঁচদিনের অনশন করে আবার সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। প্রকল্পটির বিরুদ্ধে আরও বিরাট জনমত গড়ে তুলতে আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছেন। যদিও সরকারি ভাবে প্রকল্পটির কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে।

12.6.6 তেহরী বাঁধ বিরোধী আন্দোলন

উত্তর প্রদেশ রাজ্যের পার্বত্য হিমালয়ের উত্তর-পশ্চিম ভাগে পর্বতের পাদদেশে ভাগীরথী নদী ও তীলগঙ্গা নদীর সংযোগস্থলে তেহরী গাঁড়োয়াল অঞ্চলে এক বাঁধ নির্মাণ ও জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের পরিকল্পনা গৃহীত হয়। প্রকল্পটির আর্থিক সহায়তায় রাজি হয় সোভিয়েত দেশ। বাঁধটির উচ্চতা হবে 260.5 মিটার। প্রকল্পটি উদ্দেশ্য ছিল বিশাল উঁচু এই বাঁধের জন্য সেচব্যবস্থা, বিদ্যুৎ এবং অন্যান্য অনেক উপকার হবে।

12.6.7 প্রকল্পটির উদ্দেশ্য

বিশাল উঁচু বাঁধের জন্য তৈরি হবে বিশাল জলাধার। সেখানে থাকবে প্রায় 32000 টন জল। তাই বছরের যে কোন সময়েই অফুরন্ত জলের সরবরাহ পেতে পারবে সংলগ্ন এলাকাগুলি। অনেক নতুন জমিতেও সেচ ব্যবস্থা সম্প্রসারিত করা যাবে। প্রায় 270000 হেক্টর নতুন চাষযোগ্য জমি এর ফলে সেচ ব্যবস্থার আওতায় আসবে। বর্তমানে সেচ ব্যবস্থার আওতায় থাকা আরও 640000 হেক্টর পরিমাণ জমিতে অতিরিক্ত জলসেচের জন্য সহায়তা করবে। তাছাড়া এই জলাধার থেকে প্রবাহিত উচ্চ চাপ সম্পন্ন জলধারার সাহায্যে 1000 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হবে। 1988 সালে উত্তর প্রদেশ সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে গঠন করে 'তেহরী হাইড্রো ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন'। এর দশ বছর আগেই 1977 সালে এই বাঁধ নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছিলো। শুরুর সঙ্গে সঙ্গেই এই বাঁধ প্রকল্পের বিরোধীতায় "তেহরী বাঁধ বিরোধী সংগ্রাম সমিতি" গঠিত হয়।

12.6.8 বিরোধিতার কারণ

আপাত দৃষ্টিতে বাঁধের নির্মাণের পর মানুষের অনেক কাজ এবং উপকার হবে বলে মনে হলেও বিস্তারিত অনুসন্ধান ও সমীক্ষা চালানোর পর মনে হয়েছে বাঁধ প্রকল্পটি যে সব গুণাবলী ও উপকারের কথা ঘোষনা করা হয়েছিলো তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বেশ অতিরঞ্জিত। শুধু তাই নয়, কিছুটা উপকার হলেও ক্ষতির দিকটা ঠিকমতো ভেবে দেখা হয়নি। তেহরী বাঁধ বিরোধী সংগ্রাম সমিতির মতে, এই বাঁধ প্রকল্পটি রূপায়িত হলে প্রায় একলক্ষ লোক গৃহহীণ হবে। তেহরী গাড়োয়াল এলাকার প্রায় 100টি গ্রাম জলমগ্ন হবে। সুগভীর জলাধারে 32000 টন জল থাকার ফলে ঐ এলাকায় প্রবল ভূমিকম্পের সম্ভবনা বেড়ে যাবে। এছাড়া গঙ্গার তীরে অবস্থিত যেসব বিখ্যাত ধর্মস্থান আছে যেমন হরিদ্বার, হৃষিকেশ, দেবপ্রয়াগ ইত্যাদি জায়গাগুলোও ধ্বংস হয়ে যাবে এবং বিস্তীর্ণ এলাকার উর্বর চাষের জমিগুলিও জলমগ্ন হয়ে পড়বে।

12.6.9 প্রতিরোধ

প্রথমতঃ আইনগতভাবে এই প্রকল্পের বিরুদ্ধে তেহরী বাঁধ বিরোধী সংগ্রাম সমিতি সুপ্রীমকোর্টে মামলা দায়ের করে। তারপর 1980 সালে ভারত সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ এই নদীবাঁধ প্রকল্পটির সব দিক খতিয়ে দেখার জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করে। এই কমিটি 1986 সালে রিপোর্ট দেবার পর কেন্দ্রীয় জল কমিশন এই প্রকল্পের পক্ষেই মতামত দেয়। ইতিমধ্যে বিশ্বখ্যাত পরিবেশবিদ্ সুন্দরলাল বহুগুণার নেতৃত্বে এই বাঁধ বিরোধী আন্দোলন এক নতুন মাত্রা পায়। শেষ পর্য্যন্ত 1987 সালে তৎকালীন কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশ মন্ত্রী প্রকল্পটির সপক্ষে বা বিপক্ষে কোন প্রস্তাবই গ্রহণ করেন নি। সুন্দরলাল বহুগুণা বহুবার এই প্রকল্পটির বিরোধিতা করে অনশন করেন। সর্বোপরি তেহরী বাঁধ বিরোধী আন্দোলনের কথা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। শেষ পর্য্যন্ত বাধ্য হয়েই 1990 সালে প্রকল্পটির কাজ সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়। পরিবেশবিদ্দেরই জয় হয়। এর পরেও রাজ্য সরকারের তরফে বেশ কয়েকবার প্রকল্পটির কাজ আবার শুরু করার চেষ্টা হলে সুন্দরলাল বহুগুণার তীব্র বিরোধিতায় তা সম্ভবপর হয়নি।

12.7 সাইলেন্ট ভ্যালী আন্দোলন

সাইলেন্ট ভ্যালী আন্দোলন ভারতবর্ষের বিভিন্ন পরিবেশ আন্দোলনের মধ্যে অন্যতম। কেরালায় পালঘাট জেলার পার্বত্য উপত্যকায় রয়েছে এক বিশাল সুন্দর বর্ষা অরণ্যের সাইলেন্ট ভ্যালীর অবস্থান। এখানে বিভিন্ন প্রজাতির নানারকম প্রাণী ও উদ্ভিদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। রাজ্যের বিদ্যুৎপর্ষদ সেখানকার কুন্তী নদীতে বাঁধ দিয়ে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের একটি প্রকল্পের পরিকল্পনা করে। কিন্তু প্রকল্প রচনার সময় এর ক্ষতিকর দিকগুলোর কথা বিবেচনা করা হয়নি এই আশঙ্কা করে 1978 সালে কেরালার একটি বামপন্থী স্বেচ্ছাসেবী বিজ্ঞান সংস্থা, কেরালা শাস্ত্রীয় সাহিত্য পরিষদ এর বিরুদ্ধে প্রথম প্রচার আন্দোলনে নামে। ক্রমে এই আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে ওঠে। বিভিন্ন জনমাধ্যমও এই আন্দোলনকে সমর্থন করে। কেননা এই প্রকল্পের রূপায়ণে সাইলেন্ট ভ্যালীর সুন্দর বর্ষা অরণ্যটির অধিকাংশই জলমগ্ন হবে। ধ্বংস হবে সেখানকার পরিবেশ, বিলুপ্তপ্রায় নানা প্রাণী ও উদ্ভিদ এবং গোটা এলাকাটির বাস্তুতন্ত্র। পরে WWF (ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ফান্ড ফর নেচার) সাইলেন্ট ভ্যালীতে বসবাসকারী একটি বিশেষ প্রজাতির দুর্লভ বাঁদরের বিলুপ্তির আশঙ্কা প্রকাশ করলে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী এই ব্যাপারে ব্যক্তিগত উৎসাহ দেখান। তারই হস্তক্ষেপে কেরালা বিধানসভায় দু দুবার প্রকল্পটি রূপায়নের জন্য সর্বসম্মত প্রস্তাব গৃহীত হওয়া সত্ত্বেও প্রকল্পটি পরিত্যক্ত হয়। এক্ষেত্রেও জয় হয় পরিবেশ আন্দোলনের।

12.8 সারাংশ

আজ সারা বিশ্বের মানুষজন পরিবেশের উন্নতির জন্য তাদের চিন্তাভাবনা প্রসারিত করছেন। তাঁরা পরিবেশের ক্ষতিকর যে কোন ঘটনা বা প্রকল্পের বিরুদ্ধে গোটা বিশ্বের দরবারে প্রচার আন্দোলন চালাচ্ছেন, গড়ে তুলছেন তীব্র গণ আন্দোলন। অ্যাপ্পিকো ও চিপকো আন্দোলনের কথা আজ সারা বিশ্বের মানুষের কাছে, পরিবেশ প্রেমিদের কাছে অজানা নয়। হিমালয় সংলগ্ন এলাকার পরিবেশ বিরোধী কর্মকান্ডে বাধা দিতেই জন্ম নেয় চিপকো এবং অ্যাপ্পিকো আন্দোলন। চিপকো আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন সুন্দরলাল বহুগুণা এবং অ্যাপ্পিকো আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেন পান্ডুরাম হেগড়ে। শেষ পর্যন্ত পরিবেশ আন্দোলনেরই জয় হয়। স্টকহোমে বিশ্ব পরিবেশ দিবসে চিপকো আন্দোলনের উপর একটি প্রদর্শনী ও মেলা হওয়ায় আন্দোলনটি আন্তর্জাতিক মাত্রা পায়।

শিল্পজাত দুর্ঘটনায় সারা বিশ্বকে স্তম্ভিত করে দিয়েছিলো ভূপাল গ্যাস দূর্ঘটনা। একটিমাত্র বহুজাতিক কোম্পানী ইউনিয়ন কার্বাইড এর ভূপালের অবস্থিত কীটনাশক তৈরির কারখানা থেকে 1984 সালের 3 রা ডিসেম্বর রাতে বিষাক্ত MIC গ্যাস লিক্ করে ছড়িয়ে পড়ে ঘুমন্ত শহরে। বেসরকারি সংস্থার হিসাব অনুযায়ী প্রায় 12 হাজার মানুষ মারা যায় ঐ গ্যাস দূর্ঘটনায়। ঐ গ্যাসের মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাবে প্রায় আড়াই লক্ষ মানুষ সরাসরি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। সারা বিশ্বে এই ঘটনার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে ওঠে।

ভারতবর্ষের বড় বড় নদীবাঁধ তৈরি বা প্রকল্প পরিকল্পনার সময় বহুক্ষেত্রেই শুধুমাত্র উপকারের দিকগুলিকে আলোকিত করা হয় কিন্তু এর মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব এবং ক্ষতিগুলির কথা চিন্তা করা বা গুরুত্ব দেওয়া হয় না। তাই এরকম বড় নদীবাঁধ প্রকল্পের বিরুদ্ধে ভারতে তীব্র গণ আন্দোলন গড়ে উঠেছে। বিশ্বব্যাঙ্কের সহায়তায় সর্দার সরোবর বাঁধ তৈরির প্রকল্পের বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী ও শক্তিশালী নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন গড়ে ওঠে মেধা পাটেকরের সুযোগ্য নেতৃত্বে। সেই আন্দোলন আজও অব্যাহত আছে। এছাড়া সেই তেহরী গাড়োয়ালে তেহরী বাঁধ বিরোধী আন্দোলনে সুন্দরলাল বহুগুণার নেতৃত্বে এক দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন গড়ে ওঠে। তাছাড়া কেরালার কুন্তী বাঁধ প্রকল্পের জন্য সেখানকার বর্ষা অরণ্য সাইলেন্ট ভ্যালী ধ্বংস হবার বিরুদ্ধেও গড়ে ওঠে এক তীব্র গণ আন্দোলন। এরকম দেশের নানা জায়গায় পরিবেশ বিরোধী যে কোন প্রকল্পের বিরুদ্ধেই গড়ে উঠছে শক্তিশালী গণ আন্দোলন।

12.9 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

(a) UNEP — পুরো কথাটি কি?

(b) WWF — পুরো কথাটি কি?

(c) MIC — পুরো কথাটি কি?

(d) HCN — পুরো কথাটি কি?

(e) ভূপালের কোন কারখানা থেকে গ্যাস দুর্ঘটনা ঘটেছিলো?

(f) চিপকো আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন কে?

(g) সুন্দরলাল বহুগুণা চিপকো ছাড়া আর কোন বিখ্যাত আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন?

(h) কেরালার কোন নদীতে বাঁধের জন্য সাইলেন্ট ভ্যালি ধ্বংস হবার আশঙ্কা ছিলো?

(i) অ্যাপ্পিকো আন্দোলন কোথায় ঘটেছিলো?

(j) সাইলেন্ট ভ্যালী আন্দোলন কোন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা শুরু করেছিলো?

(k) তেহরী বাঁধের রূপায়নে কত খানি জলবিদ্যুৎ উৎপাদন প্রস্তাব ছিলো?

(l) তেহরী বাঁধের রূপায়নে কত খানি জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রস্তাব ছিলো?

(m) কোন কোন নদীর সংযোগস্থলে তেহরী বাঁধ নির্মাণের কথা ছিলো?

(n) তেহরী বাঁধের বিশাল জলাধারটিতে কত জলধারণ ক্ষমতা ছিলো?

(o) পরিবেশবিদ্‌দের মত অনুযায়ী তেহরী বাঁধের জন্য ঐ এলাকায় কয়টি গ্রাম জলমগ্ন হবার আশঙ্কা আছে?

12.10 উত্তরাবলী

(a) ইউনাইটেড নেশনস্ ইকোলজিক্যাল প্রোগ্রাম (United Nations ecological programme)

(b) ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ফান্ড ফল নেচার (World wide Fund for Nature)

(c) মিথাইল আইসোসায়ানেট (Methyl Isocyanate)

(d) হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড (Hydro Cyanic acid)

(e) ইউনিয়ন কার্বাইড-এর কীটনাশক তৈরির কারখানা

(f) সুন্দরলাল বহুগুণা

(g) তেহরী বাঁধ বিরোধী আন্দোলন

(h) কুন্তী নদী

(i) কর্ণাটকে

(j) তেহরী বাঁধ বিরোধী সংগ্রাম সমিতি

(k) 1000 মেগাওয়াট

(l) ভাগীরথী ও তীলগঙ্গা নদী

(m) 32000 টন

(n) প্রায় 100 টি

সঠিক উত্তরটি বেছে নাও

(a) চিপকো ও অ্যাপ্পিকো আন্দোলন প্রধানত হয়েছিলো কিসের বিরুদ্ধে?

1. নদী বাঁধের বিরুদ্ধে, 2. গাছ কাটার বিরুদ্ধে, 3. পরিবেশ দূষণের বিরুদ্ধে, 4. জল দূষণের বিরুদ্ধে

(b) নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন কে?

1. মেধা পাটেকর, 2. সুন্দরলাল বহুগুণা, 3. পান্ডুরাঙ হেগড়ে, 4. W.W.F

(c) ভূপাল গ্যাস দুর্ঘটনার প্রধানত কোন গ্যাস লিক্ করেছিলো?

1. $COCl_2$, 2. MIC, 3. HCN, 4. SO_2

(d) বাবা আমতে কোন আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন?

1. চিপ্‌কো, 2. অ্যাপ্পিকো, 3. সাইলেন্ট ভ্যালী, 4. নর্মদা বাঁচাও

(e) চিপ্‌কো কথাটির অর্থ হলো—

1. চেপে ধরা, 2. আলিঙ্গন করা, 3. চাপিয়ে দেওয়া, 4. চেপ্টে দেওয়া

উত্তরমালা

(a) — (2)

(b) — (1)

(c) — (2)

(d) — (4)

(e) — (2)

দীর্ঘ উত্তর ভিত্তিক প্রশ্ন

1. চিপ্‌কো আন্দোলনের পুরোধা হিসেবে খেজারিলি গ্রামের ঘটনাটি বর্ণনা কর।

2. সুন্দর লাল বহুগুণা কিভাবে চিপকো আন্দোলনকে শক্তিশালী করেন এবং তাতে আন্তর্জাতিক সমস্যার মাত্রা যোগ করেন?

3. চিপকো আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য কি ছিলো ?

4. কিভাবে এবং কবে ভূপাল গ্যাস দুর্ঘটনা ঘটেছিলো?

5. ভূপাল বাসী গ্যাস দুর্ঘটনা থেকে কিভাবে নিজেদের বাঁচাবার চেষ্টা করেছিলো?

6. ভূপালের গ্যাস দুর্ঘটনায় প্রকৃতি ক্ষতি কতখানি হয়েছিলো?

7. ক্ষতিপূরণের জন্য কি চেষ্টা হয়েছিলো এবং শেষ পর্য্যন্ত কি ক্ষতিপূরণ পাওয়া গেছে?

8. নর্মদা বাঁধ প্রকল্প মানুষের কল্যাণ না অকল্যাণের বোঝা বাড়াবে?

9. নর্মদা বাঁধ বিরোধী আন্দোলনের বর্তমান অবস্থা কি? সুপ্রীম কোর্টের রায়কে পরিবেশ প্রেমীরা মর্মান্তিক বলেছেন কেন?

10. তেহরী বাঁধ আন্দোলনের কিভাবে বিরোধিতা করা হয়েছে এবং কেন?

উত্তরমালা

1. 12.2.1 অংশ দেখুন
2. 12.2.2 এবং 12.2.3 অংশ দেখুন
3. 12.2.4 অংশ দেখুন
4. 12.4.1 অংশ দেখুন
5. 12.4.4 অংশ দেখুন
6. 12.4.6 অংশ দেখুন
7. 12.4.7 অংশ দেখুন
8. 12.6.2 অংশ দেখুন
9. 12.6.3 এবং 12.6.4 অংশ দেখুন
10. 12.7.9 এবং 12.7.8 অংশ দেখুন

একক 13 ❑ বন্যপ্রাণী ও তাদের বাসস্থান

গঠন

13.1 প্রস্তাবনা

উদ্দেশ্য

13.2 বন্যপ্রাণী ও তার প্রয়োজনীয়তা

13.3 পৃথিবীর জলবায়ু প্রভাবিত অরণ্য সমূহের অবস্থান ও সেখানে বসবাসকারী বন্যপ্রাণী সম্বন্ধে ধারণা

13.3.1 পৃথিবীর মানচিত্রে অরণ্য সমূহের অবস্থান

13.4 ভারতের বিভিন্ন অরণ্যভূমি, তাদের অবস্থান, জলবায়ু, প্রাপ্ত উদ্ভিদ ও প্রাণীর বর্ণনা

13.4.1 ভারতবর্ষের মানচিত্রে বিভিন্ন অরণ্যভূমি ও তাদের বাসস্থান

13.5 ভারতবর্ষের কয়েকটি স্তন্যপায়ী প্রাণী ও পক্ষীর নাম, বাসস্থান, বৈশিষ্ট্য ও স্বভাবের বর্ণনা

13.6 ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে প্রধান প্রাণী, পক্ষী ও বৃক্ষের নাম

13.7 সারাংশ

13.8 প্রশ্নাবলী

13.9 উত্তরমালা

13.1 প্রস্তাবনা ও উদ্দেশ্য

প্রস্তাবনা

বর্তমান সময়ে বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন কারণে বন্যপ্রাণীর সংখ্যা ও বাসস্থান দুইই হ্রাস পাচ্ছে। যদিও বন্য প্রাণীদের প্রাচুর্য এখনও যথেষ্ট পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। এছাড়াও সাম্প্রতিককালে এ বিষয়ে মানুষের মধ্যে কিছুটা সচেতনতা বৃদ্ধির চেষ্টা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক ও জাতীয় উভয় স্তরেই বহু উদ্যোগ ও আইন প্রণয়নের মাধ্যমে বন্যপ্রাণী ও তাদের বাসস্থানের যথাযথ রক্ষণের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। ভারতবর্ষে বন্যপ্রাণীর প্রাচুর্য উল্লেখযোগ্য, যদিও নানা কারণে তাদের বাসস্থান যথেষ্ট নয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, নগরায়ণ, বনাঞ্চল উচ্ছেদ, চাষের জমির প্রয়োজন প্রভৃতি বন্যপ্রাণীদের সংখ্যা হ্রাসের কয়েকটি কারণ হিসাবে উল্লেখ করা যায়। বন্যপ্রাণীদের রক্ষণের প্রয়োজনীয়তা আজ প্রশ্নাতীত। তাই এই মুহূর্তে সংশ্লিষ্ট সকলের উপযোগিতায় তাদের রক্ষণাবেক্ষণ একান্তভাবেই জরুরি।

উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন—

- পৃথিবীর বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল সম্পর্কে একটি ধারণা।
- আমাদের দেশে বর্তমান বনভূমি এবং তার ভূ প্রাকৃতিক অবস্থান সম্পর্কে ধারণা।
- বিভিন্ন ধরনের বন্যপ্রাণীদের সাধারণ নাম, বৈজ্ঞানিক নাম, বাসস্থান, স্বভাব ও প্রাণী উদ্ভিদের অবস্থানগত বিষয় সম্পর্কে বিশদ জ্ঞান।

13.2 বন্যপ্রাণী ও তার প্রয়োজনীয়তা

নিজ নিজ বাসস্থানে স্বাভাবিক ভূ প্রাকৃতিক অঞ্চলে বাস্তুসংস্থানের নিয়মাবলীকে গ্রাহ্য করে যখন উদ্ভিদ, প্রাণী ও অণুজীব স্বাভাবিক বস্তুসংস্থান রচনা করে তখনই রচিত হয় বন্য পরিবেশ। নির্দিষ্টভাবে যে সমস্ত প্রাণী এমন পরিবেশে নিজেদের খাদ্য, বাসস্থান ও সন্তান প্রতিপালন করে তাদেরকে বলা হয় বন্যপ্রাণী। বন্যপ্রাণীর গুরুত্ব হল ঃ বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য রক্ষা ও খাদ্য শৃঙ্খলের সঠিক সঞ্চালন করা। এছাড়াও বন্যপ্রাণীর অর্থনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম। অনেক ক্ষেত্রে জীবন্ত প্রাণী বিনিময় ও বিক্রয়যোগ্যও বটে, তাছাড়া বন্য প্রাণী কেন্দ্রিক পর্যটন বা ইকোটুরিসয় অর্থনীতির একটি অগ্রণী বিষয়। সর্বোপরি কোনো একটি দেশের বন্যপ্রাণী সেখানকার মানুষের ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং নান্দনিক ও কৃষ্টিগত প্রকাশের একটি মাধ্যমও বটে।

13.3 পৃথিবীর জলবায়ু প্রভাবিত অরণ্যসমূহের অবস্থান ও সেখানে বসবাসকারী বন্যপ্রাণী সম্বন্ধে ধারণা

অরণ্যের নাম	অবস্থান	জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য	বন্যপ্রাণী
১। ক্রান্তীয় চিরহরিৎ বৃক্ষের অরণ্য	বিষুবরেখা বা নিরক্ষরেখার পার্শ্ববর্তী ঘন অরণ্য।	সারা বছর মোটামুটি একই তাপমাত্রা থাকে। গরমকাল স্থায়ী, বৃষ্টিপাত খুব বেশি (200-400 সে.মি) হয়।	পৃথিবীর সব বায়োম যত সংখ্যক উদ্ভিদ ও প্রাণি প্রজাতি আছে তার থেকে এখানকার উদ্ভিদ ও প্রাণীর সংখ্যা ও বৈচিত্র্য অনেক বেশি। প্রাণিগুলি হলো— বাঘ, বানর, জিরাফ, গ্র্যাজেল ইত্যাদি।
২। মৌসুমী অরণ্য	উত্তর আমেরিকার পশ্চিমাংশের কিছুটা, দক্ষিণ আমেরিকা ও আফ্রিকার পূর্বাঞ্চল, ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশ।	বর্ষাকালে বৃষ্টিপাত প্রচুর, গরমকাল স্থায়ী।	হাতি, গন্ডার, বাঘ, চিতাবাঘ, বানর, চিতল ইত্যাদি।
৩। সাভানা ক্রান্তীয় তৃণভূমি	আফ্রিকার অনেকটা অংশ জুড়ে রয়েছে।	মৌসুমী বৃষ্টিপাত। প্রচুর বৃষ্টিপাতের সময় বড় বড় গাছগুলির অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ছোট ঘাসগুলিকে মেরে ফেলে। অন্যসময় ঘাসগুলি অনেক বড় হয়।	তৃণভোজী প্রাণির চারণভূমি, সিংহ, গ্যাজেল, ইম্পালা, জিরাফ, জিব্রা, নু, জলহস্তী ইত্যাদি।

অরণ্যের নাম	অবস্থান	জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য	বন্যপ্রাণী
৪। মরুভূমি অঞ্চলের অরণ্য	উত্তর আমেরিকার পশ্চিমাঞ্চল ও আফ্রিকার উত্তরাঞ্চল, সৌদি আরব প্রভৃতি দেশ।	বৃষ্টিপাত খুবই কম, বছরে গড়ে 25 সেমি বা তারও কম। দিনের ও রাতের তাপ মাত্রার পার্থক্য অনেক বেশি। গাছগুলির বছরে একবার অঙ্কুরোদগম হয়। ক্যাকটাস জাতীয় গাছের আধিক্য, যা জল ধরে রাখতে সক্ষম।	উট, ক্যাঙ্গারু, ইঁদুর, গর্দভ, কস্তুরী মৃগ, বিভিন্ন ধরণের সরীসৃপ ও পোকামাকড়।
৫। চ্যাপারাল	আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ক্যালির্ফোনিয়ার দক্ষিণ উপকূল।	গরমকাল স্থায়ী। শীতকালে বৃষ্টিপাত বেশি, ছোট ছোট কাঁটা-ঝোপঝাড় জাতীয় গাছ এখানকার বিশেষত্ব।	খরগোস, মিউল, হরিণ, বিভিন্ন ধরণের সরীসৃপ বেনটিট ও ধূসর টাহিজ্।
৬। নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি	আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র	সারা বছর বৃষ্টিপাত সামান্য। অনেক সময়েই খরা, চিরহরিৎ বৃক্ষের অরণ্য পরিলক্ষিত হয়।	বাইসন, ভালুক, অ্যান্টিলোপ, নানারকম ডেস্ট, প্রেইরিডগ, গফারস।
৭। নাতিশীতোষ্ণ পর্ণমোচী	আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূল ও ইউরোপের পূর্বাঞ্চল।	মোটামুটি বৃষ্টিপাত। গরম অসহনীয় নয়।	ভোলস্, কাঠবিড়ালী, রেকুন, ও পাসাম সাদাপেয়ে ইঁদুর, নেকড়ে, ববক্যাট, ধূসর শিয়াল।
৮। কনিফেরাস অরণ্য (তায়গা)	ইউরোপ ও এশিয়ার উত্তরাঞ্চল, তুন্দ্রা অঞ্চলের ঠিক নীচের দিকে অবস্থিত।	শীতকাল দীর্ঘস্থায়ী। চিরহরিৎ বৃক্ষের অরণ্য, পাতা ছোট ঘন ও মোটা কিউটিফল দিয়ে ঢাকা।	এল্‌ফ, মুস, মিউল হরিণ, কালো ভাল্লুক, গ্রীসল্‌স, সজারু, ইঁদুর, স্নোসু, খরগোস, স্রিউ, নেকড়ে ও লিঙ্কস।
৯। তুন্দ্রা	আমেরিকা ও এশিয়ার উত্তরাংশে	খুবই শীতল। ঘাস, লাইকেন প্রভৃতি উদ্ভিদ।	ক্যারিবু, বল্গাহরিণ, মাস্কঅক্স, লেমিং।
১০। টাইডাল অরণ্য	পশ্চিমবঙ্গের গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ অঞ্চল	ম্যানগ্রোভ জাতীয় অরণ্য।	রয়্যালবেঙ্গল টাইগার, চিতল, কুমীর প্রভৃতি।

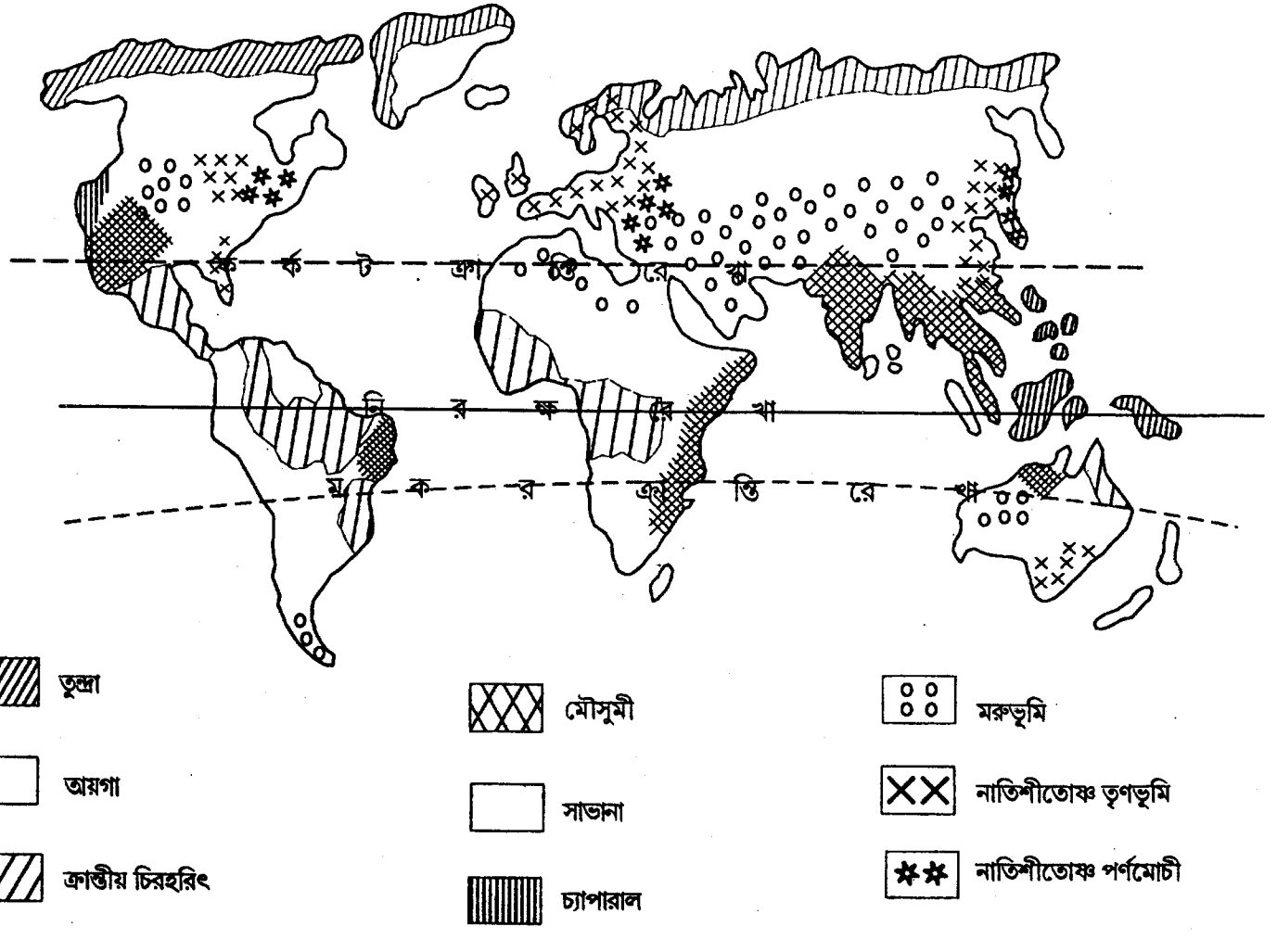

ক র্ক ট ক্রা ন্তি রে খা
নি র ক্ষ রে খা
ম ক র ক্রা ন্তি রে খা
তুন্দ্রা
আয়গা
ক্রান্তীয় চিরহরিৎ
মৌসুমী
সাভানা
চ্যাপারাল
মরুভূমি
নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি
নাতিশীতোষ্ণ পর্ণমোচী

13.4 ভারতের বিভিন্ন অরণ্যভূমি, তাদের অবস্থান, জলবায়ু, উদ্ভিদ ও প্রাণীর বর্ণনা

ভারতের বিভিন্ন অরণ্যভূমি, তাদের অবস্থান, জলবায়ু, উদ্ভিদ ও প্রাণীর বর্ণনা নীচে একটি ছকের সাহায্যে দেখানো হলো।

	নাম	অবস্থান	বৈশিষ্ট্য	উদ্ভিদ	প্রাণী
ব	১। উষ্ণ আর্দ্র চিরহরিৎ অরণ্য	ভারতের পশ্চিম উপকূল, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ।	সারা বছর মোটামুটি ভালোই বৃষ্টিপাত, গড়ে ২৫০ সেমি বা তার বেশি।	ডিপটেরোকারপাস, ম্যাজিফেরা, মাইকেলিয়া ইত্যাদি।	হাতি, একশৃঙ্গ গণ্ডার, সাম্বার, সোয়াম্প, ডিয়ার, চিতল, বাঘ, সোনালী লাদুর ইত্যাদি।
	(ক) উষ্ণ আর্দ্র অর্ধ চিরহরিৎ অরণ্য	আসাম, পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাঞ্চল, উড়িষ্যা।	বৃষ্টিপাত খুব বেশি।	সোরিয়া, টারমিনেলিয়া অটো কারপাস্।	চিতাবাঘ, বন্য কুকুর, হাইনা, কালো ভল্লুক, গাউর ইত্যাদি।
ন	(খ) উষ্ণ আর্দ্র পর্ণমোচী অরণ্য	কেরালা, কর্ণাটক, উত্তরপ্রদেশের দক্ষিণাঞ্চল, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা।	কিছু পর্ণমোচী, কিছু অর্ধ পর্ণমোচী ও কিছু চিরহরিৎ বৃক্ষ দেখা যায়।	সোরিয়া, সেগুন, সালম্যালেয়া, টেকটোনা ইত্যাদি।	গ্যাজেল ও হরিণ, চিতাবাঘ, সজারু, হাতি, বাঘ ইত্যাদি।
ভূ	২। শুষ্ক পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্য	পঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ।	বৃক্ষগুলি খুব উঁচু নয়, কাটাঝোপ, তৃণভূমির আধিক্য।	অ্যাকাসিয়া, টেকটোনা, বামবুসা, ল্যানটানা জাতীয় গাছ।	হাতি, বন্য শুয়োর, হরিণ, চিতাবাঘ, বাঘ, বানর, গাউর, শিয়াল ইত্যাদি।
	৩। মন্টেস নাতিশীতোষ্ণ	দক্ষিণ ভারতের নীলগিরি, মহাবালেশ্বর প্রভৃতি পার্বত্য অঞ্চল।	পাহাড়ের উচ্চতা 3000-6000 ফুট।	ফাইকাস, ইউজেনিয়া, পিপার নিটাম, ম্যাদিফেরা ইত্যাদি।	নীলগাই, গাউর, নীলগিরি, লাদুর ইত্যাদি।
মি	৪। মন্টেস টেম্পারেট	হিমালয় ও নীলগিরির পার্বত্য অঞ্চল।	5500 ফুটের ওপরে চিরহরিৎ অরণ্য ও তৃণভূমি।	ব্যানানোকারপাস, হোপিয়া, মস্, ফার্ণ, এপিফাইটস্।	হাতি, কাশ্মীরি স্ট্যার্গ, বাঘ, অ্যান্টিলোপ ইত্যাদি।

	নাম	অবস্থান	বৈশিষ্ট্য	উদ্ভিদ	প্রাণী
বনভূমি	৫। অ্যালপাইন	হিমালয়ের অনেক ওপরে।	প্রায় ১১,০০০ ফুট উচ্চতা	সেডাম, প্রাইমিউ লা, লাইকেন ইত্যাদি।	অ্যান্টিলোপ, স্নো লেপার্ড, ক্লাউডেড লেপার্ড, গোল্ডেন ইগল, নেকড়ে, মেষ ইত্যাদি।
বনভূমি	৬। টাইডাল	গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ অঞ্চল, সুন্দরবন।	৭০ শতাংশ ম্যানগ্রোভ অরণ্য	সোনেরেশিয়া (সুন্দরী), গরান ইত্যাদি।	মাড স্কিপার, রয়াল বেঙ্গল টাইগার, চিতল, কৃষ্ণসার ইত্যাদি।
তৃণভূমি	তৃণভূমি	গুজরাট ও রাজস্থানের কিছু অংশ।	শুষ্ক ও আর্দ্র আবহাওয়ায় ছোট তৃণজাতীয় গাছ ও তার মাঝখানে কিছু পর্ণমোচী বৃক্ষ।	জেরোফাইলাস্ ও মেরোফাইলাস	সিংহ, উট, গর্দভ, রোডেন্ট, কৃষ্ণসার, গ্রেট ইন্ডিয়ান বাস্টার্ড ইত্যাদি।

13.4.1 ভারতের বিভিন্ন অরণ্যভূমি ও তাদের অবস্থান

নীচে একটি ছকের সাহায্যে দেখানো হলো।

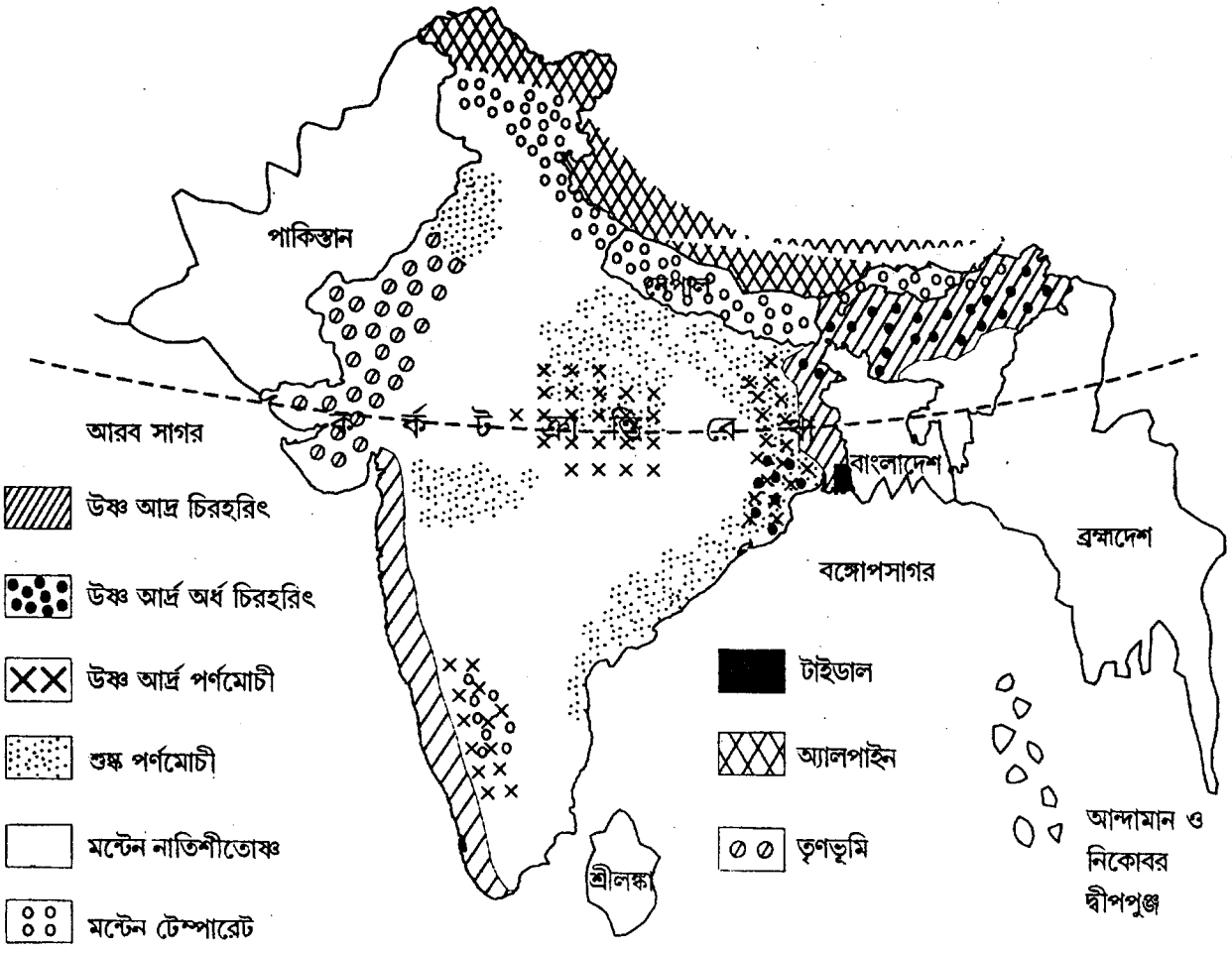

13.5 ভারতের কয়েকটি স্তন্যপায়ী প্রাণী ও পক্ষীর নাম, বাসস্থান ও স্বভাব

ভারতের কয়েকটি স্তন্যপায়ী প্রাণী ও পক্ষীর নাম, তাদের বাসস্থান ও স্বভাব নিম্নে দেখানো হল—

ভারতের কয়েকটি স্তন্যপায়ী প্রাণীর বিবরণ ঃ

নাম	স্থানীয় নাম	বাসস্থান	বৈশিষ্ট্য	স্বভাব
১। হুলক বা গিবন *(Hylobates hoolock)*	উল্লুক	আসামের জঙ্গল	ভারতের একমাত্র এপ্ এখানে পাওয়া যায়। লেজহীন দেহ হাত পায়ের থেকে লম্বা। পুরুষরা কালো এবং স্ত্রীরা হলদেটে ছাই রঙের হয়।	বাবা, মা ও বাচ্চারা একসাথে থাকে। গাছে গাছে ফলমূল খেয়ে বেড়ায়।
২। বনেট ম্যাকাক্ *(Macaca radiata)*	বানর	ভারতের বিভিন্ন জায়গায়—উত্তর ভারত, দক্ষিণ ভারত প্রভৃতি।	লম্বা লেজ যক্ত দেহ, লম্বা লোম মাথার সামনে থেকে সবদিকে ছড়িয়ে গেছে।	একসঙ্গে 20 থেকে 30টা থাকে। গাছে গাছে ফল খেয়ে বেড়ায়।
৩। রেসাস ম্যাকাক্ *(Macaca mulata)*	মর্কট	হিমালয়, আসাম, উত্তর ও মধ্যভারত।	লোমযুক্ত দেহ, লম্বা চুলে সিঁথি ছাড়া মাথার সামনের দিক থেকে বিস্তৃত বেঁটে ও মোটা ধরনের।	বিশাল দল করে এরা গ্রামের আশেপাশে বা শহরে বা মন্দিরে থাকে।
৪। সাধারণ লাদুর *(Presbytis entellus)*	হনুমান	হিমালয়, উত্তর থেকে দক্ষিণভারত।	বিশাল লম্বা লেজ, লম্বা পা, মুখটা কালো।	এরা যেমন হিমালয়ের 12000 ফুট ওপরে থাকতে পারে আবার সমতলেও থাকতে ভালোবাসে। বেশিরভাগ গাছেই থাকে।
৫। স্লোলরিস *(Nycticebus concang)* ম	লজ্জাবতী বানর	আসামের জঙ্গলে ভারতের পূর্ব সীমান্তে, চিটাগাঙ, বার্মাতে পাওয়া যায়।	গোল মাথা ও গোল চোখ বিশিষ্ট পায়ের দ্বিতীয় আঙ্গুলে বাঁকা নখ আছে এবং অন্য আঙ্গুলে মসৃণ নখ আছে।	দিনের বেলা ঘুমিয়ে থাকে। রাতে প্রাণী, ফলমূল, পোকামাকড় খেয়ে জীবনধারণ করে।

নাম	স্থানীয় নাম	বাসস্থান	বৈশিষ্ট্য	স্বভাব
৬। বাঘ *(Panthera tigris)*	বাঘ	হিমালয় থেকে দক্ষিণভারত, রাজস্থানের মরুভূমি থেকে পশ্চিমবঙ্গ, পাঞ্জাব প্রভৃতি জায়গায় পাওয়া যায়।	গায়ে কালো হলুদ চড়া রঙের স্ট্রাইপ। এই প্রজাতির বাঘ আলাদা করে চেনা যায়। হিমালয়ের 10,000 ফুট ওপরেও থাকতে পারে। এছাড়াও সুন্দরবনের কাঁদা মাটিতেও নিজেকে ভালো মানিয়ে নিয়েছে।	তিনটি প্রধান জিনিস এদের জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজন—খাবার, তৃষ্ণা মেটাবার জল ও থাকার জায়গা। হরিণ, নীলগাই, গাউর, মহিষ প্রভৃতিকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। সর্বদা একা থাকতেই পছন্দ করে।
৭। সিংহ *(Panthera leo)*	সিংহ	আফ্রিকার সিংহের থেকে এশিয়ার সিংহের কেশর কম ঘন। রঙ হলুদ বা গাঢ় হলুদ রঙের হয়। লেজের পিছনে লোমের গোছা বর্তমান।	আফ্রিকার সিংহের থেকে এশিয়ার সিংহের কেশর কম ঘন। রঙ হলুদ বা গাঁঢ় হলুদ রঙের হয়। লেজের পিছনে লোমের গোছা আছে।	দলবদ্ধভাবে থাকে। দিনের বেলায় গাছের তলায় শুয়ে থাকে রাত্রে শিকারের খোঁজে বেরোয়। সিংহীরা দলবদ্ধভাবে শিকার করে।
৮। লেপার্ড বা প্যান্থার *(Panthera pardus)*	চিতাবাঘ	সারাদেশেই পাওয়া যায়।	ছোট ছোট লোম যুক্ত উজ্জ্বল রঙের দেহে ছোট ছোট গোলছোপ আছে। সরু লম্বা দেহ।	বড় বড় ছাগল, হরিণ, বাদর থেকে শুরু করে ছোট ছোট জন্তু সবই খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। অনেক সময় জনবসতির কাছে এসে শিকার ধরে।
৯। মাছ খেকো বিড়াল *(Felis viverrina)*	মাছ খেকো বিড়াল	হিমালয়ের পাদদেশে পশ্চিমবঙ্গের উত্তরে ও উত্তর প্রদেশের উত্তর দিকে পাওয়া যায়।	রঙ ধূসর রঙের ছোট ছোট লোমওয়ালা বড়সড় আকৃতি, ছোট লেজ যুক্ত। ছোট পা সমন্বিত শক্তিশালী চেহারা।	গভীর জঙ্গলে এদের বাস। ছোট ছোট পাখী ও মাছ খায়।
১০। ভারতীয় বড় সিভেট *(Viverra zibetha)*	খাটাস	নেপাল, সিকিম, ভুটান, আসাম, উত্তরবঙ্গ প্রভৃতি।	হলুদ বাদামী ছাই রঙের লম্বা দেহ, লম্বা সরু মাথা, পা ছোট, গায়ে ছোপ পরিলক্ষিত হয়।	একা থাকে। ঘন জঙ্গলে এদের বাস। রাত্রে শিকার ধরে। ছোট ছোট জন্তু, পাখী, সাপ, কাঁকড়া ও পোকামাকর খায়।

নাম	স্থানীয় নাম	বাসস্থান	বৈশিষ্ট্য	স্বভাব
১১। সাধারণ মঙ্গুজ *(Herpestis edwardsi)*	নেউল	ভারতবর্ষের প্রায় সব জায়গায় পাওয়া যায়।	লম্বা দেহ, লেজ বিশাল, লোমগুলো একবার হাল্কা একবার গাঢ় হওয়াতে স্ট্রাইপ বলে মনে হয়।	গাছের কোটরে, মাঠে, ঝোপঝাড়ে থাকে। ইঁদুর, ব্যাঙ, পোকা, বিছে, পাখীর ডিম খায়।
১২। নেকড়ে বাঘ *(Cants lupas)*	নেকড়ে	তিব্বত, লাডাক, কাশ্মীরের কিছু অংশে থাকে।	কুকুরের মতো দেখতে বড় মাথা, বালির মতো রঙ। অনেক সময় কালো ছোপ উপস্থিত থাকে।	খোলা জায়গায় থাকতে পছন্দ করে। শীতে গুহার মধ্যে আশ্রয় নেয়। গ্যাজেল, খরগোস ইত্যাদি ধরে খায়।
১৩। ভারতীয় শিয়াল *(Vulpus bengalenots)*	লোমরী	সারা ভারতে পাওয়া যায়।	কুকরের মতো দেখতে। পা গুলি সরু হয়।	ছোট ছোট জন্তু সরীসৃপ প্রভৃতি ধরে খায়। খুবই ধূর্ত স্বভাবের।
১৪। স্লথ বেয়ার *(Melursus ursinus)*	ভালু	আসামে, হিমালয় থেকে শ্রীলঙ্কা পর্যন্ত নানা জঙ্গলে পাওয়া যায়।	মুখটা সামনের দিকে সরু হয়ে গেছে। বড় বড় লোমযুক্ত পাগুলো ছোট। বুক ও নাকের কাছে সাদা ছোপ দেখা যায়।	তৃণভোজী ও মাংশাসী, খুব ছোট পোকা ধরে খায়, মধু অন্যতম প্রিয় খাদ্য।
১৫। সাধারণ ওটার *(Lutra lutra)*	উদ্‌বেড়াল	কাশ্মীর, নেপাল, হিমালয়, আসাম।	সারা গা লোমে ঢাকা।	খুব ঠান্ডা জায়গায়, যেমন— জলাশয়ে থাকে। এক সাথে থাকতে ভালোবাসে।
১৬। হেজহগ্ *(Hemieclinus auritus)*		কচ্ছ ও পাঞ্জাবে দেখতে পাওয়া যায়।	অনেকটা শুয়োরের মতো মুখ। চোখ, কান উন্নত, লেজ ছোট, আঙুলে নখ আছে।	বালিতে বা কাঁটা ঝোপঝাড়ে থাকে। সরীসৃপ ও পোকা ধরে খায়।
১৭। ফ্লাইফক্স *(Pteroups giganteus)*	বাদুড়	সারা ভারত, শ্রীলঙ্কা ও বার্মা।	মুখটা শিয়ালের মতো। মাথাটা লালচে বাদামী। কালো নাক। পা গুলো কালো বর্ণের।	দিনের বেলায় একসঙ্গে অনেককে ঝুলতে দেখা যায়। সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে এরা খাবারের খোঁজে বেরোয়। সাধারণতঃ ফলের রস খায়।

নাম	স্থানীয় নাম	বাসস্থান	বৈশিষ্ট্য	স্বভাব
১৮। রোডেন্ট *(Ratufa indica)*	কাঠবিড়ালী	যারা ভারতের পর্ণমোচী, মিশ্র পর্ণমোচী, আর্দ্র চিরহরিৎ বৃক্ষের অরণ্য অঞ্চলে বসবাস করে।	পিঠের দিক ও লেজের দিকটা ছাই রঙের।	সব সময়ে গাছের ওপরে থাকে। কম সময়ের জন্য মাটিতে আসে। একা একা বা একজোড়া থাকে।
১৯। ভারতীয় পরফুপাইন *(Hylris indica)*	সজারু	হিমালয় থেকে দক্ষিণ ভারত ও শ্রীলঙ্কায়।	সারা গায়ের লোম কাঁটায় পরিণত হয়েছে।	পাহাড়ী এলাকা পছন্দ করে। মাটির তলায় থাকে।
২০। ভারতীয় হাতি *(Elephas maximus)*	হস্তী	তিহার, উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ, হিমালয়, পশ্চিমঘাট পর্বতমালা, মহীশূর।	আফ্রিকার হাতির থেকে এশিয়ার হাতি ছোট। পুরুষদের বিশাল দাঁত (Tusk) বর্তমান। ঠোঁট শুঁড়ে পরিণত হয়েছে।	দলবদ্ধভাবে থাকে। বাঁশ গাছের পাতা খেতে ভালোবাসে। বনের খাবারের অভাব পড়লে কাছাকাছি জনবসতিতে এসে অত্যাচার চালায়।
২১। এশিয়ার বন্য গাধা *(Equis heulionus)*	গর্দভ	গুজরাটের কচ্ছের রণে বসবাস করে।	গাড় বা হাল্কা বাদামী বা ধূসর রঙের। ঘাড়ের কাছে বাদামী রঙের বড় বড় লোম আছে।	অতি নিরীহ জীব। ঘাস আস্তরণ (বট) এদের বিবরণ স্থান। একা, দুটি বা তিনটি একসঙ্গে থাকে।
২২। একশৃঙ্গ গন্ডার *(Rhinoceros unicornis)*	গন্ডার	নেপাল, পশ্চিমবঙ্গ, ডুয়ার্স ও আসামে বসবাস করে।	চামড়া খুব পুরু।	জলা জায়গা পছন্দ করে। একা থাকতে ভালোবাসে। ঘাসপাতা খায়।
২৩। ভারতীয় বাইসন *(Bos gaurus)*	গাউর	পশ্চিমঘাট ও মহারাষ্ট্রের পাহাড়ী এলাকা।	বিশাল মাথা, বিশাল চেহারা।	পাহাড়ী অঞ্চলের বাসিন্দা। ঘাস খেতে সমতলে নেমে আসে। গাছের ছালও খায়।
২৪। এ্যান্টিলোপ ভারতীয় গ্যাভোল *(Gazella gazella)*	চিংকারা	উত্তর পশ্চিম ও মধ্য ভারতে পাওয়া যায়।	উজ্জ্বল হলুদ রঙের সুন্দর দেখতে। পুরুষদের শিং দুটো সোজা "S" অক্ষরের মতো। 15-25 টি আংটির মতো অংশ দিয়ে জোড়া থাকে।	জল না খেয়ে অনেকদিন থাকতে পারে। নদীর চরে অল্প ঝোপ ঝাড় সমন্বিত এলাকা এদের বিচরণ ক্ষেত্র। বিভিন্ন রকম পাতা, শস্য ও ফল খায়

নাম	স্থানীয় নাম	বাসস্থান	বৈশিষ্ট্য	স্বভাব
২৫। ব্লু বুল *(Boselaphus tragocaucelus)*	নীলগাই	হিমালয় থেকে মহীশূর পর্যন্ত এদের পাওয়া যায়। এছাড়া পূর্ববঙ্গেও এদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।	অনেকটা ঘোড়ার মতো দেখতে। ছাই রঙের। ঠোঁটের কাছে, চিবুক ও কানের মধ্যে সাদা বর্ণ পরিলক্ষিত হয়।	নিরীহ গভীর জঙ্গলের প্রাণী
২৬। স্পটেড ডিয়ার *(Axix axix)*	চিতল	সারা ভারতে পাওয়া যায়।	ভীষণ সুন্দর দেখতে। গায়ের মধ্যে ছোপ ছোপ দাগ আছে।	10 থেকে 30 টা একসঙ্গে থাকে।
২৭। প্যাঙ্গেলিন *(Manis Crassicudata)*	বাজরা কীট	পাহাড়ী জায়গায়, হিমালয় ও আসামে দেখতে পাওয়া যায়।	সারা গায়ে আঁশ আছে।	পিপঁড়ে, উইপোকা ও তাদের ডিম খায়।
২৮। হিমালয়ান মাস্ক ডিয়ার *(Moschus moschiferus)*	হিমালয়ের কস্তুরী	কাশ্মীর, সিকিম এবং নেপাল।	পুরুষদের ছেদক দন্ড বড় হয়। এবং উদরের চর্মের নীচে গোলাকার কস্তুরী বর্তমান।	অত্যন্ত নিরীহ জীব ও সুন্দর স্বভাবের হয়।
২৯। থ্যামিন হরিণ *(Corvuseldi eldi)*	মৃগ	মনিপুরের সব জলাভূমি।	পুরুষের অ্যান্টিলারের আকৃতি ধনুকের মত বেঁকে 'C' আকৃতি লাভ করে।	জলজ উদ্ভিদ খেতে ভালোবাসে।
৩০। নীলগিরি থর *(Hemitragus hylocrius)*	থামিন থর	নীলগিরির পার্বত্য অঞ্চল	ক্ষুদ্রদেহ বিশিষ্ট বন্য ছাগল।	বন্য মাংসাশী প্রাণীর খাদক।

ভারতের কয়েকটি পাখীর বিবরণ ঃ

নাম	স্থানীয় নাম	বাসস্থান	বৈশিষ্ট্য	স্বভাব
১। ছোট গ্রেব বা ভাবচিক্ (Tachybaptus rufico!lis)	পানডুবি	ভারতের সর্বত্র এদের পাওয়া যায়।	ছোট কালো পায়রার মতো। গলা সরু হয়।	হাঁসের মতো জলে ভেসে থাকে। ডুব মেরে গুগলি প্রভৃতি খায়।
২। গ্রেহেরন (Ardia civeria)	সাদা কাঁক	সারা ভারতে পাওয়া যায়।	গায়ের রঙ ধূসরাভ। মাথার টিকির মতো কালো পালক আছে। হলুদ রঙের ঠোঁটটি পুরু।	একা থাকে। মাছ, শামুক, গুগলি খায়।
৩। ছোট এগ্রেট (Egretta garzetta)	ছোট কোচে বক	সারা ভারতে পাওয়া যায়।	প্রজনন ঋতুতে পুরুষ বকের মাথা ও পিঠে বাহারী লম্বা সাদা পালক আছে। ঠোঁট ও পায়ের রঙ কালো।	দলবদ্ধভাবে শিকারের খোঁজ করে। ব্যাঙ ও পোকামাকড় খায়।
৪। এ্যাডজুট্যান্ট স্টর্ক (Leptoptilos dubius)	হাড়গিলে	উত্তর ও উত্তর-পূর্ব ভারতে পাওয়া যায়।	সব থেকে বড় স্টর্ক, ময়লাটে ছাই রঙের দেহে হলুদ মাথাটি নেড়া। ঠোঁট বিশাল ও শক্ত।	মাছ, ব্যাঙ, সরীসৃপ থেকে শুরু করে জীবজন্তুর মৃতদেহ সবই খায়।
৫। লেসার হুইসলিংটিল (Dendrocygua javanica)	সরাল	সারা ভারতে পাওয়া যায়।	গায়ের রঙ বাদামী, ঠোঁট ছোট ও কালো।	দলবদ্ধভাবে উড়তে উড়তে শিসের মতো শব্দ করে। শামুক ও পোকামাকড় খায়।
৬। পারিয়া কাইট (Milvis migraus)	চিল	সারা ভারতে পাওয়া যায়।	লেজ দ্বিধাবিভক্ত ও বড় চেহারা বিশিষ্ট হয়।	ছোটপাখী, মরা ইঁদুর ও জঞ্জালের মধ্যে পড়ে থাকা মৃতদেহ খায়।
৭। ভারতীয় ভালচার (Gpys bengalensis)	শকুন	সারা ভারতে পাওয়া যায়।	কালচে বাদামী রঙের দেহ, মাথা পালক বিহীন।	মৃতদেহ খায়।

নাম	স্থানীয় নাম	বাসস্থান	বৈশিষ্ট্য	স্বভাব
৮। কোয়েল (Endynaulys scolopacea)	কোকিল	সারা ভারতে পাওয়া যায়।	কাকের মতো দেখতে, হাল্কা শরীর ও চোখ লাল।	কাকের বাসায় ডিম পাড়ে। বসন্তকালে সুন্দরভাবে ডাকে।
৯। পিগমী কাঠঠোকরা (Picoides canicapillus)	ক্ষুদে কাঠঠোক্‌রা	সারা ভারতে পাওয়া যায়।	চড়ুই পাখীর থেকে ছোট, সারা গায়ে সাদাকালো ডোরাকাটা, মাথার ওপরের অংশ খয়েরী টুপীর মতো।	গাছের গুঁড়িতে গর্ত করে বাসা বানায়। একা বা জোড়ায় থাকে।
১০। গোল্ডেন ওরিয়ল্ (Oriolus oriolus)	সোনাবউ	উত্তর-পূর্ব ভারত ছাড়া সারা ভারতে পাওয়া যায়।	দেহ উজ্জ্বল, হলুদ রঙের ডানা থেকে লেজের ওপরিভাগ পর্যন্ত কালো। ঠোঁট লাল।	ফল ও ফুলের মধু প্রধান খাদ্য। জোড়ায় জোড়ায় থাকে।

13.6 ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে প্রধানতম প্রাণী, পক্ষী ও বৃক্ষের নাম

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে প্রধানতম প্রাণী, পক্ষী ও বৃক্ষের নাম নিচের সারণীতে দেখানো হল—

রাজ্য	স্তন্য পায়ী প্রাণী	পক্ষী	বৃক্ষ
১। অন্ধ্রপ্রদেশ	চারশৃঙ্গের অ্যান্টিলোপ	গ্রেপেলিকান	রেড স্যানডারস্
২। আসাম	একশৃঙ্গ গন্ডার	সাদাপাখার উড়্ডাক	বাঁশ
৩। বিহার	স্লথ বিয়ার	নাক্‌টা	মহুয়া
৪। গুজরাট	এশিয়ান সিংহ	ফ্লেমিংগো	নিম্
৫। হরিয়ানা	নীলগাই	ব্ল্যাক প্যাট্রিজ	বাকুল

রাজ্য	স্তন্য পায়ী প্রাণী	পক্ষী	বৃক্ষ
৬। হিমালচল প্রদেশ	মাস্ক ডিয়ার	মোনাল ফেজান্ট	দেওদর
৭। জম্মু ও কাশ্মীর	কাশ্মীরি স্ট্যাগ	ওয়েষ্টান ট্যাগোপান	চেষ্টনাট
৮। কর্ণাটক	লরিস	গ্রেটপাইড হর্নবিল	স্যান্ডাল (চন্দন)
৯। কেরালা	লায়নটেল্‌ড ম্যাকাক্‌	লার্জ র‍্যাকেট	রোজউড
১০। মধ্যপ্রদেশ	বারাসিদা	প্যারাডাইস ফ্লাইক্যাচার	কলা
১১। মহারাষ্ট্র	গাউর	গ্রে জঙ্গল ফাউল	টিক্‌
১২। মণিপুর	থামিন	হিউমিস্‌ বারব্যাক্‌ড ফেজাল্ট	টুন
১৩। নাগাল্যান্ড	ক্লাউডেড লেপার্ড	ইমপেরিয়াল পিজিয়ন	অ্যারিকো নাট্‌
১৪। উড়িষ্যা	সাম্বার	ব্লুজয়	টেনডু
১৫। পঞ্জাব	কৃষ্ণসার	হুপো	শিশাম্‌
১৬। রাজস্থান	গ্যাজেল	গ্রেট ইন্ডিয়ান বাস্টার্ড	খেজুরি
১৭। সিকিম	রেডপান্ডা	ব্লাড ফ্লেসান্ট	রডেনড্রন
১৮। তামিলনাড়ু	নীলগিরি থর	স্পুনবিল	ট্যামারিন্ড
১৯। উত্তরপ্রদেশ	চিতাবাঘ	সেরাসক্রেন	শাল

13.7 সারাংশ

বন্যপ্রাণী ও তাদের বাসস্তান সম্পর্কিত পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে আমরা গোটা পৃথিবীর এবং বিশেষত ভারতবর্ষের বন্যপ্রাণী অঞ্চল, বনভূমি, ভূপ্রাকৃতিক অবস্থান এবং বিশেষ বিশেষ বন্যপ্রাণীদের সম্পর্কে বিশদ্ ধারণা পেয়েছি। এ ধরনের পাঠ থেকে সাধারণভাবে বন্যপ্রাণী, তাদের বাস্তুসংস্থান, স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যের বৈজ্ঞানিক সম্পর্ক সম্বন্ধে গঠিত জ্ঞানলাভ তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা এবং বৃদ্ধি করার পক্ষে একটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ।

13.8 প্রশ্নাবলী

1. সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

(a) আমাদের জীবনে বন্যপ্রাণীর প্রয়োজনীয়তা কি কি?

(b) সাভানা ক্রান্তীয় তৃণভূমি অঞ্চলে কি কি প্রাণী দেখতে পাওয়া যায়?

(c) চ্যাপারাল কি? কোথায় দেখতে পাওয়া যায়?

(d) তায়গা ও তুন্দ্রা অঞ্চলে কিরকম জলবায়ু ও উদ্ভিদ দেখতে পাওয়া যায়?

(e) টাইডাল অরণ্যের বৈশিষ্ট্য কি কি?

(f) সাধারণ লাঙ্গুরের বৈজ্ঞানিক নাম কি ও কোথায় দেখতে পাওয়া যায়?

(g) সাধারণ মঙ্গুঁজের বৈজ্ঞানিক নাম কি ও স্বভাব কি রকম?

2. শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

(a) হাতির বৈজ্ঞানিক নাম হলো _____।

(b) নেকড়ে বাঘের বাসস্থানগুলি হলো _____।

(c) হরিয়ানার প্রধান স্তন্যপায়ী প্রাণীর নাম _____।

(d) অ্যালপাইন বনভূমির গাছগুলির মধ্যে অন্যতম হল _____।

(e) তুন্দ্রা অঞ্চলের বন্য প্রাণীগুলির মধ্যে অন্যতম হল _____।

(f) গুজরাট ও রাজস্থানে দেখা যায় এমন পাখীটি হলো _____।

(g) দাহ্য রাবিশের মধ্যে _____ উল্লেখযোগ্য।

(h) আর্সেনিক _____ রোগের সৃষ্টি করে।

(i) শব্দ দূষণের ফলে _____ রোগের সৃষ্টি হয়।

(j) একটি জলে দ্রবণীয় বর্জ্য পদার্থের নাম _____।

3. নিম্নে প্রদত্ত সারি দুটির প্রশ্ন ও উত্তরগুলিকে একে অপরের সাথে মিলিত করুন।

সারি 'ক'	সারি 'খ'
১। মৌসুমী অরণ্য	(a) অ্যাকামিয়া, টেকটোনা
২। মন্টেনটেম্পারেট অরণ্য	(b) স্লথ বিয়ার
৩। *Melursus ursinus*	(c) বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত
৪। মাছখেকো বিড়াল	(d) কাশ্মীরি স্ট্যাগ

৫। শুষ্কপর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্য

(e) গভীর জঙ্গলে বাস, ছোট ছোট পাখী ও মাছ ধরে খায়।

4. **দীর্ঘ উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ**

(a) বন্যপ্রাণী কাকে বলে? তার প্রয়োজনীয়তা কি কি?

(b) ভারতের বিভিন্ন বনভূমি অঞ্চল, তার বৈশিষ্ট্য ও প্রাপ্ত প্রাণীগুলির নাম লিখ।

(c) নিম্নলিখিত প্রাণীগুলির স্থানীয় নাম কি? তাদের বাসস্থান ও স্বভাবের একটা বিবরণ দাও।

(ক) *Panthera tigris,* (খ) *Equus hemionus,* (গ) *Hytrix indica,* (ঘ) *Axis axis.*

13.9 উত্তরমালা

অনুশীলনী 1

(a) — 13.3

(b) — 13.4

(c) — 13.4

(d) — 13.4

(e) — 13.5

(f) — 13.5

(g) — 13.5

(h) — 13.5

অনুশীলনী 2

(a) — *Elephs maximus*

(b) — তিব্বত, লাডাক

(c) — নীলগাই

(d) — সেডাম প্রাইমিউলা

(e) — বল্গাহরিণ, ক্যারিবু

(f) — গ্রেট ইন্ডিয়ান বাস্টার্ড

অনুশীলনী 3

(1) — C

(2) — D

(3) — B

(4) — E

(5) — A

অনুশীলনী 4

(a) — 13.3

(b) — 13.3

(c) — 13.6

একক 14 ❑ সংরক্ষণ সম্বন্ধে ধারণা

গঠন

14.1 প্রস্তাবনা

উদ্দেশ্য

14.2 সংজ্ঞা

14.3 সংরক্ষণের কারণ

14.4 সংরক্ষণের প্রকারভেদ

14.4.1 মৃত্তিকা সংরক্ষণ

14.4.2 জল সংরক্ষণ

14.4.3 অরণ্যভূমি সংরক্ষণ

14.4.4 জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ

14.4.5 ভারতের বিভিন্ন প্রাণী ও উদ্ভিদ প্রজাতির অবলুপ্তির কারণ

14.5 ভারতীয় বন্যপ্রাণী বোর্ড ও তার কাজ

14.5.1 সংরক্ষণের দায়িত্বে ভারতের কয়েকটি বেসরকারি ও সরকারি সংস্থা

14.5.2 ভারতের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের পদ্ধতি

14.5.3 ভারতের বিভিন্ন রাজ্য ও সেইসব রাজ্যে অবস্থিত কয়েকটি জাতীয় পার্ক স্যাংচুয়ারি, সংরক্ষিত বন, বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভের তালিকা

14.5.4 আমাদের দেশের জাতীয় পার্ক, স্যাংচুয়ারি, সংরক্ষিণত বন ও বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভের তুলনামূলক আলোচনা

14.5.5 বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভের বর্ণনা

14.5.6 ভারতবর্ষের সংরক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত কয়েকটি প্রকল্পের বর্ণনা

14.5.7 ভারতের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য জাতীয় পার্ক, স্যাংচুয়ারির বর্ণনা

14.6 বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইনে (১৯৭২) প্রাণীদের সিডিউল অন্তর্ভুক্তির তালিকার উদাহরণ

14.7 ভারতের কয়েকটি লুপ্তপ্রায় উদ্ভিদ প্রজাতির বিজ্ঞান সম্মত নাম

14.8 IUCN Red List (লাল তালিকার) বৈশিষ্ট্যসমূহ

14.9 সারাংশ

14.10 প্রশ্নাবলী

14.11 উত্তরমালা

14.1 প্রস্তাবনা ও উদ্দেশ্য

প্রস্তাবনা

পরিবেশের অবক্ষয় এবং তার সর্বগ্রাসী ধ্বংস সম্পর্কে পৃথিবীজুড়ে আলোচনা সংঘটিত হয়ে চলেছে। পরিবেশের নানা উপাদান, তা সে জৈব বা অজৈব যাই হোক না কেন, ধ্বংসের করাল গ্রাস থেকে আজ মুক্ত নয়। জল, মৃত্তিকা, বায়ু, জীব—সবার সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা তাই আজ অনস্বীকার্য। কেন সংরক্ষণ হবে—তা নয় বরং আজকের জিজ্ঞাসা কিভাবে সংরক্ষণ করা হবে? তাই সংরক্ষণের খুঁটিনাটি বিষয়ে আমাদের বহুবিধ প্রশ্নের উত্তর আছে তার কারণের মধ্যেই। আন্তর্জাতিক ও জাতীয় স্তরে বহু ভাবনা ও আলোচনা হচ্ছে সংরক্ষণ বিষয়ে এবং এটাও সত্য যে সাম্প্রতিক কালে দুনিয়া জুড়ে সংরক্ষণ সম্পর্কে সচেতনতা বেড়েছে এবং শুধুই উন্নয়নের নামে ধ্বংস না করে এ বরং উন্নয়নের পথেই সভ্যতার গতিপথ চালিত হচ্ছে।

উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন—

- কেন সংরক্ষণ করা প্রয়োজন সে সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা।
- কি কি পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা হয় সে সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা।
- সংরক্ষণের বর্তমান অবস্থা ঠিক কি তা জানা।
- কোন কোন ক্ষেত্রে সংরক্ষণ করে বেশি সফল হওয়া গেছে সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা।

14.2 সংজ্ঞা

বিভিন্ন পদ্ধতিতে অজৈব (যেমন, মাটি, জল প্রভৃতি) বা জৈব সম্পদের সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ, বৃদ্ধি এবং বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনাকেই সংরক্ষণ বলে।

14.3 সংরক্ষণের কারণ

১। বহু উদ্ভিদ ও প্রাণী বিলুপ্ত, কিছু কিছু উদ্ভিদ ও প্রাণী বিলুপ্তির পথে, তাই এদের সংরক্ষণ জরুরি।

২। বাস্তুতন্ত্রের উপাদানগুলিকে (জৈব ও অজৈব) যথাযথভাবে পরিবেশে রক্ষণ করা।

৩। প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার থেকে পরিবেশকে বাঁচানো।

৪। আমাদের বংশধররা যাতে পরিবেশের উপাদান সমূহকে নির্দিষ্ট স্থানেই পায়, তার জন্য সংরক্ষণ প্রয়োজন।

৫। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করা।

৬। বাস্তুতন্ত্র ও বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণী ও উদ্ভিদের ব্যবহার এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে যে সেই সম্পদগুলি যেন ফুরিয়ে না যায়।

14.4 সংরক্ষণের প্রকারভেদ

বিভিন্ন প্রকার সংরক্ষণের কারণ ও সংরক্ষণ পদ্ধতি নিয়ে দেখানো হলো—

সংরক্ষণের নাম	সংরক্ষণের কারণ	সংরক্ষণ পদ্ধতি
14.4.1 মৃত্তিকা সংরক্ষণ	মৃত্তিকার গুণাগুণের ওপরে উদ্ভিদের বৃদ্ধি নির্ভর করে। পরোক্ষভাবে এটি উদ্ভিদ সংরক্ষণ করে।	১। বিভিন্ন শস্যের আবর্তন প্রথায় চাষ। ২। খোলা জমিতে বৃক্ষরোপণ। ৩। জমিতে বিভিন্ন জৈবসার প্রয়োগ।
14.4.2 জল সংরক্ষণ	আমাদের মতো কৃষি নির্ভর দেশে সারা বছর চাষ হয়। বৃষ্টিপাতে যখন কম হয় সেই সময় যাতে চাষের কোনো ক্ষতি না হয় তার জন্যই প্রধান জলসংরক্ষণ প্রয়োজন।	১। নদীতে বাঁধ নির্মাণ করে ২। লাঙ্গল দিয়ে জমির মাটি শিথিল করে। ৩। অধিক বৃষ্টির সময় জল ধরে রেখে। ৪। আগাছা নির্মূলকরণ করে জল সংরক্ষণ করা যায়।

14.4.3 অরণ্যভূমি সংরক্ষণ

আয়তন	সংরক্ষণের কারণ	বর্ণনা	পদ্ধতি
বিশ্বের অরণ্যভূমির আয়তন 1900 সালে 7000 মেগাহেক্টার 1975 সালে 2890 মেগাহেক্টার 2000 সালে 2370 মেগাহেক্টার ভারতের কেন্দ্রীয় অরণ্য কমিশনের রিপোর্ট থেকে নিম্নলিখিত তথ্যগুলি জানা যায়। অরণ্য — 22.7% ক্রান্তীয় পর্ণমোচী — 38.7% আর্দ্র পর্ণমোচী — 30.9% ক্রান্তীয় তৃণ — 6.9% টিক অরণ্য — 13% সাল অরণ্য — 16% ক্রান্তীয় শুষ্ক চিরহরিৎ — 0.1% (তথ্য ঃ CFC, 1980)	১। সারা বিশ্বের অর্থনীতির একটি বিশেষ জায়গা দখল করে আছে। পরোক্ষভাবে বলা যায় অর্থনৈতিক ক্ষতির হাত থেকে দেশকে রক্ষা করা। ২। অরণ্য দূষণ রোধ করে। ৩। বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইড (CO_2) ও অক্সিজেনের (O_2) ভারসাম্য রক্ষা করে। ৪। ভূমিক্ষয় রোধ করে। ৫। স্থানীয় বৃষ্টিপাত ঘটাতে সাহায্য করে। ৬। ভূমির উর্বরতাকে ধরে রাখে। ৭। তাপমাত্রা ও জলচক্র নিয়ন্ত্রণ করে।	অরণ্যভূমিকে ঘিরে অনেক শিল্প কারখানা গড়ে উঠেছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, কাঠ, জ্বালানি, আসবাবপত্র ইত্যাদি। ফার্ন, গাম, রেসিন, ডাই, ট্যানিন বিভিন্ন রকম তন্তু ও ওষুধপত্র ইত্যাদি। আমাদের দেশের বনভূমির মধ্যে সরকার নিয়ন্ত্রিত 96%, শিল্পপতি নিয়ন্ত্রিত 2.6%, নিজস্ব সম্পত্তি 1.2%।	১। 1978 সালের ডিসেম্বরে উত্তরাখন্ডের বিনয়ী নায়ক ট্রাইবাল প্রজাতির স্ত্রীলোকেরা চিপকো আন্দোলন শুরু করে। সুন্দরলাল বহুগুণার নেতৃত্বে সংঘটিত এই ঘটনার প্রধান উদ্দেশ্য ছিলো প্রধানত হিমালয়ের পাদদেশের অরণ্যভূমিকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানো। ২। অরণ্য সংরক্ষণের ব্যাপারে— International Union for the conservation of Nature and Natural resources (1948) এর পদ্ধতিগুলি হলো— ক। জমি উদ্ধার ও তাতে গাছ লাগানো। খ। আইনের মাধ্যমে পরিণত গাছ কাটার নিয়ম। গ। অপরিণত গাছ কাটার জন্য শাস্তি। ঘ। 1টি গাছ কাটলে অন্তত 10টি চারা রোপণ করতে হবে। ঙ। চোরা শিকারী ও অসাধু ব্যবসায়ীদের উচিৎ শাস্তি দেওয়া।

অরণ্য সংরক্ষণ	পদ্ধতি
• 1952 সালে জাতীয় অরণ্য বিমাপত্রে (National forest policy) বলা ছিলো দেশের এক তৃতীয়াংশ ভৌগোলিক অঞ্চল অরণ্য ভূমির মধ্যে পড়বে। • আঞ্চলিক অফিস স্থাপন • পরিবেশ সংরক্ষণ কাউন্সিল স্থাপন • আন্তর্জাতিক সংরক্ষণ কৌশল (World Conservation Strategy) ও জাতীয় সংরক্ষণ কৌশল (National Conservation 1980 তে Strategy) সংঘটিত হয়েছে। এটি নিম্নলিখিত তিনটি সংস্থার সহায়তায় গঠিত। ১। International union of conservation of Nature and Natural resources (IUCN) ২। World wild life fund (WWF) ৩। UN Environmental programme (UNEP)	• অরণ্য সংরক্ষণ আইন (1980) তে বলা হয়। ১। কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি ছাড়া রাজ্য সরকার নিজে বা কোনো সংস্থাকে ব্যবহারের জন্য অরণ্যভূমি দিতে পারবে না। ২। কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি ছাড়া কোনো অরণ্যের কোনো অংশের গাছ কাটা চলবে না। ৩। অনুমতি ছাড়া কোনো গাছ কাটা হলে 'বিভাগ ২' (Section 2) ধারার আইন অনুসারে শাস্তি বা জরিমানা হবে। • ভারতের ছয়টি বিভিন্ন শহরে যেমন—ব্যাঙ্গালোর, ভূপাল, ভুবনেশ্বর, লক্ষ্ণৌ, শিলং এবং চন্ডীগড়ে আঞ্চলিক অফিসগুলির অরণ্য ও বন্যপ্রাণী দেখাশুনার জন্য খোলা আছে। • কেন্দ্রীয় সরকারি সহায়তায় 14টি শহরে ও 3টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিবেশ সংরক্ষণ কাউন্সিল গঠিত হয়েছে। • 1972 সালে স্টকহোমে আয়োজিত আন্তর্জাতিক জাতি সংঘ সম্মেলনে আন্তর্জাতিক স্তরে পরিবেশ নিয়ে আলোচনার উদ্দেশ্যগুলি নিম্নরূপ— ১। পরিবেশ সংরক্ষণ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ। ২। আন্তর্জাতিক স্তরে যে সমস্ত জায়গাগুলিতে পরিবেশের বহুল ক্ষতি সাধিত হয়েছে সেগুলিতে চিহ্নিত করা। ৩। সংরক্ষণের বিভিন্ন উদ্দেশ্যগুলোকে উল্লেখ করা। ৪। বিভিন্ন দেশে জাতীয় সংরক্ষণ কৌশল স্থাপন করে পরিবেশ রক্ষার চেষ্টা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, এরই ফলশ্রুতি হিসাবে বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ তৈরি হয়েছে।

14.4.4 জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও পদ্ধতি

জীববৈচিত্র্যের ব্যবহার	বর্ণনা	সনাক্তকরণ হয়েছে এমন প্রজাতির সংখ্যা
১। খাদ্য ২। ঔষধশিল্প ৩। ইকোসিস্টেম পরিষেবা ৪। জৈব প্রযুক্তি ৫। পরিবেশের গুণগতমান বজায় রাখা। ৬। গৃহপালিত পশুচর্চা ৭। ঘরবাড়ি তৈরির সামগ্রী ৮। জ্বালানি ৯। অন্যান্য ব্যবহার	পৃথিবীর পঁচিশটি ইকোলজিক্যাল হট স্পটের মধ্যে (মেয়ারস 2000) দুটি ভারতের পশ্চিমঘাট ও উত্তরপূর্ব হিমালয় অঞ্চলে অবস্থিত। প্রাণী ও উদ্ভিদ বৈচিত্র্যে ভারতবর্ষের স্থান নিচে দেওয়া হল। স্তন্যপায়ী ঃ প্রথম ইন্দোনেশিয়া প্রজাতি 515 ষষ্ঠ ভারত „ 372 পাখী ঃ প্রথম কলম্বিয়া „ 1921 অষ্টম ভারত „ 1200 সরীসৃপ ঃ প্রথম মেক্সিকো „ 719 ষষ্ঠ ভারত „ 353 উভচর ঃ প্রথম ব্রাজিল „ 516 প্রথম দশে ভারত নেই প্রজাপতি ঃ প্রথম ইন্দোনেশিয়া 121 তৃতীয় ভারত 77 অ্যানজিওস্পার্ম ঃ প্রথম ব্রাজিল 55,000 নবম ভারত 15,000	উদ্ভিদ — 3,00,000 — 20% মেরুদন্ডী — 40,000 — 3% পতঙ্গ — 4,00,000 —53% অনুজীব — 3,60,000 —24 %

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের প্রকারভেদ	বর্ণনা
১। **ইনসিটু সংরক্ষণ** জৈব সম্পদের সংরক্ষণগত ফলিত গবেষণা, উদ্ভিদ ও প্রাণী সম্পর্ক নির্ধারণ জীবদের পরিমাণগত ও গুণগতমান সম্পর্কে ধারণা, আবহাওয়ার জীবদের ওপর প্রভাব। ২। এক্স সিটু সংরক্ষণ চিড়িয়াখানা, বটানিকাল গার্ডেন, টিস্যু কালচার, জিন ব্যাঙ্ক, ইন ভিট্রো সংরক্ষণ, স্পার্ম ব্যাঙ্ক ইত্যাদি।	● জীববৈচিত্র্য সম্পর্কিত অন্তর্নিহিত ধারণা থাকাটা একান্ত জরুরি। ● জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ সমস্ত মনুষ্য সমাজের অধিকার বা দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। ● জীববৈচিত্র্যের ওপর দেশের সার্বভৌম অধিকার আছে। ● জীববৈচিত্র্যের ব্যবহার হতে হবে টেকসই উন্নয়নের ধারকে অবিকৃত রেখে। ● জীববৈচিত্র্য সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক, কারিগরি ও প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান বাড়ানো একান্ত প্রয়োজন। ● জীববৈচিত্র্যের হ্রাসকারী কারণগুলি সম্পর্কে আরো সজাগ হতে হবে। ● দেশের মানুষের স্থানীয় ও প্রথাগত জীববৈচিত্র্য সম্পর্কিত জ্ঞানকে স্বীকৃতি দিতে হবে। ● জীববৈচিত্র্য রক্ষার ব্যাপারে সর্বস্তরে মহিলাদের ভূমিকাকে স্বীকৃতি দিতে হবে। ● বর্তমান ও আগামী প্রজন্মকে জীববৈচিত্র্যের সমস্ত সুফল টেকসই উন্নয়নের ধারায় পৌঁছে দিতে হবে।

14.4.5 ভারতের বিভিন্ন প্রাণী ও উদ্ভিদ প্রজাতির অবলুপ্তির কারণ

ভারতের বিভিন্ন প্রাণী ও উদ্ভিদ প্রজাতির অবলুপ্তির কারণগুলি নিম্নে বর্ণিত হলো—

১। কৃষি, সভ্যতা ও শিল্পের উন্নতির সাথে সাথে বন্যপ্রাণী ও উদ্ভিদের প্রাকৃতিক স্বভাবিক বাসস্থান ধ্বংস করা।

২। গৃহপালিত গবাদি পশুর চারণভূমি বেড়ে যাওয়ার ফলে কিছু কিছু স্থান মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে যা পশুপাখীর বাসস্থানের অযোগ্য।

৩। বিভিন্ন পশুর মাংস, চামড়া, লোম, হাতীর দাঁত, গন্ডারের শৃঙ্গ প্রভৃতি বিক্রি করার জন মানুষ অবলিলাক্রমে পশুসংহার করে চলেছে।

৪। কিছু কিছু মূল্যবান প্রাণী ও উদ্ভিদ আমাদের দেশে থেকে বিদেশে রপ্তানীর ফলে বহু প্রাণীর ও উদ্ভিদ প্রজাতির সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে।

14.5 ভারতীয় বন্যপ্রাণী বোর্ড ও তার কাজ

বর্ণনা	কাজ
জাতীয় স্তরে দেশের জনসাধারণের মনে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ সংক্রান্ত চেতনার উন্মেষ মোটামুটিভাবে স্বাধীনতার পরেই ঘটেছে। ফলে 1962 সালে তৈরি হয়েছে সেন্ট্রাল বোর্ড অফ্ ওয়াইল্ড লাইফ। পরবর্তীকালে এরই নামকরণ হয়েছে ভারতীয় বন্যপ্রাণী বোর্ড। এখন বিভিন্ন রাজ্যে তৈরি হয়েছে রাজ্য বন্যপ্রাণী বোর্ড (State wild life board)	১। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে দায়িত্ব দিয়ে বন্যপ্রাণী সংহার পুরোপুরি নিষিদ্ধ করা। ২। রাজ্য সরকারকে বিভিন্ন জাতীয় পার্ক, স্যাংচুয়ারি এবং চিড়িয়াখানা তৈরির ব্যবস্থা করতে বলা। ৩। জীবন্ত প্রাণী, তাদের চামড়া, ফার, পালক, শিং, দাত প্রভৃতি মূল্যবান অঙ্গ যাতে বিদেশে রপ্তানী না হয় তার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া। ৪। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের কাজ পর্যালোচনা করা এবং অন্যান্যভাবে ঐ সকল বন্য প্রাণীর উন্নতিসাধন করা। ৫। জনসাধারণ যাতে বন্যপ্রাণী সম্বন্ধে নানা জ্ঞান লাভ করে এবং তাদের গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয় তার ব্যবস্থা করা। ৬। বিভিন্ন কাজে দায়িত্বভার বহন করার জন বন্যপ্রাণী সোসাইটি তৈরি করা ইত্যাদি।

14.5.1 সংরক্ষণের দায়িত্বে ভারতের কয়েকটি বেসরকারি ও সরকারি সংস্থা

বেসরকারি সংস্থা

প্রতিষ্ঠানের নাম	স্থাপনকাল	কাজ
১। বম্বে ন্যাচারাল হিস্ট্রি সোসাইটি	1883 সালে	ভারত, বার্মা ও শ্রীলঙ্কার বিভিন্ন প্রাণী ও উদ্ভিদ প্রজাতি সম্পর্কে জ্ঞান।
২। ওয়াইল্ড লাইফ প্রিসারভেশন সোসাইটি অফ্ ইন্ডিয়া	1958 সালে (দেরাদুনে)	বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নানা তথ্য সংগ্রহ করা ও তা পরিবেশন করা।
৩। ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ড লাইফ ফান্ড ফর নেচার ইন্ডিয়া	1969 সালে (প্রধান অফিস মুম্বাই)	প্রথম সুইজারল্যান্ডের মার্গোসে ৪টি ট্রাস্টি বোর্ড নিয়ে তৈরি হয়। এটি সংরক্ষণের কাজে নানাপ্রকার অর্থনৈতিক সাহায্য করে।

সরকারি প্রতিষ্ঠান ঃ

প্রতিষ্ঠানের নাম	স্থাপনকাল	প্রতিষ্ঠানের নাম	স্থাপনকাল
১। বন্য হাতি সংরক্ষণ আইন	1873	১। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন	1972
২। বন্যপক্ষী ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন	1912	২। ভারতবর্ষে 'CITIES' এর অন্তর্ভুক্ত হলো (আন্তর্জাতিক স্তরে বিলুপ্তিকরণ প্রাণী প্রজাতি রক্ষণাবেক্ষণ সংস্থা)	1976
৩। আসাম গন্ডার সংরক্ষণ আইন	1954	৩। কুমীর, সিংহ ও ব্রাঘ্রপ্রকল্প স্থাপন	1954, 1972, 1973
		৭। ভারতীয় বন্যপ্রাণী বোর্ডের (IBWL) সহায়তায় ন্যাশনাল ওয়াইল্ডলাইফ অ্যাকশান প্ল্যান	1982

14.5.2 ভারতের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ

১। বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ছাড়াও কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারি বহু প্রতিষ্ঠান বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের কাজে এগিয়ে এসেছে।

২। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের কাজে পরিবেশমন্ত্রক তৈরি হয়েছে।

৩। পরিবেশ সংরক্ষণ আইন প্রনোয়নের মাধ্যমে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধিত হচ্ছে।

৪। বিভিন্ন প্রাণী বা উদ্ভিদের প্রাকৃতিক বাসস্থান রক্ষা ও বিভিন্ন প্রাণী বা উদ্ভিদ প্রজাতির নিয়ন্ত্রত ও সীমত ব্যবহার।

৫। বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণীকে বিভিন্ন সংরক্ষণ স্থানে রাখার ব্যবস্থা, জাতীয় পার্ক, স্যাংচুয়ারি, সংরক্ষিত বন, বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ স্থাপন ও বিভিন্ন প্রকল্প (যেমন— ব্যাঘ্র, কুমির প্রভৃতি) স্থাপনের মাধ্যমে বন্যপ্রাণীগুলির বাসস্থান রক্ষা।

৬। বিভিন্ন প্রকার আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সংরক্ষণের ধারাকে আরো সুদৃঢ় করা।

14.5.3 ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে অবস্থিত কয়েকটি জাতীয় পার্ক, স্যাংচুয়ারি, সংরক্ষিত বন, বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভের তালিকা

ভারতের বিভিন্ন রাজ্য ও সেই সকল রাজ্যে অবস্থিত কয়েকটি জাতীয় পার্ক, স্যাংচুয়ারি, সংরক্ষিত বন ও বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভের তালিকা নিম্নে দেওয়া হল—

রাজ্যের নাম	জাতীয় পার্ক / স্যাংচুয়ারি / সংরক্ষিত বন / বায়োস্ফিয়ার
১। তামিলনাড়ু	মধুমালাই, আন্নামালাই, মান্নার উপসাগর
২। উত্তরপ্রদেশ	করবেট, দুধওয়া, চন্দ্রপ্রভা, উত্তরাখন্ড
৩। পশ্চিমবঙ্গ	সুন্দরবন, জলদাপাড়া, গোরুমারা, সজনেখালি
৪। মিজোরাম	ডাম্পা
৫। আসাম	কাজিরাঙ্গা, মানস।
৬। অন্ধ্রপ্রদেশ	কাওয়াল, পোঁচারাম, পাখাল, সীলাপাট্ট
৭। অরুণাচলপ্রদেশ	নামধাপা
৮। বিহার	হাজারীবাগ, বেতলা।
৯। গোয়া	মোলেন।
১০। গুজরাট	গির, ভেলাভাদর।
১১। হরিয়ানা	সুলতানপুর লেক।
১২। হিমাচল প্রদেশ	গোবিন্দ সাগর।
১৩। কেরালা	পেরিয়ার।
১৪। কর্ণাটক	বান্দীপুর, নাগারহোল
১৫। মধ্যপ্রদেশ	কানহা, শিবপুরি, বান্ধবগড়।
১৬। মহারাষ্ট্র	টাডোবা, বরি।
১৭। মণিপুর	কেইবুল লামজাত।
১৮। মেঘালয়	বালপাকরানী।
১৯। উড়িষ্যা	চিল্কা লেক, সিমলিপাল।
২০। পাঞ্জাব	আবাহর।
২১। রাজস্থান	রণথম্ভোর, ঘানা, সারিস্‌কো, ভরতপুর, থর মরুভূমি।
২২। কাশ্মীর	দাচিগ্রাম।

14.5.4 জাতীয় পার্ক, স্যাংচুয়ারি, সংরক্ষিত বন ও বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভের তুলনামূলক আলোচনা

জাতীয় পার্ক	স্যাংচুয়ারি	সংরক্ষিত বন	বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ
১। আইনের সাহায্যে বনজ সম্পদ, বন্যপ্রাণী এবং ঐ অঞ্চলে অবস্থিত ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ বস্তু সবকিছুকেই সংরক্ষণ করে।	যে সব অঞ্চলে বন্যপ্রাণীর সংখ্যা খুব হ্রাস পেয়েছে সেখানে রাজ্য সরকার বা বনদপ্তর আইনের মাধ্যমে সবকিছুই সংরক্ষণ।	যে সকল বনাঞ্চলে চোরাশিকারির কবলে পড়ে বন্যপ্রাণীর সংখ্যা কমতে থাকে, রাজ্য সরকারের অনুমতিক্রমে বন আইন প্রয়োগের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা হয়।	বায়োস্ফিয়ারের যে স্থানে অর্থনৈতিক ভাবে জীব সম্প্রদায়ের উন্নতি করা সম্ভব এবং তা করা হচ্ছে।
২। আয়তন ঃ 0.04-3162 বর্গ কিমি সাধারণতঃ 100-500 বর্গ কিমি	0.61 থেকে 7818 বর্গ কিমি সাধারণতঃ 100-500 বর্গ কিমি	প্রায় 2500 বর্গ কি.মি	5670 বর্গ কিমির বেশি।
৩। যে কোনো একটি বিশেষ বন্যপ্রাণীর বাসস্থান তৈরি, যেমন—করবেট ও দুধওয়া দুটি জাতীয় পার্ক বাঘ সংরক্ষণের জন্য তৈরি।	একটি প্রজাতির প্রাণী বা উদ্ভিদ সংরক্ষণ যেমন—জলদাপাড়া স্যাংচুয়ারিতে গন্ডার সংরক্ষণ করা হয়।	একটি প্রজাতির প্রাণী বেশি প্রাধান্য পেলেও অন্যান্য প্রাণীও সংরক্ষিত থাকে যেমন—বান্দীপুর সংরক্ষিত বনে গাউর ছাড়াও হাতি, চারশৃঙ্গের অ্যান্টিলোপ চিতল, ভালুক প্রভৃতি প্রাধান্য পায়।	নির্দিষ্ট কোনো প্রজাতি নয়। দুটি বা দুটির বেশি প্রজাতি সংরক্ষণ, যেমন—পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনকে বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এখানে বাঘ ছাড়াও হরিণ, বন্য শূকর, রেসাস বানর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।
৪। পর্যটকদের ভ্রমণের ব্যবস্থা আছে।	পর্যটকদের ভ্রমণের ব্যবস্থা আছে।	সাধারণতঃ ভ্রমণের ব্যবস্থা নেই।	সাধারণভাবে ভ্রমণের ব্যবস্থা নেই।
৫। গবেষণা ও বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার অভাব।	গবেষণা ও বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার অভাব।	গবেষণা ও বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার অভাব।	গবেষণা ও শিক্ষার স্থানীয় প্রয়োগের ব্যবস্থা আছে।
৬। জীনপুল সংরক্ষণ মনোযোগী নয়।	জীনপুল সংরক্ষণ মনোযোগী নয়।	জীনপুল সংরক্ষণ মনোযোগী নয়।	জীনপুল সংরক্ষণে মনোযোগ দেওয়া হয়েছে।
৭। বাফার অঞ্চল ছাড়া জৈব বিশৃঙ্খলা নেই।	জৈব বিশৃঙ্খলা সীমিত।	বাফার অঞ্চল ছাড়া জৈব বিশৃঙ্খলা নেই।	বাফার অঞ্চল ছাড়া জৈব বিশৃঙ্খলা নেই।

14.5.5 বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ

কবে ও কার ব্যাবস্থাপনায় স্থাপিত	উদ্দেশ্য	বর্ণনা	সংখ্যা/অবস্থান
1971 সালে Man and Biosphere programme (MAB) এর অধীনে UNESCO এটি চালু করে।	১। বাস্তুতন্ত্রের বিভিন্ন উপাদান সংরক্ষণ। ২। ইন-সিটু সংরক্ষণের মধ্যে দিয়ে জেনেটিক বৈচিত্র্য প্রতিরক্ষা। ৩। গবেষণার সুযোগ ও সুবিধা প্রদান। ৪। জীব সম্প্রদায়ের উন্নতি বিধান করা। ৫। আন্তর্জাতিক স্তরে সাহায্য পাওয়ার পথ প্রশস্ত করা।	প্রতিটি রিজার্ভকে মোট চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। (ক) কোর অঞ্চল ঃ রিজার্ভের যে অঞ্চলে বাস্তুতন্ত্রের পরিবর্তন হয়নি বা খুব সামান্য হয়েছে। (খ) ম্যানুপুলেশন বনজ অঞ্চল ঃ মনুষ্যসৃষ্ট বন ও কিছু কিছু নির্বাচিত গাছ কাটা হয়। (গ) ম্যানুপুলেশন পর্যটক অঞ্চল ঃ যে সব অঞ্চল টুরিসম্ শিক্ষা ও হাতে কলমে কাজ শেখানোর ব্যবস্থা আছে। (ঘ) ম্যানুপুলেশন কৃষি অঞ্চল ঃ আদিবাসীদের থাকার জায়গা ও চাষবাসযোগ্য স্থান। (ঙ) পুনরুদ্ধার অঞ্চল ঃ যে স্থানে বাস্তুতন্ত্রের পরিবর্তন হয়েছে তা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা।	1985 সালের হিসাবে পৃথিবীর 60টি দেশে 243টি বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ আছে। ভারতের বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভের মধ্যে কয়েকটি উদাহরণ— উত্তরপ্রদেশ — উত্তরাখন্ড নন্দাদেবী মধ্যপ্রদেশ — কানহা কর্ণাটক — কেরালা — } নীলগিরি তামিলনাড়ু — } ”

14.5.6 ভারতবর্ষে সংরক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত কয়েকটি প্রকল্প

প্রকল্পের নাম	স্থাপনকাল	বিবরণ
১। ব্র্যাঘ্র প্রকল্প (আমাদের দেশের ভৌগোলিক আয়তনের 49 শতাংশ এই প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে।)	1973	১। 33,000 বর্গ কি.মি এলাকা জুড়ে অবস্থিত 300 বর্গ কি.মি কোর অঞ্চল ও বাকী বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে বাফার অঞ্চল বলে। ২। 14টি রাজ্যে মোট 23টি প্রকল্প আছে। ৩। এই প্রকল্পটিতে রাস্তা নির্মাণ, জল সংরক্ষণ, যোগাযোগ ব্যবস্থা, বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার, প্রাণী চিকিৎসালয় তৈরির জন্য কেন্দ্রীয় সরকার 1997-98 সালে 1355 লক্ষ টাকা অনুদান দেয়। নিম্নে কয়েকটি ব্র্যাঘ্র প্রকল্পের নাম, রাজ্য ও আয়তন সম্বন্ধে জানানো হল— নাম — রাজ্য — আয়তন বন্দীপুর — কর্ণাটক — 866 বর্গ কিমি করবেট — উত্তরপ্রদেশ — 1316 ” কান্‌হা — মধ্যপ্রদেশ — 1945 ” মানস — আসাম — 1840 ”
২। কুমীর প্রকল্প	1975 ও 1977	১। 8 টি রাজ্যে মোট 16টি প্রকল্প আছে। ২। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে মোট 11টি স্যাংচুয়ারি আছে। এর মধ্যে সর্ববৃহৎ অন্ধ্রপ্রদেশে অবস্থিত কৃষ্ণা স্যাংচুয়ারি, যার আয়তন 3600 বর্গ কি.মি এবং চম্বল স্যাংচুয়ারি যা, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানের 5400 বর্গ কিমি আয়তন নিয়ে অবস্থিত। ৩। ঘোড়িয়াল প্রকল্পটি চালু হয়েছে 1977 সালে।

প্রকল্পের নাম	স্থাপনকাল	বিবরণ
৩। গন্ডার প্রকল্প	1987	১। আসামের কাজিরাঙ্গা ও পশ্চিমবঙ্গের জলদাপাড়ায় অবস্থিত। ২। 1976 সালে গন্ডারের সংখ্যা বেড়ে 400 থেকে 500 তে দাড়িয়েছে।
৪। হাতি প্রকল্প	1991-1992	১। হাতির বাসস্থানের ব্যবস্থাপনা, মানুষ ও হাতির মধ্যে সংঘর্ষ, জীবনহানি এবং ক্ষয়ক্ষতির হিসাব দেখা, চোরাশিকারীর হাত থেকে হাতিকে বাঁচানো, যে সব হাতি জনবসতিতে হামলা করে তাদেরকে ধরা ইত্যাদি এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

14.5.7 ভারতের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য জাতীয় পার্ক, স্যাংচুয়ারির বর্ণনা

নাম	অবস্থান	আয়তন	জলবায়ু	উদ্ভিদ	প্রাণী
১। জলদাপাড়া (1944 সালে স্থাপিত) (গন্ডার সংরক্ষণ স্যাংচুয়ারি)	উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার হাঁসিমারা শহরের নিকট।	105 বর্গমাইল	পার্বত্য অঞ্চলের মতো। বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত।	শাল, অর্জুন, শিরিষ ইত্যাদি।	গন্ডার, হাতী, চিতাবাঘ, গাউর, সম্বর, চিতল ইত্যাদি।
২। সুন্দরবন সংরক্ষিত (বন ব্যাঘ্র সংরক্ষণ)	গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, বঙ্গোপসাগরের মোহনায় এই বৃহৎ জলাভূমি। পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণে অবস্থিত।	সর্ব্ববৃহৎ পূর্ব পশ্চিমে 60-66 মাইল ও উত্তর দক্ষিণে 40-44 মাইল।	স্যাঁতস্যাতে, লোনা, ম্যানগ্রোভের আধিক্য।	সুন্দরী, গরান, কেয়া, হোগ্‌লা।	রয়েল বেঙ্গল টাইগার, হরিণ, বনশূয়োর, রেসাস বানর, বিষাক্ত সাপ-শঙ্খচূড়, গোখরো, কুমীর ইত্যাদি।

নাম	অবস্থান	আয়তন	জলবায়ু	উদ্ভিদ	প্রাণী
৩। গির অরণ্য সংরক্ষিত বন; স্থাপিত 1967 সালে (সিংহ সংরক্ষণ)	গুজরাটের পশ্চিমাঞ্চল শুষ্ক মরুপ্রায় অঞ্চল।	500 বর্গমাইল	শুষ্ক আবহাওয়া, বার্ষিক বৃষ্টিপাত 20" এর কম।	কাঁটা জাতীয় গুল্মঝোপ।	এশিয়ার সিংহ, নীলগাই, সম্বর, চিতল, হরিণ।
৪। করবেট জাতীয় পার্ক, 1935 সালে স্থাপিত (ব্র্যাঘ্র সংরক্ষণ)	কুমায়ুনে অবস্থিত।	12 বর্গমাইল	শুষ্ক চরমভাবাপন্ন আবহাওয়া, বৃষ্টিপাত 40 এর কম।	শাল, শিমুল, বড় কাঁটাঝোপ, গুল্ম।	বাঘ, হাতি, কালো ভাল্লুক, চিতাবাঘ, হায়না, সম্বর, সজারু।
৫। বান্দীপুর; 1941 সালে স্থাপিত। (গাউর সংরক্ষণ)	মহীশূর মালভূমির 3,300 ফুট উচ্চতায় পশ্চিমঘাট পর্বতমালার পূর্বাংশে।	22 বর্গমাইল	জলবায়ু শুষ্ক, বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ 25" এরও কম।	সেগুন, চন্দন, গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ।	গাউর, হাতি, চার শৃঙ্গের অ্যান্টিলোপ, চিতাবাঘ, স্লথবিয়ার।

14.6 বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইনে (১৯৭২) এর প্রাণীদের সিডিউল অন্তর্ভুক্তির তলিকার উদাহরণ

সিডিউল - ১

বিভাগ - I

নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	নাম	বৈজ্ঞানিক নাম
স্তন্যপায়ী প্রাণী			
১। আন্দামানের বন্য শূকর	*Sus sorofa andamanensis*	১৭। গাঙ্গেয় ডলফিন্	*Platanista gangetia*
২। কৃষ্ণসার	*Antelope cervicapra*	১৮। গাউর	*Bos gaurus*

নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	নাম	বৈজ্ঞানিক নাম
৩। থামিন	*Cervus eldi*	১৯। সোনালী বিড়াল	*Felis temmincki*
৪। হিমালয়ের ধূসর ভাল্লুক	*Ursus arctos*	২০। সোনালী হনুমান	*Presbytis geei*
৫। টুপিপরা হনুমান	*Presbytis pileatus*	২১। বিশাল কাঠবিড়ালী	*Ratufa macroura*
৬। ক্যারাকাল	*Felis caracal*	২২। হিমালয়ের থর	*Hemitragus jewlahicus*
৭। চিতা	*Acinonyx jubatus*	২৩। উল্লুক	*Hylobates hoolock*
৮। চীন দেশীয় প্যাঙ্গোলিন	*Mainis peutadactyla*	২৪। ভারতীয় হাতি	*Elephas maximus*
৯। চিংকারা বা ভারতীয় গ্যাজল	*Gazella gazella*	২৫। ভারতীয় সিংহ	*Panthera leopersica*
১০। মেঘচিতা	*Neojelis nebulosa*	২৬। ভারতীয় বন্যগর্দভ	*Equus heulionus*
১১। কাকড়া খেকো ম্যাকাক্	*Macaca irus*	২৭। ভারতীয় নেকড়ে	*Canis lupas*
১২। মরুভূমির বেড়াল	*Felis libyca*	২৮। কাশ্মীরী স্ট্যাগ	*Cervus elaphus*
১৩। মরুভূমির শিয়াল	*Vulpes bucapus*	২৯। চিতাবাঘ	*Panthera purdus*
১৪। মাছ খেকো বিড়াল	*Felis viverrina*	৩০। লিঙ্কস	*Felix lynx*
১৫। চারশৃঙ্গের অ্যান্টিলোপ	*Tetraceros quadricornis*	৩১। লরিস	*Loris tardigradus*
১৬। ডুগং	*Dugong dugon*		

নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	নাম	বৈজ্ঞানিক নাম
বিভাগ - II			
উভচর ও সরীসৃপ			
১। হলুদ মনিটর লিজার্ড	*Varanus navesceus*	**বিভাগ-IV** (ক্রাসটেশিয়া ও পতঙ্গ)	
২। কুমীর	*Crocodilus porosus*	(১) প্রজাপতি ও মথ	
	Crocodilus palustris	(ক) ডাফার ব্যান্ডেড	*Discophora deodeo*
৩। টেরাপিন	*Batagur basika*	(খ) সাধারণ ডাফার	*Discophora soudaica*
৪। ঘড়িয়াল	*Gravialis gaugeticus*	(গ) কোকোনাট ও রবার কাকড়া	*Bigtus latro*
৫। নরম খোলারটারটল	*Trionyx gaugeticus*	(ঘ) ড্রাগনফ্লাই	*Epioplebia laidlawi*
বিভাগ - II-A		**বিভাগ - IV-A সিলেন্টারেট**	
১। হোয়েলসার্ক	*Rhineodon typus*	(ক) রিফ তৈরী করা কোরাল	*Scleractiniaus* sp.
২। হাঙর ও রে	*Anoxypristis cuspidata*	(খ) সিফ্যান	*Gorgoniaus* sp.
বিভাগ - III (পক্ষী)			
১। আন্দামান টিল	*Ahas gibberifrous*		*Cassis Cornuta*
			Charonia tritonis
২। বেদল ফ্লোরিকান	*Eupodotis beugaleusis*	**বিভাগ - IV-B একাইনোবারমাটা**	
৩। কালোগলার সারস	*Grus nigricollis*	সিকিউকামবার	*Holothuriaus* sp.
৪। ময়ূর ফেজান্ট্স	*Polyplectron bicalcaratum*		

নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	নাম	বৈজ্ঞানিক নাম
সিডিউল - ২		**সিডিউল - ৩**	
বিভাগ - I			
১। আসামী ম্যাকাক্	*Macaca assamehsis*	১। বাকিং ডিয়ার	*Munticacus muntjak*
২। বেঙ্গল পরকুপাইন	*Atherurus mecrourus*	২। চিতল	*Axis axis*
৩। বনেট ম্যাকাক্	*Macaca radiata*	৩। হায়না	*Hyaena hyaena*
৪। বন্য কুকুর বা ঢোল	*Cuon alpinus*	৪। নীলগাই	*Boselaphus tragocamelus*
৫। ক্যামেলিয়ন	*Chameleon calcaratus*		
বিভাগ - II		**সিডিউল - ৪**	
১। সাধারণ শেয়াল	*Vulpes bengalensis*	১। হেজহগ্	*Hemiechinus auritus*
২। স্পার্ম হোয়েল	*Physeter macrocephalus*	২। মঙ্গুজ	*Herpestes* sp.
৩। ভারতীয় গোখরো	*Naja naja*	৩। বারবেট্স (পক্ষী)	*Capitonidae* sp.
৪। রাসেলস্ ভাইপার	*Vipera ruselli*	৪। এগ্রেটস্ (পক্ষী)	*Ardeidae* sp.
		৫। মিষ্টি-জলের ব্যাঙ	*Rana* sp.

14.7 ভারতের কয়েকটি লুপ্তপ্রায় উদ্ভিদ প্রজাতির বিজ্ঞান সম্মত নাম

ভারতের কয়েকটি উদ্ভিদ প্রজাতিও বিলুপ্তির পথে। সাধারণভাবে মোট 450 টি প্রজাতি এর আওতায় পড়ে। ভারতীয় উদ্ভিদ (Vol. II) এর লাল তালিকায় (1988-89) 200 টি বিরল ও বিলুপ্তকর উদ্ভিদ প্রজাতির বর্ণনা প্রকাশিত হয়েছে। নীচে কয়েকটি রাজ্য ও সেই রাজ্যের বিলুপ্তকর উদ্ভিদ প্রজাতির নাম দেওয়া হলো—

রাজ্য / কোন্ প্রান্তে অবস্থিত	বৈজ্ঞানিক নাম	রাজ্য / কোন্ প্রান্তে অবস্থিত	বৈজ্ঞানিক নাম
১। হিমালয় ও পূর্ব ভারতে	(a) *Abies delavayi*	৩। গাঙ্গেয়ভূমি	(a) *Aldrovauda vesiculosa*
	(b) *Cawellia caduca*		
	(c) *Iodes hookeriana*	৪। ভারত পেনিন্সুলা	(a) *Anewia toweutosa*
	(d) *Magnolia grifithii*		(b) *Apawa barberi*
	(e) *Olax nana*		(c) *Entada pursaetha*
	(f) *Drosera indica*		(d) *Piper berberi*
২। রাজস্থান ও গুজরাট	(a) *Camniphora wightii*		
	(b) *Helichrysum cut chicum*	৫। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ	*Uvaria nicoboria*
			Canarium mannii

14.8 IUCN Red List (লাল তালিকার) বৈশিষ্ট্যসমূহ

বিষয়	বৈশিষ্ট্য	অতি লুপ্তপ্রায়	লুপ্তপ্রায়	অসুরক্ষিত
পপুলেশন হ্রাসকরণ	শেষ 10 বছরে অথবা তিন প্রজন্মে হ্রাস হয়েছে	80%	50%	20%
সীমিত বিস্তার	মোট যত পরিমাণ অথবা যতগুলি এলাকার মধ্যে সীমিত	10 বর্গ কিমি (একটি ছোট এলাকা)	5000 বর্গ কিমি (পাঁচটি ছোট এলাকা)	20,000 বর্গ কিমি (দশটি ছোট এলাকা)
অনমিত মোট পপুলেশন	মোটামুটি যতগুলি পূর্ণবয়স্ক কমপক্ষে বিদ্যমান	250	2500	10,000
লুপ্ত হবার সম্ভাবনা	পরিমাণগত বিশ্লেষণ	10 বছরে 50 শতাংশ অথবা তিনটি প্রজন্ম	20 বছরে 20 শতাংশ অথবা পাঁচটি প্রজন্ম	100 বছরে 10 শতাংশ

14.9 সারাংশ

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে সংরক্ষণ কি এবং কিভাবে সংরক্ষণ করা হয় সে সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা গেছে। সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগের বেশি প্রয়োজন নিশ্চই আছে এবং সেইসঙ্গে আইনের সঠিক রূপায়ন করা সংরক্ষণের পক্ষে একটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। এছাড়া সর্বস্তরে সাধারণ মানুষের মধ্যে সংরক্ষণ সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধি একটি জরুরি পদক্ষেপ। সংরক্ষণের ব্যাপারে সঠিক প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

14.10 প্রশ্নাবলী

1. **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন**

   (a) সংরক্ষণ কাকে বলে?

   (b) সংরক্ষণের কারণগুলি কি কি ?

   (c) সংরক্ষণ কয় প্রকার ও কি কি ?

   (d) অরণ্য সংরক্ষণের দায়িত্বে বিভিন্ন বেসরকারি ও সরকারি প্রতিষ্ঠান/আইনগুলি কি তা লিখুন।

   (e) জীববৈচিত্র্যের ব্যবহার উল্লেখ করুন।

   (f) এক্সসিটু Ex-situ সংরক্ষণের পদ্ধতিগুলি কি কি?

   (g) ভারতের জাতীয় পার্ক, স্যাংচুয়ারির উদাহরণ দিন।

   (h) ব্যাঘ্রপ্রকল্প কি ও কত সালে স্থাপিত হয়েছিল?

2. **শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ**

   (a) জলদাপাড়া স্যাংচুয়ারির সংরক্ষিত প্রাণীটির নাম _____।

   (b) ভারতের দুইটি লুপ্তপ্রায় উদ্ভিদ-এর বৈজ্ঞানিক নাম _____।

   (c) কৃষ্ণসারের বৈজ্ঞানিক নাম _____।

   (d) কুমীর প্রকল্পগুলি _____ সালে স্থাপিত।

   (e) ভারতে বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভের সংখ্যা _____।

   (f) ভারতের জাতীয় পার্কের আয়তন _____।

3. **নিম্নে প্রদত্ত সারি দুটির প্রশ্ন ও উত্তরগুলিকে একে অপরের সাথে মিলিত করুন।**

সারি 'ক'	সারি 'খ'
১। করবেট	(a) 1952
২। অরণ্য সংরক্ষণ আইন	(b) জাতীয় পার্ক
৩। National Forest policy (জাতীয় অরণ্য বিমাপত্র)	(c) 1980
৪। গির অরণ্য	(d) মানস
৫। আসাম	(e) সিংহ

4. **দীর্ঘ উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ**

(a) IUCN Red list তালিকার বৈশিষ্ট্য সমূহের বিবরণ দিন।

(b) জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ সম্বন্ধে যা জানা যায় তা লিখুন।

(c) বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ কি? বিবরণ দিন।

14.11 উত্তরমালা

অনুশীলনী 1

(a) — 14.3

(b) — 14.4

(c) — 14.5

(d) — 14.6.2

(e) — 14.5.4

(f) — 14.5.4

(g) — 14.6.4

(h) — 14.6.5

অনুশীলনী 2

(a) — গন্ডার

(b) — *Magnolia grifithii / Olax naua*

(c) — Antelope cervicapra

(d) — 1975/1977

(e) — 14

(f) — 0.4 থেকে 3162 বর্গ কিমি

অনুশীলনী 3

(a) — ii

(b) — iii

(c) — i

(d) — v

(e) — iv

অনুশীলনী 4

(a) — 14.9

(b) — 14.5.4

(c) — 14.6.4